আর্য্যালোক।

অর্থাৎ

আত্ম-জ্ঞানে তত্ত্ব-জ্ঞান।

বিশেষ

প্রথমে আপনাকে জানিতে পারিলে, পরে আর ঈশ্বরকে
পাইতে কোন বাধা থাকে না।

শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত।

কলিকাতা।

বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০০।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১২৯১।

গ্রন্থাভাস।

যেখানে অন্ধকার আসিয়া দেখা দেয়, সেই খানেই আলোকের প্রয়োজন হয়। আজ ভারতের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম-বিভ্রাট প্রযুক্ত হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার, হিন্দুর ব্যবহার প্রভৃতি যে ভাবে আলোচিত হইতেছে, তাহাতে অন্ধকারেরই প্রশ্রয় দেখা যায়। ঐ অন্ধকারময় স্থলে আলোক প্রবিষ্ট না হইলে অস্মদ্দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ভারতের নব্য যুবকগণ কোথায় হিন্দু-ধর্ম্মের আলোকে আলোকিত হইবেন,—সৎ প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া, ভারত মাতার মুখোজ্জ্বল করিবেন,—না আজ, তাঁহারাই বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণ-প্রিয় হইয়া, হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশা ঘটাইতেছেন! এই ঘোর বিপদ দেখিয়া, কাহার মনে মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত না হয়?

আর্য্য-ধর্ম্মের প্রকৃত আলোকের স্বরূপ আয়ত্ত করিয়া প্রকাশ করা মাদৃশ জনের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ বিষয়। তথাপি ঐ আলোক যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এক্ষণে তাহা সাধারণের নয়নের সম্মুখে আনিয়া ধরিলাম। যেখানে ঘোর অন্ধকারে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, সেখানে এই আলোক দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হয়; এই আশায় ইহার যেখানে যে প্রকার আবশ্যক, সেখানে সেই প্রকার আলোক-শিখার বিকাশ করিতে যত্ন পাওয়া গিয়াছে।

আর্য্য-ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-জগতের পূর্ণ-শশধর। উহাতে উপধর্ম্মরূপ অন্ধকার আসিয়া সম্মিলিত হইলে, পূর্ণ-শশীর বিকাশ হয় না। মনুষ্যের মানসান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য, ধর্ম্ম বলিয়া যদি কোন প্রকৃত আলোক থাকে, তবে এ জগতে আর্য্য-ধর্ম্মের আলোক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এই পুস্তকখানির কলেবর কেবল ঐ আলোক লইয়া পুষ্ট করা হইয়াছে; এই জন্যই ইহার নাম "আর্য্যালোক" রাখা হইল। এক্ষণে যে প্রকার কাল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর্য্য-ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বের নির্ণয় করিয়া, অপরের মানসান্ধকার দূর করিতে পারি, আমার এমন ভরসা

নাই ; তথাপি উপস্থিত গ্রন্থ পাঠে যদি আর্য্য-ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের কিয়দংশেও প্রীতিকর ও উপকারপ্রদ হয়, তাহাতে আর্য্য-ধর্ম্মেরই গৌরব বৃদ্ধি পাইবে এবং তৎসঙ্গে আমিও আপনার শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে গেলে, মনুষ্যকে প্রথমে ধর্ম্মের মূল-তত্ত্বের বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত হইতে হয়। মূল-তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে,মনের সংশয় ছেদন হইয়া যায়। তখন মানুষ আপনি আপনাকে জানিতে পারে এবং তৎসঙ্গে তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বিকাশ হয়; সুতরাং তাহার নিকটে ঈশ্বরকে পাইবার পথ দুর্গম বোধ হয় না, এবং আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ লোকের সঙ্গে যে জাতিগত সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার অনুরূপ পথ চিনিয়া লইতেও তাহার কষ্ট হয় না। মনুষ্যের জীবন এত সুদীর্ঘ নহে, যাহাতে সে কেবল এখানকার বাহ্য-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ভবিষ্য-জীবনের উন্নতির পথ ধরিতে পারে, এই জন্যই সে তাহার মৃত্যুর পর কি প্রকার দশা ঘটিবে, তাহার বিষয় জানিতে প্রয়াসী হয়। যখন সে মৃত্যুর কার্য্য-কারণভাব ও তৎসঙ্গে তাহার ভাবী জীবনের বিষয় বুঝিতে পারে, তখন তাহার মনে নিশ্চয়ই বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। যত দিন না মনুষ্যের মনে বৈরাগ্য জন্মে, তত দিন তাহার ধর্ম্মের প্রকৃত পথ ধরা হয় না। যখন তাহার মনে বৈরাগ্য আসিয়া স্থান পায়, তখন ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম-পালন তাহার সার কার্য্য হইয়া উঠে। ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম-পালনের সঙ্গে যোগ-সাধনের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্যই এই পুস্তক খানির প্রথম পরিচ্ছেদে মূল-তত্ত্ব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জাতি-তত্ত্ব, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরলোক তত্ত্ব এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে যোগ-তত্ত্ব এই সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর সংশয়াত্মাদিগের মন হইতে অধর্ম্মরূপ পিশাচকে দূরীভূত করিবার জন্য যোগ-পরিশিষ্টে প্রেত-তত্ত্বের আংশিক বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ইহার প্রথম প্রস্তাবটি (হিন্দুর যুক্তি) বঙ্গবাসী পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং উহাকেই মুখপাত্র করিয়া, অপরাপর বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে। আর ইহাও ব্যক্ত

করা আবশ্যক, ঐ প্রস্তাবটির দুই একটি স্থানে আসল বিষয়ের ভাব বজায় রাখিয়া সামান্যমাত্র পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পরন্তু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পাতঞ্জল-দর্শন ও যোগ-পরিশিষ্টের অনুবাদ এবং শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের গ্রন্থাবলী, ভাগবত, গীতা, উত্তর গীতা, নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি-সূত্র ও কতিপয় যোগ-মূলক গ্রন্থ হইতে সবিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

পরিশেষে, আন্তরিক বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়, এই পুস্তকখানির অদ্যোপান্ত যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অধিক কি, তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তা গুণের সাহায্য পাওয়াতেই, আমি ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

কলিকাতা।
সন ১২৯৯

শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত

পত্র।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান কালে নবেল-নাটকের যে প্রকার সমাদর, তাদৃশ আদর ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুস্তকের অদৃষ্টে ঘটিবার নহে। এক দিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারের অভাবে দেশে নানা প্রকার দুঃখ দুর্গতি আসিয়া পড়িয়াছে, অপর দিকে পুস্তক পাঠের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিয়াছে। এ কারণ আমরা হিন্দুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য, এই আর্য্যালোক পুস্তক খানি বিক্রয়ের নিম্ন লিখিত নিয়ম স্থির করিলাম।—

১। সাধারণ গ্রাহকগণের নিকট প্রতি খণ্ডের মূল্য . . ১৷৷০

২। সাধারণ গ্রাহকগণের মধ্যে যিনি এককালে চারি খণ্ড পুস্তক লইবেন, তাঁহার নিকট প্রতি খণ্ড ১৷৵০

৩। যাঁহারা ধর্ম্মার্থে দান করিবার জন্য এককালে পঁচিশ বা তদধিক খণ্ড পুস্তক লইবেন, তাঁহাদের নিকট প্রতি খণ্ড . . . ১৷০

৪। সাধারণ পুস্তক বিক্রেতারা তৃতীয় নিয়মানুসারে পুস্তক পাইবেন।

৫। ডাকে পুস্তক পাঠাইতে হইলে, ডাক মাশুল ও পোঃ কমিশন আলাহিদা দিতে হইবে।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

দত্ত এণ্ড কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

২২৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা, ঠন্‌ঠনিয়া।

ইহা ভিন্ন এখানকার প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যাইবে।

(আমাদের ঔষধালয়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিশুদ্ধ ও দরে সুলভ।)

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা,—

দত্ত এণ্ড কোম্পানি।

আর্য্যালোক

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মূল-তত্ত্ব।

১। হিন্দুর যুক্তি।

কর্ম্ম অনুসারে ফল-ভোগ ও জন্মে জন্মে নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিবার জন্য, আমরা জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকি; ইহাই হিন্দুর মূল বিশ্বাস। অন্যান্য যে সকল কথায় আমরা বিশ্বাস করি, তাহা এই মূল বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ঐ মূল কথা জানা না থাকিলে, কিম্বা ভুলিয়া গেলে, অপর কোন কথাই পূর্ব্বাপর বুঝিতে পারা যায় না। দর্শন, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ,—অধিক কি কাব্য, নাটক পর্য্যন্ত যাহা কিছু অধ্যয়ন কর, এই মূল কথা সর্ব্বত্রই পাইবে। আর এই মূল কথায় যিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের কোন কথাই অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, কালদোষে এবং শিক্ষাদোষে এই মূল-তত্ত্ব অনেকেই জানেন না; কেহ কেহ বা না বুঝিয়াই, না জানিয়াই একথা মানেন না। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আছে, তথাপি যদি কাহারও দুর্ভাগ্য বশতঃ সে প্রমাণেও প্রতীতি না হয়, তাহা হইলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই। জন্মান্তর পরিগ্রহ স্বীকার করা যে যুক্তিসিদ্ধ, ইহাও আমরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

জন্মান্তর পরিগ্রহ বলিলে, দুইটি কথা বুঝা যায়। এক, বর্ত্তমান দেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বেও আমি ছিলাম এবং দ্বিতীয়তঃ এই দেহ ত্যাগ করিয়াও মৃত্যুর পর আমি থাকিব।

জড়-বুদ্ধি নাস্তিকেরা মনে করে যে, আমার ইহ-জন্মই প্রথম জন্ম এবং এজন্ম ফুরাইলেই আমারও শেষ হইবে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, অনুভব করিতেছি যে আমি,—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ দ্বারা নানা প্রকার কর্ম্ম করিতেছি যে আমি,—স্মরণ মননাদি করিতেছি যে আমি,—ভক্তি প্রেম, স্নেহ করিতেছি যে আমি,—রাগ, দ্বেষ, হিংসা করিতেছি যে আমি,—সুখ, দুঃখ ভোগ করিতেছি যে আমি,—সংশয়, নিশ্চয় করিতেছি যে আমি, —ইচ্ছা, অনিচ্ছা করিতেছি যে আমি,—এ আমি, জড়-সঙ্ঘাতের ফলমাত্র। অস্থি, মেদ, মাংসাদির এক প্রকার সমষ্টি হওয়াতেই আমি উৎপন্ন হইয়াছি। আমি এই দেহের একটা গুণ বা ক্রিয়া মাত্র। দেহ বিনষ্ট হইলেই আমিও অন্তর্হিত হইলাম। যে শূন্য ছিলাম, আবার সেই শূন্যই হইলাম।

এমন কথা আমরা বুঝিতে পারি না। জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হয়, এমন কখন দেখা যায় না। কেবল আমরা দেখি নাই, তাহা নহে। কেহই কুত্রাদি কখন দেখে নাই যে, জড়ের সংঘাতে চৈতন্যের উদয় হইল। জড় এবং চেতন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন-ধর্ম্মী। জড়ের যাহা ধর্ম্ম, চেতনের তাহা ধর্ম্ম নহে। চেতনের যাহা ধর্ম্ম, জড়ের তাহা ধর্ম্ম নহে। বারুদ এবং আগুন সংহত হইলে, একটা শব্দ হয়,—ঘড়ীতে দম দিলে, এক রকম ক্রিয়া হয়,—ক্ষার ও অম্ল সংযোগে বুদ্‌বুদ্ জন্মে ; কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখিবে যে; যেখানে সেই শব্দ, যেখানে সেই ক্রিয়া, যেখানে সেই বুদ্‌বুদের উৎপত্তি, সেই খানেই সেই একই প্রকার শব্দ, একই প্রকার ক্রিয়া, এবং একই প্রকার বুদ্‌বুদের উৎপত্তি।

মাত্রার তারতম্য থাকিতে পারে; কিন্তু জাতীয়ভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জড়-সংঘাত হইতে যে ক্রিয়া, গুণ বা নূতন কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া, গুণ বা ধর্ম্মের স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই; কর্ত্তৃত্ব তাহাতে নাই। সমষ্টীকৃত জড়-পদার্থ বলিতে পারে না,—ভাবিতে পারে না,—বলেও না, ভাবেও না যে, আমি এ নিয়মে চলিব না, অর্থাৎ আমিত্ব তাহার ভিতর থাকে না। জীবের যেমন মন আছে, সেই জড়-সমষ্টির সেরূপ, কি অন্য কোন রূপ মন জন্মে না। ইহাতেই জড় এবং চেতনের পার্থক্য থাকে।

জীবের শারীরিক সংঘাত এক এক জাতির মধ্যে একই প্রকার; কিন্তু মন সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন। একটি ছাগীর গর্ভে যতগুলি শাবক জন্মিয়াছে, দেখিয়াছি যে, আকৃতি, লোম-সজ্জা, বর্ণের বৈচিত্র, সমস্ত গুলিতে সেই একই রকম; কিন্তু ছাগ-মাতা যখন রোমন্থ করিতেছে, সেই সময়েই একটি শাবক কুর্দ্দন করিতেছে, আর একটি শুইয়া আছে এবং তৃতীয় শাবক হয়ত মাতার অঙ্গ লেহন করিতেছে। চারিটিতে চারি প্রকার মনের দ্বারা চালিত। শারীরিক সংঘাত সর্ব্বত্রই এক প্রকার, তবে মনোগত এ প্রকার বৈচিত্র হয় কেন? বৈচিত্রের এক মাত্র এই কারণ যে, জড়ত্ব এবং চৈতন্য স্বতন্ত্র পদার্থ। নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ বিষয়ে কেহ কাহার অপেক্ষা করে না। চৈতন্য যদি জড়-সংঘাতের ফল হইত, তাহা হইলে, ক্রিয়া সর্ব্বত্রই এক হইত। জড়-বিজ্ঞান অবগত হইয়া আমরা অভীপ্সিত কত কার্য্যই সাধন করিতেছি। জড়ের গতি আমরা জানি, সংঘাতের ফল নিশ্চিত আছে, ইহাও জানি এবং জানি বলিয়াই তদ্রূপ ক্রিয়া-সাধনে প্রবৃত্ত হই, এবং ফললাভও করিয়া থাকি। যদি

জড়ের মন থাকিত, বা জড়ের সংঘাতে মনের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, বিজ্ঞানের বুজরুকি এক মুহূর্ত্তের জন্যও খাটিত না। তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-সাধনের জন্যই হয়ত কত রাজ-শাসন, কত সমাজ-শাসন, কত কারা-নিয়মের কল্পনা করিতে হইত। কলের গাড়ীতে লোক উঠিয়াছে, বিদায়ী ঘণ্টা পড়িয়াছে, কল-চালক কলের কাণ মলিতেছে; কল সেই সময়ে কান্না ধরিল, কল কিছুতেই সম্মুখের দিকে যাইবে না। কল ক্ষণে পিছাড়ি ঝাড়ে, ক্ষণে পথ ভাঙ্গিয়া বামে পলায়, ক্ষণে লাফাইয়া খালে পড়িতে যায়,—এইরূপ অবস্থা হইলে, কলের কলত্ব থাকিত না। কলকে কত ভুলাইতে হইত, কলকে ভয় দেখাইতে হইত। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বশতঃ হয়ত অনেক স্থলে কল সুশীল হইত, এই সঙ্গে সঙ্গে অনেক কল, মনুষ্যকেও বিকল করিয়া তুলিত, তাহার সন্দেহ নাই।

আর একটি কথা আছে। জড়-সংঘাত জনিত কার্য্য অন্যের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। জ্ঞান, ক্রিয়া এবং ইচ্ছা,—শক্তির এই ত্রিবিধ বিকাশের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি জড়ের নাই; ক্রিয়া-শক্তি যাহা দেখিতে পাই, তাহা অপরের ইচ্ছাধীন; কিন্তু ইচ্ছা-শক্তি নিশ্চয়ই নাই। সংঘাত জনিত যে কোন জড়-পিণ্ড হয়, অন্য কেহ সেই জড়-পিণ্ডের চালক। জড়-পিণ্ড নিজে নিজের চালক কখনই হয় না; কিন্তু যে পিণ্ডে চৈতন্য আছে, তাহা আপনি আপনাকে চালায়, অন্ততঃ চালাইতে চেষ্টা করে। যেহেতু সে পিণ্ডে মন আছে, এবং ইচ্ছা আছে। আর ইহাও দেখা যায় যে, এই দেহ-পিণ্ডের অন্তর্গত আমি অনেক সময়ে আমারই দেহ-পিণ্ডের অধীন আছি বলিয়া কষ্ট বোধ করি, অথবা বিরক্ত হই। আমার শরীরে বেদনা বোধ হইয়াছে, যাত্রা শুনিতে যাইতে পারিলাম না; আমার মহাকষ্ট। আমি যদি আমার এই দেহ-পিণ্ডের

সংঘাতের ফল হইতাম, তবে এ কষ্ট কেমন করিয়া সম্ভবে? আমি যদি শারীরিক উপাদানের সংঘাতের ফল হইতাম, তাহা হইলে, একই সময়ে আমার শরীর যাহা চাহে, আমি তাহার বিপরীত চাহি কেন? ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমি যাহা, আমার শরীর তাহা নহে। আমার যাহা ধর্ম্ম, আমার শরীরের তাহা ধর্ম্ম নহে, আমার শরীর এবং আমি এক নহি, জড় এবং চেতন এক নহে,—ইহা অতি সহজ কথা, অতি স্পষ্ট কথা; কিন্তু এমনি দুঃসময় পড়িয়াছে যে, একথাও, বুঝাইয়া দিতে হয়। অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমরা এ প্রয়োজন দেখিয়াছি। এই সহজ কথা লইয়া অনেকের সঙ্গে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হইয়াছে। সেই জন্যই এত কথা বলিলাম। যাঁহারা সুবোধ, তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

দেখা গেল যে, জড় আর চেতন, এক শ্রেণীর পদার্থ নহে। তাহা হইলে, আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, আমার দেহ-সংঘাতের ফলে অকস্মাৎ আমি হইলাম, ইহা আর কেমন করিয়া বলা চলে? দুইটি কথা এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এক কথা এই যে, কিছুই ছিল না; অথচ কিছু হইল, এমন কখন দেখা যায় না। অর্থাৎ উপাদান বিহীন সৃষ্টি, আমরা কখন দেখি নাই। আমরা কখনই কিছুরই আদিও দেখি নাই, অন্তও দেখি নাই,—দেখিয়াছি কেবল রূপান্তর,—দেখিয়াছি কেবল অবস্থান্তর,—দেখিয়াছি কেবল পরিণাম। আমরা যাহাকে আদি বা অন্ত বলি, তাহা আমাদের মনঃকল্পিত আদি ও অন্ত। দ্বিতীয় কথা যাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, তাহা এই,—ধর্ম্মীর অন্ত হইলে ধর্ম্মের অন্ত হয়, গুণাধারের অন্ত হইলে গুণের অন্ত হয়; কিন্তু এক ধর্ম্মীর অন্ত হইলে, অন্য ধর্ম্মীর অন্ত হয় না।

এক্ষণে এই দুইটি কথাই বুঝান যাউক। দেখা গিয়াছে যে, আমি এবং আমার শরীর ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। দেখা গিয়াছে যে, শরীর-সংঘাতের ফলে আমি উৎপন্ন হই নাই, অথচ আমি আছি। স্বধু আমি আছি নহে,—কত জনকে জ্বালাতন করিতেছি। এই যে আমি আছি, অথচ পূর্ব্বে ছিলাম না, ইহাত কোন মতেই হইতে পারে না। যাহা কিছু বর্ত্তমান তাহারইত একটা না একটা পূর্ব্বাবস্থা থাকে, তবে আমি ছিলাম না, হঠাৎ আমি হইলাম, এ কল্পনা কি প্রকারে করা যাইতে পারে? আর আমি আমার শরীর-সংঘাতের ফল, একথা বলিতে হইলে, ইহাই বুঝা যায় যে, অগ্রে শরীর হইয়াছে, পরে আমি হইয়াছি। এরূপ উক্তির সমর্থক প্রমাণ নাই,—কোন যুক্তিও নাই। বরং অগ্রে চেতন, পরে জড়-সংঘাত এই রূপই সর্ব্বদা দেখা গিয়া থাকে। অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে তাহা মনোমধ্যে রচিত হয়; তাহার পরে অট্টালিকার জড়-উপাদান সকল সংগৃহীত ও বিন্যস্ত হইতে থাকে। স্বতরাং অট্টালিকা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, অট্টালিকার কল্পনা করিবার জন্য, অন্য এক চেতনের সত্তা অগ্রেই স্বীকার করিতে হয়। সেই রূপ আমার এই জড়-শরীরের উপাদান সকল সংহত হইবার পূর্ব্বে, শরীরের প্রয়োজন জ্ঞান, চেতনের কল্পনা অবশ্যই করিতে হয়। অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারা কোন একটা প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইবে, শরীর নির্ম্মাণারম্ভের পূর্ব্বেই এরূপ চেতন পদার্থ ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের দ্বারা স্বখ-ভোগ এবং দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে। অতএব শরীরের আরম্ভের পূর্ব্বেই, সেই স্বখ-দুঃখের ভোগী অবশ্যই ছিল, এবং সেই ভোগী আমি। ইহাতেই বুঝা যায় যে, শরীরের পর আমি হই নাই, আমারই পর শরীর হইয়াছে। আমি যে চেতন পদার্থ অকস্মাৎ উদ্ভূত

হইয়াছি, ইহাও হইতে পারে না। আমি যে চেতন পদার্থ, ইহার আদিও কল্পিত হইতে পারে না; সুতরাং অগ্রে আমি ছিলাম। সোণার বালা দেখিতেছি। বালার অবস্থায় সোণার উৎপত্তি হয় নাই,—সেই সোণা অন্য রূপে পূর্ব্বেও ছিল। সে রূপ যেমনই হউক, অর্থাৎ অন্য কোন অলঙ্কারই হউক, সোণার পাতই হউক, সোণার পরমাণুই হউক, বা যে যে উপাদানে সোণা হইতে পারে, সেই উপাদানরূপেই হউক, কোন রূপে না কোন রূপে নিশ্চয়ই ছিল। সোণা জড় পদার্থ। জড়-ধর্ম্মীর এই রূপান্তর ভিন্ন আদি কখন দেখা গেল না। আমি চেতন-ধর্ম্মী, আমারও চেতনময় কোন না কোন রূপ, বা অবস্থা অগ্রে ছিল, ইহাই নিশ্চয়। আমি একবারে ছিলাম না, অকস্মাৎ হইলাম, ইহা হইতেই পারে না। আবার শরীর আর আমি যখন ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত, তখন উভয়ের ক্ষয়োদয়ও এক সঙ্গে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। ঘর নষ্ট হইলে, সেই সঙ্গে অধিকারীও নষ্ট হয় না। তাহার কারণ এই যে, উভয়ে এক-ধর্ম্মী নহে। কাষ্ঠ-খণ্ডে যদি লৌহ-শলাকা বিদ্ধ থাকে, আর সেই কাষ্ঠ-খণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ হয়; তাহা হইলে কাষ্ঠ-খণ্ডের সঙ্গে সেই লৌহ-শলাকা দগ্ধ হইয়া যায় না। যেহেতু উভয়ে ঠিক এক-ধর্ম্মী নহে। একত্র অবস্থান সত্ত্বেও একই কারণ, অর্থাৎ উত্তাপের কার্য্য উভয়ে তুল্যরূপে ফলে না,—অথচ উভয়েই জড়। এরূপ অবস্থায় শরীরের ক্ষয়োদয়ের সঙ্গে আমার ক্ষয়োদয় হইবে, ইহা আর কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়?

জড় এবং চেতন এক ধর্ম্ম নহে,—আমার শরীর এবং আমি এক-ধর্ম্মী নহি,—একের ক্ষয়ে অপরের ক্ষয়,—একের উদয়ে অপরের উদয়,—এরূপ হইবার কোন কারণ নাই, ইহা বুঝা গেল। এখন এই স্বাতন্ত্র্য স্মরণ রাখিয়া দেখা যাউক যে,

জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া, অন্য কোন ব্যাখ্যা দ্বারা আমার জীবত্ব বুঝিতে পারা যায় কি না? আমরা অবশ্যই বলি যে, যায় না। যুক্তি-পথে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভাল আর মন্দের বিচার সকলেই করিয়া থাকে। ভাল কি, আর মন্দ বা কি, ইহা লইয়া মত-ভেদ হয় বটে; কিন্তু কোন কিছু যে ভাল, আর কোন কিছু যে মন্দ, এ প্রভেদ সকল লোকেই মানে। যাহা উদ্দেশ্যের সাধক, যাহা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা ভাল; এবং যাহা উদ্দেশ্যের বাধক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত বা অনিষ্ট হয়, তাহা মন্দ; ইহা সকলেই মানে। তবে যে, ভাল মন্দ লইয়া মত-ভেদ হয়, সে কেবল উদ্দেশ্য পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া। আরও একটা কথা এই যে, দুঃখ-বর্জ্জন বা সুখ-লাভ সকলেরই উদ্দেশ্য; সুতরাং যাহাতে সুখ হয়, তাহাই ভাল, যাহাতে দুঃখ হয়, তাহাই মন্দ, ইহাও সর্ব্ব-সম্মত কথা। কিসে সুখ হইবে, তাহা লইয়া মত-ভেদ থাকিতে পারে। শেষে দুঃখ হইবে জানিয়া আপাত সুখকর বস্তুর সেবাও কেহ কেহ করিতে পারে; কিন্তু মূল বাঞ্ছা সুখে। ইহাতে বুঝা যায় যে, পন্থা-ভেদ, কার্য্য-প্রণালীতে ভেদ হয় বটে; কিন্তু ভাল আর মন্দের লক্ষণ লইয়া কোন ভেদ কখনই হয় না।

এই যে ভাল আর মন্দের ভেদ আমরা করি, ইহাতে দুইটি অভিপ্রায় দেখা যায়। এক সুখ এবং দুঃখের পার্থক্য রক্ষা করা এবং দ্বিতীয় ভাবী কর্ম্মের ফলাফল অনুমান করা; অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম করিলে সুখ হইবে, কোন্ কর্ম্ম করিলে দুঃখ হইবে, ইহা স্থির করিয়াই আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ এই ভাল মন্দের বিচারে এইটুকু বুঝা যায় যে, আমার কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিব, এ ধারণা সকলেরই আছে। সমাজ-নীতি, এই মূল-সূত্র অবলম্বনে রচিত হয়, শিল্প-বিজ্ঞানাদির

উৎকর্ষ-চেষ্টা, এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই করা হয়। প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ ক্রিয়াতে এই জন্যই লোকের এত অধিক আস্থা হয়, কিন্তু এত করিয়াও ইহজন্মে সকল ভাল কর্ম্মের ভাল ফল আমরা পাই না, সকল মন্দ কর্ম্মের মন্দ ফলও আমরা পাই না। যদি মৃত্যুর পর আমি না থাকি,—যদি অন্য কোন অবস্থায় আমি আমার কৃত-কর্ম্মের ফলভোগ না করি, তাহা হইলে এই যে ভাল মন্দের বিচার, এ বিচারের ত কোন সার্থকতা থাকে না। সংসারে সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, ভাল কর্ম্ম করিয়াও অনেকে যাবজ্জীবন বিস্তর দুঃখ-ভোগ করে। ইহজন্মের ভাল কর্ম্মের সহিত, ইহজন্মে সুখ-ভোগের কার্য্যকারক সম্বন্ধ দেখা যায় না। আবার ইহজন্মের মন্দ-কর্ম্মের সহিত, ইহজন্মের দুঃখ-ভোগেরও কার্য্যকারক সম্বন্ধ দেখা যায় না। সুখের চেষ্টা সকলেই করে, তথাচ দুঃখ পায়। দেবার্চ্চনা কিংবা দান, কিংবা সত্যকথা যদি ভাল কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, এসকল করিয়াও লোকে বজ্রপাত, সর্পাঘাত, চোরের উপদ্রব, রোগের যন্ত্রণা, শোকের পীড়ন প্রভৃতি নানা প্রকারে দুঃখ পায় কেন? হয়, বলিতে হইবে যে, নীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা প্রভৃতি কেবল বঞ্চকের বঞ্চনা মাত্র; না হয়, স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর, অবস্থান্তরে কৃত-কর্ম্মের ফলাফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যদি জন্মান্তর স্বীকার করা যায়, তবেই ভাল মন্দের বিচারে সার্থকতা আছে। যদি জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া, এই দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম, তোমার নীতি, তোমার শিক্ষা মানিব কেন? মানিয়া ফল কি? ধর্ম্মেই কি, নীতিতেই কি, শিক্ষাতেই কি, কেবল ত প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিতে বলা হয়,—কেবল ত কাম, ক্রোধ, লোভাদিকেই দমন করিতে বলা হয়। প্রবৃত্তি-সংযম, কামাদি-দমন, আশু অসুখজনক, তাহার ত সন্দেহ নাই। ধরা

পড়িলে কষ্ট বটে, পীড়া হইলে কি আঘাত পাইলে কষ্ট বটে ; কিন্তু সাবধান হইয়া চলিলে রাজ-দণ্ড, সমাজ-দণ্ড এবং পীড়াদির যন্ত্রণা অধিকাংশ স্থলেই এড়াইতে পারা যায়, ইহা কে না স্বীকার করিবে ? জগৎ-সংসারকে ফাঁকি দিয়া, সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে অনেকে প্রবৃত্তির অনুকূল পথে চলিয়া জীবন কাটাইতেছে, ইহা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তবেই দেখ, জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, সর্ব্ব-জন-সম্মত সৎ, অসতের বিচার উঠাইয়া দিতে হয়,—বাতুল, প্রলাপ বলিয়া উঠাইয়া দিতে হয়,—অথবা বঞ্চকের কথা বলিয়া উঠাইয়া দিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই কৃত-নাশের আশঙ্কা করিয়া, জন্মান্তর স্বীকারের যুক্তি সিদ্ধান্ত দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, কৃত-কর্ম্ম কখনই নষ্ট হইবে না। আমার সৎকর্ম্মের সুফল, আমি অবশ্যই ভোগ করিব,—আমার অসৎ কর্ম্মের কুফলও আমি অবশ্যই ভোগ করিব। এ শরীরে ভোগ করিব না বটে ; কিন্তু এ শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আমি ফুরাইব না,—জন্মান্তরে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিব। কৃত-নাশ কোন মতেই হইবে না।

জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, কেবল যে কৃত-নাশের আশঙ্কা হয়, তাহাও নহে। অকৃতাভ্যাগম দোষও ঘটে ; অর্থাৎ আমার যাহা অকৃত, আমাতে তাহার আগমন হয়। আমি যে কর্ম্ম করি নাই, আমি তাহার ফল পাই। সৎকর্ম্ম কখন করি নাই, অথচ রূপ, যৌবন, ধন, জন ও মর্য্যাদার সুখ ভোগ করি। অসৎ কর্ম্ম কখন করি নাই, অন্ধ, বধির অথবা অন্যরূপে বিকলাঙ্গ, রোগ, শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া দুঃখ ভোগ করি। কেহ ঐশ্বর্য্যশালী রাজার গৃহে জন্ম-গ্রহণ করে,—ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র রাজভোগে পড়ে, সুরূপ হয়, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হয়। আর কেহবা ঠিক ইহার বিপরীত। এরূপ হইবার কারণ কি ? যদি বল ইহা

আকস্মিক,—তাহা হইলে, তোমার বিজ্ঞান-বুদ্ধি নাই ; বিনা কারণে কার্য্য হয়, এই কথা পদে পদে তোমায় বলিতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি শ্মশানস্থ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা যে সকল দুঃখ ভোগ করি, তাহা আমাদের আয়ত্ত নহে,—কখনই আয়ত্ত ছিল না, এই ভাবিয়া হতাশ হইতে হয়। কৃত-নাশের আশঙ্কা দেখাইয়া নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির উচ্ছেদ সম্ভাবনা,—যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলেও আবার তাহাই উপস্থিত হয়। আমি দুঃখ-জনক কর্ম্ম করি নাই, অথচ আমি দুঃখ ভোগ করিব, ইহা বড় ভয়ঙ্কর কথা। ইহ-জন্মের সুখ-দুঃখ, পূর্ব্ব-জন্মের কৃত-কর্ম্মের ফলানুসারী। ইহা স্বীকার করিলে, এ ভয়ঙ্কর কথার ভাবনা আর ভাবিতে হয় না। সকল কথাই বোধায়ত্ত হয়,—জীবের সুখ-দুঃখ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিয়মাধীন হয়,—সদসৎ বিচারে সার্থকতা হয়,—সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হয়,—ইহাই যুক্তি-সিদ্ধ। যাহাতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যতা নাই, তাহা সহস্রবার যুক্তি বিরুদ্ধ।

যাঁহারা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকার ব্যতীত ইহ-জন্মের সুখ-দুঃখের মীমাংসা বিষয়ে গত্যন্তর দেখি না। ঈশ্বর কাহাকেও অধিক সুখ, কাহাকেও অধিক দুঃখ দিবেন, কাহাকে হঠাৎ সুখ-নিকেতনে পাঠাইয়া দিবেন, কাহাকেও হঠাৎ দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিবেন, ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বর বড় বিষম ঈশ্বর। আমি সৎকর্ম্ম করিব, অথচ ফল পাইব না,—দুষ্কর্ম্ম করিব, তাহারও ফল পাইব না, ইহা জানিয়াও ঈশ্বর যদি আমাকে সংসারে পাঠাইয়া থাকেন,—আমি সৎকর্ম্ম করিব, অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব, এই অভিপ্রায় করিয়া, ঈশ্বর যদি আমাকে ইহ-জন্মের ভোগে বঞ্চিত এবং জন্মান্তরের ফলেও বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে, সে ঈশ্বর বড় নিষ্ঠুর ঈশ্বর। কেহই বলে না যে, ঈশ্বর বিষম

কিংবা ঈশ্বর নিষ্ঠুর ; সুতরাং জন্মান্তর পরিগ্রহ, অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকার না করিলে, ঈশ্বরে বৈষম্য এবং নৈষ্ঠুর্য্য এই দোষের আরোপ করা হয়। আর যদি বল, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝা যায় না,—ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে কোন নিয়ম নাই,—ব্যবস্থা নাই,—ঈশ্বর নিতান্ত খামখেয়ালী। তাহা হইলে, আরও সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে, কোন্ বিশ্বাসে সৎকর্ম্ম করিব ? কোন্ বিশ্বাসে অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিব ? যিনি আদি কারণ, তিনি বিশ্ব-সংসারের কার্য্যকারণের সম্বন্ধের ছেদন করিলে কি রক্ষা আছে ? না,—হিন্দু কখনই একথা স্বীকার করিতে পারে না। কর্ম্ম-ফলদাতা ঈশ্বর আমার কৃত-কর্ম্ম অনুসারেই আমাকে ফল দিয়া থাকেন। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি, দুষ্কৃতি অনুসারে, আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। ইহজন্মের যে সুখের বা দুঃখের কারণ দৃষ্ট হয় না, তাহারও কারণ আছে ; সে কারণ আমারই অদৃষ্ট। যাহা পুণ্য, তাহা শুভাদৃষ্টের জনক। আমি যখন পুণ্য করি, তখন শুভাদৃষ্টেরই উপায় করি। আর ইহজন্মে যে সুখ, দুঃখ ভোগ করি, তাহা আমার পূর্ব্বার্জ্জিত অদৃষ্ট জন্যই করি। ইহা যুক্তি-সিদ্ধ। ইহার বিপরীত কথা নিশ্চয়ই যুক্তি-বিরুদ্ধ।

জন্মান্তর পরিগ্রহ স্বীকার করিবার যুক্তি দেখা গেল। আরও বহুতর যুক্তি, ইহার অনুকূলে আছে। সমস্ত সম্ভব বা অসম্ভব তর্কের মীমাংসা আমাদের শাস্ত্রে আছে। আমরা জানিনা বলিয়াই আমাদের বুদ্ধি-বিপ্লব ঘটিয়াছে। আমরা এ সকল কথা অবগত হইয়াও যদি বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা নিতান্তই হতভাগ্য। বুঝিব যে, আমরা উচ্চকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু কর্ম্ম-দোষে উচ্চ-জন্মের সমস্ত মাহাত্ম্য একবারে হারাইয়াছি।

২। জীব-দেহে জীব ও র অবস্থান।

জগতে সাধারণতঃ তিন প্রকার পদার্থ দেখা যায়,—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্। পদার্থসমূহের মধ্যে এমন বস্তু দেখা যায় না, যাহার আদৌ কোন গুণ নাই। আমরা যাহাকে যৎসামান্য বলিয়া জানি, তাহারও এমন মহৎ গুণ আছে, যাহা এক সময়ে অসাধারণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

পরমাণুর সমষ্টি লইয়াই পদার্থের উৎপত্তি। কোন পদার্থ, কালে বিকৃত ভাব ধারণ করে; কিন্তু তাহার পরমাণুর ধ্বংস হয় না। পরমাণু সকলের যে সকল শক্তি বা গুণ আছে, তাহা চিরকালই উহাদের ভিতরে একভাবে থাকে। মিছিরির রস হইতে মিছিরির দানা বাঁধে,—লবণ জলে গুলিলে, উহার পরমাণু সকল একত্র হইয়া সংহত হয়। ইহাতে উহাদের সমজাতীয় পরমাণুকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা দেখা যায়। এইরূপ উহাদের মধ্যে বিয়োজন শক্তিও রহিয়াছে। একটি ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর সহিত আর একটি ভিন্ন প্রকারের বস্তুর সংযোগ হইলেই, উভয়ে পৃথক্ হইয়া পড়ে। পরমাণু সকলের এই রূপ নানা প্রকার শক্তি বা গুণ আছে বলিয়া, পৃথিবীর নানাবিধ বস্তুতে বিবিধ গুণের সুপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জ্ঞান সামান্য, তাই, প্রকৃতির সকল তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যতই প্রকৃতি-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিবে, ততই তাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। প্রকৃতির কার্য্য-কারণভাব দেখিয়াই মনুষ্যের যাহা কিছু জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রকৃতি তাহার নিজভাব, অর্থাৎ যাহার যে গুণ বা শক্তি আছে, তাহা কোন কালেই পরিত্যাগ করে না। অগ্নির বিকাশ ও দাহিকা শক্তি আছে। ঐ বিকাশ ও দাহিকা শক্তি, কোন কালেই অগ্নিকে ছাড়িবে না। অগ্নির অন্তর্ভূত আর এমন কোন শক্তি বা গুণ নাই, যাহাতে নিজ-গুণের বিপরীত ভাব দেখাইতে পারে। এইরূপ জলের শৈত্য গুণ আছে। শৈত্য গুণ আছে বলিয়া, জলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সমূহের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ গুণ আছে বলিয়া, আমরা উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানি; অর্থাৎ একটির গুণ অপরে নাই। যদিও পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সমূহের গুণ পরস্পর বিভিন্ন; তথাপি বস্তু বিশেষে উহাদের সম্মিলনে পৃথক্‌বিধ কার্য্যের প্রকাশ দেখা যায়। হরিদ্রা স্বভাবতঃই পীতবর্ণ এবং চূর্ণ স্বভাবতঃই শ্বেত; কিন্তু উহাদের পরস্পর সম্মিলনে লোহিত বর্ণ উৎপাদন করে। এই স্বাভাবিক গুণ, যাহার যেরূপ আছে, তাহা থাকিলেও যখন কোন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ, উহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়, তখন একটি স্বতন্ত্রশক্তি বা গুণ প্রকাশ পায়। এই গুণকে যৌগিক বা মিশ্র গুণ বলে। পৃথিবীতে যৌগিক পদার্থই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্যই কোন একটি পদার্থের মধ্যে, যে যে জাতীয় মূল পরমাণুর সমষ্টি থাকে, তাহাতে ততগুলি গুণ বা ধর্ম্ম দেখা যায়; এটি উহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। আমাদের শরীরে রস, রক্ত তরল পদার্থ আছে বলিয়াই, ইহাতে আমরা জলের অবস্থিতি জানিতে পারিতেছি,—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুর চলাচল আছে বলিয়াই, বায়ুর অবস্থিতি বুঝিতে পারিতেছি,—শরীরে উষ্ণতা ও বিকাশ গুণ আছে বলিয়াই, অগ্নির অবস্থিতি জানিতে পারিতেছি,—শরীরের অভ্যন্তরে শূন্য স্থান আছে বলিয়াই, আকাশের অবস্থিতির পরিচয় পাইতেছি,—আর অস্থি, মাংস, শিরা, মস্তিষ্ক, বসা ও রক্ত ইত্যাদিতে নানা প্রকার

পার্থিব পদার্থের সম্মিলন আছে বলিয়াই, ইহাতে পৃথিবীর অবস্থিতি জানিতেছি। এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থের সমষ্টিকেই নর-দেহ বলে। আর এই নর-দেহই জীবাত্মার বাসস্থান। উহার রচনা-কৌশল এমনই সুন্দর যে, প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে, জ্ঞানময় ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের বিকাশ ও অনন্ত মঙ্গলের ভাব, উহাতে কেমন বিরাজ করিতেছে! তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলে যদি জ্ঞান ও মঙ্গলের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না থাকিত, তবে এই অনিত্য জড়-দেহে অবস্থান কালে, জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইত না।

এক্ষণে দেখা উচিত, এই নর-দেহ, যে জ্ঞানময় ও মঙ্গলময় জগৎ-পিতার নিয়মে সৃষ্ট হইয়াছে, এই দেহকেই কি জীব ও তাহার আত্মা বলা যায়, না, এই দেহ ছাড়া জীব ও আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ? এবিষয়ে কাহার কাহার মনের ভাব এরূপ দেখা যায় যে, প্রকৃতি হইতেই যখন জীবের দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তখন ঐ দেহের ক্রিয়াগত ভাব জীব ও আত্মা, অর্থাৎ জীব যাহা, প্রকৃতিও তাহাই হইতেছে; জীবের যে জ্ঞান, উহা তাহার দেহের স্বয়ং-সিদ্ধভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহের মধ্যে প্রকৃতি ভিন্ন, জীব ও জীবাত্মা বলিয়া যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা কেবল কল্পনা মাত্র।

এই মূল-তত্ত্বের বিষয়গুলি স্থির করিতে হইলে, অগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। এই প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে যখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ঐ দুইটি বিষয় নির্ণয় না হইলে, এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া উঠে না। একারণ ইহাদের বিষয়, অগ্রে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

প্রকৃতি যাহা, জড় তাহাকেই বলে। আর পুরুষ যাহা, তাহাকেই জ্ঞান ও চৈতন্যময় ঈশ্বর বলা যায়। জ্ঞানময় ঈশ্বরের

ইচ্ছা-শক্তিতে প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং উহার যে যে গুণ আছে, সে সকলও তাঁহারই প্রদত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া যখন এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, তখন তাহার মূলে, সেই একমাত্র জ্ঞানময়ের অসীম ক্ষমতার বল, অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্ব-সংসারে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহাতে বিশ্ব-পিতার আবির্ভাব নাই। অথচ ঐ পদার্থ সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পুরুষকে ধরিয়া লইতে হয়; সুতরাং এরূপ স্থলে সৃষ্ট-বস্তুর অপেক্ষা স্রষ্টার যে অসীম ক্ষমতার বল রহিয়াছে, এবং উহা যে একটি স্বতন্ত্রভাব, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে একথা, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞানময় পুরুষ প্রকৃতিকে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, সে সকল, উহার ভিতরে চিরদিন একভাবে রহিয়া যাইবে; অর্থাৎ প্রকৃতি পৃথিবীর আদি কালে যে ভাবে ছিল, অনন্ত কাল ঐ ভাব লইয়া থাকিবে,—উহার গুণের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তুর শরীরে, পৃথিবীর আদি কালে যে সকল পরমাণুর সমষ্টি ছিল, তাহাদের শরীরে, এখনও ঐ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। আর উহাদের যাহার যে প্রকার গুণ ছিল, এক্ষণেও তৎসমুদায়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রকৃতির এই স্বভাবসিদ্ধ ভাবের যদি কোন বিভিন্নতা দেখা না গেল, তবে উহাতে জ্ঞানের ভাব কেমন করিয়া আরোপিত হইতে পারে? জ্ঞান, প্রকৃতির স্বয়ং-সিদ্ধভাবে উৎপন্ন হইবার নহে। জ্ঞান যদি প্রকৃতির স্বয়ং-সিদ্ধভাবে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অচেতন পদার্থেও জ্ঞানের আবির্ভাব দেখা যাইত। জীব, জড়-দেহে থাকে বলিয়া, উহার জ্ঞানের ভাব প্রকাশ পায়। এই জন্যই জীব যতক্ষণ যে দেহ অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারই জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করিবার

ক্ষমতা দেখা যায়। যখন জীব উহার অবলম্বন পরিত্যাগ করে, তখন উহা পূর্ব্বে যে জড় ছিল, তখন সেও সেই ভাবে দেখা দেয়। জড়ের জড়ত্ব কোন কালেই যাইবার নহে এবং জ্ঞানের ভাব যে চৈতন্য, ইহারও অভাব কোন স্থানে দেখা যায় না।

সাধন-কার্য্যে লিপ্ত হইতে গেলে, মনুষ্যকে অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিচালনে রত থাকিতে হয়। ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিচালনের ক্ষমতা যতই বাড়িতে থাকে, ততই সে আপনার অন্তরে অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। পরে ঐ জ্যোতির অভ্যন্তরে পরমাত্মার দর্শন মিলে। এই জন্যই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের অংশকেই জীবাত্মা বলে। ঐ আত্মাই উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ-কোষ; অর্থাৎ পরমাত্মার হৃদয়রূপ সিংহাসন। মলিন দর্পণে, যেমন কোন জ্যোতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, তেমনই মলিন অন্তরে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। অন্তর বিশুদ্ধজ্ঞানে সুমার্জ্জিত হইলে, উহাতে আত্মার আদি ভাব সুপ্রকাশিত হয়; তৎপরে তাহাতে, অনন্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মার দর্শন মিলে; অর্থাৎ পূর্ণ-ব্রহ্মের আবির্ভাব দেখা যায়। পরমাত্মা যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়েন, তদ্রূপ তিনি অপরিসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া, তাঁহাকে জ্ঞানময় বলা হয়। সেই জ্ঞানের অংশ যখন আমাদের জীবাত্মা, তখন যতদিন ইহা আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে থাকিবে, তত দিন উহার জ্ঞানভাব প্রকাশ না পাইবে কেন? সজীব দেহই আত্মার বাসস্থান; সুতরাং জীব দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেই, তাহার চৈতন্যের লোপ হয় না।

জীবাত্মা পদ্ম-পত্রস্থিত জল-বিন্দুর ন্যায় জীবের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করেন। তিনি নিষ্ক্রিয় ও জীবের ক্রিয়া-সাক্ষী মাত্র।

এ অবস্থায় তাহাকে লিপ্ত বা নির্লিপ্ত এ উভয় ভাবেই ধরা যাইতে পারে। জীব জড়-দেহে থাকিয়া জ্ঞানের কার্য্য প্রকাশ করে বলিয়া, অনেকের এরূপ ধারণা যে, ঐ দেহের ক্রিয়া-বলকেই জীব ও জীবাত্মা, এবং উহারই স্বয়ং-সিদ্ধ-ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি দেহের স্বয়ং-সিদ্ধভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এরূপ স্বীকার করা যায়, তবে, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা রক্ষা পায় কৈ? হয়, বলিতে হইবে, প্রকৃতি যাহা, পুরুষও তাহা। এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত ধরিয়া না লইলে, প্রকৃতির স্বয়ং-সিদ্ধভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এটি বলা যাইতে পারে না। যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিষয় অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া, বিশ্ব-বিধাতার অসীম মঙ্গলভাব ঘোষণা করিতেছে, তাহা যদি এক প্রকৃতির কার্য্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে বলিয়া, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, নাস্তিকদের মতের সহিত, ইহার কোন অনৈক্য দেখা যায় না। অতএব ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, এই মূল-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া, বিষম বিড়ম্বনার পরিচয় মাত্র।

এ বিষয়ে আর একটি কথা এই, মনুষ্য ও অন্যান্য জীব-জন্তুর শরীরে পৃথিবীর আদি কালে যে সকল পরমাণুর সমষ্টি ছিল, এখনও ঐ সকল উহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর পৃথিবীর আদিকালে ঐ সকল পরমাণুর যে সকল গুণ ছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ দেখা যায়। এই বিষয়টি লইয়া বিচার করিলে, প্রকাশ পায় যে,প্রকৃতির অন্তর্ভূত গুণগুলি ভিন্ন যদি উহার স্বয়ং-সিদ্ধ জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে জীবাদির উৎপত্তি বিষয়ে, কোথায়ও উহার ভিন্নভাব দেখা যায় না কেন? প্রকৃতির জ্ঞানের অভাব আছে বলিয়াই, জ্ঞানবিশিষ্ট জীবোৎ-পাদনে উহার ক্ষমতা দেখা যায় না। প্রকৃতির অন্ধ-শক্তি থাকা

প্রযুক্ত, অন্ধ-শক্তিবিশিষ্ট পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা তাহাতে দেখা যায়। নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির উৎপত্তি, এবং জল-ঝড়, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, এ সকল বিষয়ে ইহার প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাইবে। প্রকৃতির স্বয়ং-সিদ্ধ জ্ঞানভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, সে অবাধে কত জীব-জন্তু সৃষ্টি করিতে পারিত। দুস্তর বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, যেখানে আদৌ মনুষ্যের সমাগম নাই, তথায়ও বহুবিধ মনুষ্য দেখিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের সংযোগ বিনা যখন কোথায়ও তাহাদের সন্তানোৎপাদন দেখা যায় না, তখন জীব-দেহ সৃষ্টির অগ্রে, অবশ্যই একটি জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ইচ্ছাতে যে, দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে এ বিষয়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পুরুষের ইচ্ছা-শক্তির অধীন হইয়া, প্রকৃতি তাহার কার্য্যের সাহায্য করিয়া থাকে।

দেহ, জীব ও জীবাত্মার আশ্রয়-স্থান। আশ্রয়-স্থান সর্ব্বত্রই নির্জীবতার পরিচয় দিয়া থাকে; তথাপি যে আশ্রয়ে জীব বাস করে, তাহার কার্য্য-প্রণালীর ভাব দেখিলে, উহাকে অনেকাংশে সজীব বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই জন্যই ঐ ধারণা আসিয়া পড়ে। গৃহস্থের আবাস-স্থানের বিষয় ধরিয়া, একবার আলোচনা কর, ইহাতেও ইহার অনেকটা আভাস প্রতিলক্ষিত হইবে। যে বাটীতে মনুষ্য বাস করে, উহার পরিচ্ছন্নতা, উহার দ্বার, জানালা খোলা ও বন্ধ করার ভাব, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদির অবস্থান, রন্ধন, ভোজন, গমনাগমন, নানা বিষয়ের কথা লইয়া পরস্পরের কথোপকথন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, আহ্লাদ, আমোদ ও সম্ভাষণ ইত্যাদি কার্য্য যেখানে নিত্য সম্পন্ন হইতে থাকে, তখন উহাও একটি কৃত্রিম

জীবাত্মাস প্রকাশ করিয়া দেয়। এ স্থলে ঐ গৃহকে যেমন জীব-পদার্থ বলা যাইতে পারে না; তদ্রূপ জীব ও জীবাত্মার অধিষ্ঠানভূত যে শরীর, ইহাকেও জীব ও জীবাত্মা বলা যায় না। জীব ও তাহার আত্মা স্বতন্ত্র, এবং তাহার আলয় বিভিন্ন।

প্রকৃতির আদৌ জ্ঞানশক্তি নাই; এই জন্যই উহা অচেতন বলিয়া অভিহিত হয়। কতকগুলি গুণ অবলম্বন করিয়াই উহার সৃষ্টি। ঐ সকল গুণের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি না থাকাতে, উহার গুণকে অন্ধ-শক্তি বলে। ঐ অন্ধ-শক্তির সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য বিস্তর বিভিন্ন। প্রকৃতির গুণ জ্ঞাত হইয়া, আমরা উহার দ্বারা আপনাদের ইচ্ছামত নানাবিধ কার্য্য সমাধা করিয়া লই। প্রকৃতি যখন পরাধীন হইয়াও আপনার গুণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়, তখন স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, উহার ভিতরে ইচ্ছা, অনিচ্ছা প্রভৃতি জ্ঞানের কার্য্য আদৌ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহার যে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই, তাহার সে বিষয়ক কার্য্য নাই, এবং যাহার কোন বিষয়ের কার্য্য আছে, তাহার তদ্বিষয়ক মূলও আছে বলিয়া, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতির জ্ঞান থাকিলে, তাহা কোন না কোন সময়ে, অবশ্যই উহার কার্য্যে প্রকাশ পাইত। এটি স্থির নিশ্চয় কথা।

প্রকৃতি, জ্ঞানময়ের ইচ্ছা-শক্তির অধীন। এ অধীনতা পরিত্যাগ করিবার, উহার সামর্থ্য নাই। এই স্থিরবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, আমরা প্রকৃতি লইয়া, আপনাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সমর্থ হই। তবে, এটি ঠিক, আমরা যেখানে প্রকৃতিগত গুণ অবগত না হইয়া, উহাদের দ্বারা কোন কার্য্য করিতে মনন করি, তথায় অনেক কার্য্যে বিসদৃশভাব দেখিতে পাই। ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বর প্রকৃতিকে যে যে গুণ প্রদান [illegible]ন, অগ্রে উহার সেই গুণগুলির পরিচয়

রওয়া আবশ্যক। নতুবা আমাদের অভিলষিত কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। যে, প্রকৃতির গুণের পরিচয় লয়, তাহার অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার থাকা যেমন নিশ্চয় কথা, তেমনই তাহার অস্তিত্বে কোন সংশয় আসিতে পারে না। তবেই দেখ, জ্ঞানের কার্য্য, ও প্রকৃতির গুণ, যদি স্বতন্ত্র পদার্থ হইল, তাহা হইলে, আমাদের শরীরের স্বয়ং-সিদ্ধভাবে যে জ্ঞানের কার্য্য প্রকাশ পায়, এ কথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? শরীরে জ্ঞানের সত্তা; অর্থাৎ জীব অবস্থিতি করে বলিয়াই, উহা জ্ঞান প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, এইটিই বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রকৃতি ও জ্ঞান বিভিন্ন বস্তু। প্রকৃতির জ্ঞানাভাব; এই জন্যই প্রকৃতি জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে না। আর জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। যেখানে জ্ঞান আছে, তথায় পরিচালনে, বৃদ্ধি পায়, এবং যেখানে পরিচালন নাই, তথায় স্ফূর্ত্তি পায় না। অজ্ঞান, যদি জ্ঞানের ক্রিয়া দেখিয়া, মনের অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা পায়, তবে তাহার জ্ঞান ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এ স্থলে এইটি বুঝাইয়া দিতেছে, যাহার স্বল্প জ্ঞান আছে; অর্থাৎ যাহার অন্তরে জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, তাহারই জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে পারে। আর যাহাতে একবারে জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই, সে কেমন করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিবে? বংশী বাদন কর,—সুস্বরে তাল-মান-লয়-যুক্ত গান গাইতে থাক,—দেখিবে কেহ হাতে তালি দিয়া তাল দিতেছে,—কেহ ঘাড় নাড়িয়া লয় দিতেছে,—আর কেহ গানের ভাবে গলিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বংশী পূর্ব্বে যে ভাবে অচেতন ছিল, এখনও উহাকে সেই ভাবে থাকিতে দেখা যায়। আবার সেই বংশীকে লইয়া দিবারাত্র বাজাও, সে বাজিবে; কিন্তু এক দিনও একটি গান সে নিজে গাইবে না। এস্থলে দেখা যাইতেছে, বংশীর শব্দকারিতা যে গুণ, তাহা অন্যের উপর

নির্ভর করিতেছে, এবং উহার গঠন-প্রণালী এক জন জ্ঞানবিশিষ্ট শিল্পীর কার্য্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই রূপ জগতে জড়-ধর্ম্মীর যে অচেতন ভাব, তাহা সর্ব্বত্র দেখাইয়া দিবে।

এই বিষয়টি, অপর একটি উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। বীজ বা শস্য হইতে উদ্ভিদ্ জন্মে। মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও তেজঃ ইত্যাদির সাহায্য পাইয়া, উহারা বর্দ্ধিত হয়। বৃক্ষগণ মূল দ্বারা মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিতেছে,—শাখা-প্রশাখা ও পত্র দ্বারা বায়ু ও তেজঃ গ্রহণ করিতেছে। উহারা এই রূপ নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া, যথাসময়ে উহাদের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং পুনর্ব্বার বীজ বা শস্য দেখা দিতেছে। বৃক্ষাদির এই স্বাভাবিক কার্য্যকারণ ভাব লইয়া আলোচনা কর, দেখিবে. বিশ্ব-রাজ্যের অসীম সৃষ্টি-কৌশল, উহাদের ভিতর কেমন বিরাজ করিতেছে! অথচ এই সকল ক্রিয়াগত কার্য্যে জ্ঞানের অস্তিত্ব কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। রাসায়নিক-ক্রিয়া বা প্রকৃতির গুণ, জড়ের নিত্য-স্বধর্ম্ম,—উহা জড়কে কখনই পরিত্যাগ করে না। জ্ঞান স্বতন্ত্র বস্তু। ঐ জ্ঞান না থাকাতেই উদ্ভিদ্-রাজ্য, ভিন্নভাবে আসিয়া পড়িয়াছে; কেবল পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যাদির সংযোগে অঙ্গাদির বৃদ্ধি ও ফুল ফলের উৎপত্তি দেখিয়া, যদি উহাদিগকে জীব-জন্তুর সহিত তুলনা করা যায়, ইহাতে প্রকৃতির কয়েকটি গুণ অবলম্বন ভিন্ন, আর কিছুই দেখা যায় না,—বীজ ও জীব-দেহের সঙ্গে পাঞ্চভৌতিক যে সামঞ্জস্য-বিধান আছে, কেবল তাহাই বিকাশ পায়। জ্ঞানের ভাব,—ইচ্ছা, অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, উহাদের মধ্যে কৈ দেখা যায়? মনুষ্যের শরীর যদিও প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য, যাহা তাহার শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে, তাহারও বিরুদ্ধে সে চলিবার চেষ্টা পায়। যেখানে

প্রকৃতিগত কার্য্যে তাহার শরীরের অপকার ঘটে, তথায় তন্নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সুস্থতা লাভ করে,—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত হইতে দেখিলে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা তাহাকে দমন করে, সত্ত্ব-গুণপ্রদ দ্রব্য সকল পান ভোজন করিয়া, নিজে সংযমী হইতে শিক্ষা পায়,—যোগাঙ্গ যাহা তাহার বুদ্ধি-বলে, প্রকৃতি-দেবীর নিকট শিক্ষা করিয়াছে, সে তাহারই বলে, তাহার অন্তশ্চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া লয়, তৎপরে মোক্ষ-পথের অনুগমন করে। এই সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ শরীরে জীব ও জীবাত্মার অবস্থিতি অনুভব না করিয়া, প্রকৃতিতে জ্ঞানের সত্তা কল্পনা করিয়া লয়েন, তাঁহারা ধর্ম্মের মূল-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হয়েন।

জীব-দেহ, একটি যন্ত্র বিশেষ। যতক্ষণ ঐ যন্ত্র বিকল বা বিশৃঙ্খল না হয়, ততক্ষণ জীব উহারই মধ্যে অবস্থিতি করে। যখন শরীররূপ যন্ত্র বিকল হয়, তখন সে উহাকে পরিত্যাগ করে। এ বিষয়ে এ তর্কও উঠিতে পারে,—জীবের যখন জ্ঞানের বল রহিয়াছে, তখন শরীররূপ যন্ত্র বিকল হইলে, সে নিজের বুদ্ধি-বলে, উহাকে সুকল করিয়া লয় না কেন? জীব যদি এরূপ করিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে কাহাকে কি অকাল মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইত?

আমরা এক্ষণে জীবের কার্য্যকারণ ভাব, যতদূর জানিতে পারিতেছি, তদনুসারে উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতেছি। আত্মার মরণশীল গুণ নাই, এই জন্যই আত্মাকে অমর বলে। যেখানে জীব, সেই খানেই আত্মার অবস্থান। জীবের মুক্তি সহজ ব্যাপার নহে। জীবের কার্য্যই মুক্তির হেতু; এই জন্যই জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া, কার্য্য করিতে লিপ্ত হয়। যেখানে জীব দেহকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তথায়

বুঝিতে হইবে যে, তাহার ঐ দেহের কার্য্য শেষ হইয়াছে। তখন যে দেহকে আশ্রয় করিলে, তাহার বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া,নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় করিবার উপযুক্ত হইতে পারে, সে তাহার আত্মার সঙ্গে যাইয়া, তাহাতেই আশ্রয় লয়। মনুষ্যের আশা ভরসা, জ্ঞান-পিপাসা ও ধর্ম্মের লালসা যদি একটি জন্মে পূরণ হইত, তাহা হইলে, জন্ম-মৃত্যুর আধিক্য এ সংসারে এত বৃদ্ধি পাইত না। মনুষ্য, কর্ম্ম অনুসারে ফল-ভোগ করে, ফল-ভোগের কাল অতীত হইলেই, তাহাকে দেহান্তরে যাইয়া, বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয়। এই রূপে যত দিন না, তাহার কার্য্যের শেষ হইবে,তত দিন তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতেই হইবে। মনুষ্যের জ্ঞান আছে সত্য, ঐ জ্ঞান-যোগে মানুষ তাহার শারীরিক ও মানসিক বিকলতার সংস্কার যত দূর সম্ভব, করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু যেখানে কোন উপকার না দর্শে, সেখানে বুঝিতে হইবে, তাহার এ জন্মের ফল-ভোগের সময় অতীত হইয়াছে। এ জন্যই তাহাকে দেহ-ত্যাগ করিতে হয়। যদিও দেহের সঙ্গে মৃত্যুর এই রূপ চিরসম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি আত্ম-হত্যা ও স্বাস্থ্যের যথাবিহিত নিয়ম পালন না করিয়া, শরীরের অপকার ঘটান বড়ই অবৈধকাজ। এ সংসারে থাকিবার কালে ঈশ্বরের নিয়মে চলিয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি লাভ করাই, জীবের শ্রেষ্ঠ কার্য্য। যিনি একাজে রত থাকেন, তাঁহার অকাল-মৃত্যু-জনিত অভাব, নিশ্চয়ই পূরণ হইয়া যায়। তিনি যে লোকে জন্ম গ্রহণ করেন, তথায় তাঁহার উন্নতির ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিবার নহে। অতএব আমরা ভাবী কালের সুফল লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, যদি আত্মোন্নতি করিতে পারি, তাহা হইলে, এ সংসারে কাহাকেও অকাল-মৃত্যু-জনিত ক্ষোভে কাতর হইতে হয় না। জীব জন্ম-মৃত্যুর অধীন। এ অধীনতা

ত্যাগ পাইলে, কর্ম্ম-ফল ভোগের বিষয়ে তাহার বিস্তর ব্যাঘাত হয়। জন্ম-মৃত্যু আছে বলিয়াই, জীব উন্নতি ও অধোগতির ক্রমকে লাভ করিয়া, ভাবী মঙ্গলের পথ ধরিতে সমর্থ হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে চলা জীবের ধর্ম্ম নহে। এই জন্যই তাহার জ্ঞান-বল থাকিলেও সে ঐশ্বরিক নিয়মে চলে।

উন্নতির দিকে ধাবিত হইলে, জীবের জ্ঞান ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে তাহার জ্ঞান থাকা, যেমন স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, জড়-ধর্ম্মী দেহ তেমনই অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়া থাকে; অর্থাৎ উহার জড়ত্ব কোন কালেই যাইবার নহে। এই দুইটি বিষয়ের কার্য্যকারণ ভাবের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকাশ পায়, জড়-ধর্ম্মী দেহ, স্বয়ং-সিদ্ধভাবে কখনই জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না।

৩। এ সংসার পরীক্ষার স্থল।

কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্যই, জীব জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবের সুখ-দুঃখ, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্য-বলে, জীব ইহ-জন্মে শ্রেষ্ঠ-কুলে, শ্রেষ্ঠ পদবীতে আশ্রয় পায়। তখন সে বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষে ও ধনমানের আধিক্যে সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। আর যিনি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলে, ইহজন্মে ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্মের সরল-পথ ধরিয়া চলেন, তাঁহার পুণ্য ও সুকৃতির বলে, পুনর্ব্বার পরজন্মে অধিকতর উন্নতি লাভ হয়। আবার যদি কেহ এ সংসারে নানা বিষয়ে উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও আপনার উন্নতি করিতে না পারেন, তাঁহার ভাবী অধোগতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। পাপ পুণ্যের ফলের গুণে, জীবের এই দশা ঘটে। অকৃত-পুণ্য পাপাত্মারা ইহজন্মে নীচ-কুলে, জন্ম-গ্রহণ করিয়া, যে নিয়ত নীচাশয়ের কাজে রত হয়, উহা তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত মহা-পাপের [illegible] ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঈশ্বর মনুষ্যকে হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। উঁহারই বলে মানুষ কোন্‌টি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ কাজ, নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে, এবং ইচ্ছানুসারে চলিতেও পারে। ইহাকেই মনুষ্যের স্বাধীনতা বলে। এই স্বাধীনতার গুণে, মনুষ্য ভাল করিতে ইচ্ছা করিলে, আপনাকে ভাল করিতে পারে, এবং সেই ইচ্ছা না থাকিলে, আপনার মন্দও করিয়া থাকে। এই ভাল-মন্দ, যাহা মনুষ্যের ইচ্ছাধীনে রহিয়াছে,

তাহা থাকিয়াও মনুষ্য দুঃখ ভোগ করে কেন? কে না ইচ্ছা করে, সুখে থাকিব; অথচ কষ্ট পায়, ইহার কারণ কি? কোন্ ধনাধিপতি ইচ্ছা করে যে, সে নির্ধন হইয়া যথোচিত কষ্ট পায়? কোন্ পিতা মাতা এমন কামনা করে যে, তাহার পুত্র-কন্যা হিতাহিত জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়া, পশুভাবাপন্ন হয়? এমন লোক দেখা যায় না, যাহার সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য নাই? তবে কেন, তাহাদের মধ্যে, কেহ চির-দুঃখী, কেহ বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়? সমাজ-ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে দেখা যায় যে, সকলেই নিজ নিজ সুখ পাইবার জন্য চেষ্টিত। তাহাদের ইচ্ছা, কার্য্য ও পন্থা বিভিন্ন থাকিতে পারে; কিন্তু সকলেই কোন না কোন রূপে সুখী হইবে, তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছে বা মনে মনে বাসনা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ আপন অভিলষিত কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতেছে,—কেহ আংশিক ফল লাভ করিতেছে,—কেহ আপন ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতে গিয়া, বিপদাপন্ন হইতেছে,—আর কেহ বা আজীবন কেবল দুরাশার গুরু-ভার বহন করিয়া, জীবনকে ক্ষয় করিতেছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্তর ঘটিবার কারণ কি? ইহাদের মূল-ইচ্ছা ত সকলেরই এক, তবে কেন এরূপ ঘটে?

মনুষ্যের পূর্ব্ব-জন্ম ছিল, ইহা যেমন নিশ্চিত, তাহার পর-জন্ম আছে, ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত। কর্ম্ম-ফলদাতা জগদীশ্বর সকলকেই তাহাদের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে দেন, ইহাতে তাহাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে বলিয়া, ইহাও মনুষ্যের একরূপ স্বাধীনতা; কিন্তু এ স্বাধীনতার সঙ্গে, প্রকৃত স্বাধীনতার বিস্তর বিভিন্নতা আছে। যে স্বাধীন, তাহার কার্য্যে, মতি ও গতির কোন বাধা থাকে না। দেখ, মনুষ্যের প্রধান ইচ্ছা সুখী হইবে; কিন্তু তাহাদের মানসিক ভাব বিভিন্ন,—তাহাদের কার্য্য-প্রণালী পরস্পর বিভিন্ন। কেহ সৎকর্ম্ম করিয়া সুখী হইবে বলিয়া, তাহার

চেষ্টায় ফিরে,—কেহ অসৎকর্ম্ম করিয়া সুখী হইব মনে করে। সৎকর্ম্মে পুণ্য-সঞ্চয় হয়,—অসৎকর্ম্মে পাপ বৃদ্ধি পায়। পুণ্যের ফল অতুলানন্দ,—পাপের ফল মহাকষ্ট। এক ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, কেহ সাতিশয় সুখী হয়, আর কেহ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। তবেই দেখ, মনুষ্য যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে, তাহাদের সুখ সকলেরই অদৃষ্টে ঘটিত। কেবল নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে, একের সুখ লাভ এবং অন্যের কষ্ট ভোগ হয়; সুতরাং ইহাতেই বুঝা যায় যে, মনুষ্য প্রকৃত স্বাধীনতার কাজ, নিজে কিছুই করিতে পারে না,—তাহার অদৃষ্টের লিখন অনুসারে, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়,—তাহার যে সুখ-দুঃখ, সে কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে।

এক্ষণে ঐ অদৃষ্ট কি ও ইহার ফলাফল কিরূপে জানা যায়, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ইহাতেও প্রকাশ পাইবে যে, মনুষ্য কখনই স্বাধীন নহে,—তাহারা সকলেই ঐশ্বরিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও এ বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঐ শাস্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে, ঈশ্বর প্রাণিগণের সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের ভাবী ফলাফল অর্থাৎ শুভাশুভের নিদর্শন, তাহাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই কর, চরণ, ললাট প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঐ সকল অঙ্কিত রেখা বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্ক-সামুদ্রিক জ্যোতির্বেত্তা, মনুষ্যের অঙ্গের ঐ সকল চিহ্ন দেখিয়া, অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন যে, মনুষ্য কোন্ শকে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে, কোন্ বারে, কোন্ তিথিতে, কোন্ নক্ষত্রে, ও কোন্ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জন্ম-লগ্ন ঠিক করিয়া, কে কত কাল জীবিত থাকিবে, কাহার কয়টি পুত্র-কন্যা জন্মিবে, কাহার

জীবনের কোন্ সময়ে কি কি শুভাশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, এবং কাহার কোন্ সময়ে মৃত্যু হইবে; ইত্যাদি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা স্থিরীকৃত হয়। ঠিকুজী ও কোষ্ঠীর বিচারেও এ সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে জানিতে পারা যায়। মনুষ্য পূর্ব্ব-জন্মে কি প্রকার কার্য্য করিয়াছিল, এবং তাহার কর্ম্ম-ফলে, বর্ত্তমান-জন্মে কি প্রকার ঘটিবে, এবিষয় সাধারণের অদৃশ্য বলিয়া, উহাকে অদৃষ্ট বলে। ঐ অদৃষ্টের বিষয়, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্যই জ্যোতিষকে জীবন্ত-শাস্ত্র কহে। এক্ষণে ইহাতেও জানা যাইতেছে যে, মনুষ্য এ সংসারে আসিয়া, নিজ নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকে,—কেহই ঐশ্বরিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। অতএব মনুষ্যকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা, কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ঈশ্বরের জীব, ঈশ্বরের নিয়মে চলে,—প্রত্যেকের কর্ম্ম-ফল প্রত্যেকে উপভোগ করে, এই তাহার জীবনের কাজ; সুতরাং এ সংসার যে মনুষ্যের পরীক্ষার স্থল; এ কথাও বুঝিতে কাহার কোন সংশয় রহিল না। আর কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা জীব, ঈশ্বরের নিয়মাধীন থাকিয়া চলে, এ কথা বলিলে, তাহার যে প্রকার গৌরব হয়, তাহাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলে, বরং তদনুরূপ গৌরব প্রকাশ হয় না। মনুষ্যকে স্বাধীন বলিয়া জানিলে, ঐশ্বরিক কার্য্যকারণে অযথা দোষারোপ করা হয়,—প্রকৃতির গতি, জীবের কর্ম্ম-ফল, পূর্ব্ব-জন্ম ও পরজন্ম, এ সকল বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়।

বালক বিদ্যালয়ে যাইয়া, যেমন শিক্ষা পায়, পরীক্ষা কালে, তাহার কিছুই অপ্রকাশিত থাকে না। তদ্রূপ মনুষ্য পূর্ব্বজন্মে কি প্রকার কার্য্য করিয়াছে, তাহার ফলাফল যখন এ সংসারে প্রকাশ পায়, তখন ইহা তাহার যে, পরীক্ষা-স্থল, একথা কে অস্বী-

কার করিবে? আমরা ধার্ম্মিককে ধর্ম্মাত্মা বা পুণ্যাত্মা বলি, এবং পাপীকে পাপাত্মা বা দুরাত্মা বলিয়া থাকি। যে বালক লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী, তাহার পরীক্ষা যেমন অনায়াস-সাধ্য ও সন্তোষজনক; অনাবিষ্ট বালকের পরীক্ষা তেমনই কষ্টকর ও অসন্তোষজনক। সেই প্রকার পুণ্যাত্মার কার্য্যগুলি সাধারণের সন্তোষজনক ও তৃপ্তিকর হয়। আর পাপাত্মার কার্য্য-কলাপ, তেমনই সমাজের অসহ্য ও অসন্তোষজনক হইয়া উঠে। অনাবিষ্ট ও অমনোযোগী বালক বাৎসরিক পরীক্ষার ফলে যদি পুরস্কার না পায়, তাহা হইলে, তাহার পিতা মাতা যেমন তাহাকে একবারে বিদ্যা শিক্ষা দিতে বিরত হয়েন না; বরং তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার শিক্ষা-বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হয়েন; তদ্রূপ যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর সকলেরই নির্ভর, সেই দয়াময় ঈশ্বর নিয়তই পতিত জীবের শুভ-কামনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল-ভোগ করে, ইহাতেও তাঁহার অপার করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রতিক্ষণেই মনুষ্যের শুভাশুভ কার্য্য-ফল প্রত্যেককে দেখাইয়া, এই শিক্ষা দিতেছেন যে, তোমরা পাপের যন্ত্রণা দেখিয়া, উহা হইতে বিরত হও,—পুণ্যের অপার আনন্দ দেখিয়া, সৎপথ আশ্রয় কর। তুমি ইহজন্মে কষ্টভোগ করিয়াও যদি সৎপথ না ছাড়, সৎকর্ম্মের যে সুফল, তাহা তুমি অবাধে ভোগ করিতে পাইবে। ইহজন্মে যদি তাহার ফল-ভোগ করিতে না পাও, পরজন্মে নিশ্চয়ই ভোগ করিবে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঈশ্বরের এই সাধু ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি তাঁহার এই জীবন্তভাব অনুভব করিবার জন্য মনুষ্যকে বিবেক-বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য যদি ঐ বিবেক-বুদ্ধির বলে চলে, তবে এ সংসারে পাপের স্রোতঃ এত বাড়িতে পারে না,—পুণ্যের পূর্ণ-

শশধর সুপ্রকাশিত হয়,—ইহজন্ম শান্তি-নিকেতন স্বরূপ হইয়া উঠে,—ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি পায়,—ঈশ্বরের মহিমা সুপ্রচারিত হয়,—মনুষ্যের জন্ম সফল হয়, এবং পরজন্মে শান্তি-সুখের উপায় হয়।

স্বর্গের অবারিত দ্বার সকলেরই জন্য উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে, স্বর্গের বিমল-জ্যোতিঃ উপভোগ করিতে পারে; কেবল যাহারা মহামোহে মুগ্ধ, অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল-ভোগ করে, তাহারাই ইহা হইতে বঞ্চিত হয়। এই পৃথিবী কাহার পক্ষে স্বর্গ, এবং কাহার পক্ষে নরক। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি এই পৃথিবীর যে ভাগে থাকেন, যে অবস্থায় পড়েন, তিনি সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় স্বর্গের বিমল-জ্যোতিঃ উপভোগ করিতে পান। তাঁহার বিশুদ্ধ হৃদয়ে, যে আনন্দস্রোতঃ বহিতে থাকে, এ সংসারের বৈষয়িক কোন সুখই তাহার সমতুল্য নহে। বিষয়রূপ হলাহলে লিপ্ত থাকিলে, মন যেরূপ কলুষিত হয়, ঈশ্বর-প্রেমে অনুরক্ত জনের মনের ভাব সে রূপ নহে। চতুর্দ্দিকে কেবল আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া, দিবারাত্র তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল করিয়া থাকে,—তিনি সেই আনন্দ-নীরে অবগাহন করিয়া, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লয়েন। আহা! তাঁহার সে আনন্দের সীমা নাই! সে আনন্দের তুলনা নাই!

যিনি প্রেম-চক্ষে ঈশ্বরকে দেখিতে পান, এ সংসার তাঁহারই পক্ষে স্বর্গের সমতুল্য হয়। তিনি ঐশ্বর্য্যের দাস নহেন, অথচ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার। কত নয়ন-প্রফুল্লকর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য,—কত বিহঙ্গগণের কল-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর রব,—কত নদ-নদীর, সুপেয়-জল,—কত ফল-মূলের সুস্বাদু রস,—কত আকাশস্থিত সমুজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রগণের বিমল-প্রভা,—কত অযাচিত সুনির্ম্মল সুগন্ধ-বায়ু-প্রবাহ এবং কত পুণ্য-বলে

পরমাত্মার দর্শনরূপ জ্ঞান-লাভে তিনি যে অনুপম আনন্দ অনুভব করেন, যদি কেহ, এই বিশ্বের অধীশ্বর হইতে পারেন, তিনিও সেরূপ আনন্দ, কদাচ অনুভব করিতে পারেন না। বিষয়ে যদি প্রকৃত-সুখ থাকিত, তবে মন কেন ঐ সুখ পাইবার জন্য, এত ব্যাকুল হয়? বিষয়ে যত বৈরাগ্য জন্মে, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা-ভক্তির ততই উদ্রেক হয়। যে মন, বিষয় থাকিতেও নির্লিপ্ত,—সদাই ঈশ্বরের প্রেমে অনুরক্ত, সেই ভক্তজনের জীবন সফল হয়। বিষয় আছে, থাক; কিন্তু বিষয়ের কাজ করা চাই। দীন-দুঃখীকে সাহায্য কর,—পরিবারবর্গের অভাব-মোচন কর,—দেশের উন্নতি সাধন কর ও ঈশ্বরের প্রেমে রত হও; তবেই সে অর্থের সার্থকতা হইবে। যে অর্থ, অনর্থ উৎপাদন করে,—ভোগেচ্ছা প্রবল হয়,—মনকে কলুষিত করে,—দীন-দুঃখীর হস্তে না যায় এবং ঈশ্বরের সুপ্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ দেখিতে বাধা দেয়, সে অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। অর্থের প্রধান কাজ, সাহায্য করা ও সাহায্য পাওয়া। যিনি অর্থের এই বিশেষ গুণটি অবগত হইয়াছেন, তাঁহারই অর্থ, সার্থক হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহারা মহামোহে মুগ্ধ; অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল-ভোগ করে, কেবল তাহারাই এ সংসারের সুখে বঞ্চিত হয়। ইহার কারণ এই, ইহাদের মনের ভাব ভিন্ন প্রকার। তাহারা মনে করে, এই শরীরের বিনাশের পর, তাহাদের কিছুই থাকে না,—এই সংসার সকল সম্পদের অ[illegible]াদ। তাহারা ইহার পূর্ব্বাপর কিছুই চিন্তা না করিয়া, নিয়ত অযথা পথে, অর্থাৎ অনিত্য-সুখে অনুরক্ত হয়। তাহাদের বিষয়-বৃদ্ধির বাসনা, ধন-মান বৃদ্ধির কামনা, ইন্দ্রিয়-সেবায় আসক্তি এবং পান-ভোজনে অনুরক্তি, প্রবল হয়; সুতরাং আসল কাজে ভ্রম-প্রমাদ আসিয়া পড়ে। আমরা যাহাকে ভ্রম-প্রমাদ বলি, উহা আর কিছুই নহে;

কেবল পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে যে, কৃত-কর্ম্মের নাশ কিছুতেই হয় না ; অর্থাৎ যিনি যেমন কার্য্য করেন, তিনি তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন। ভাল আর মন্দ যদি একরূপ কাজ হইত, তাহা হইলে, লোকে কেন ভাল মন্দের বিচার করিয়া, পুরস্কার বা তিরস্কার পায়? ভাল কাজে, সুফল দর্শে বলিয়াই, জ্ঞানবান ব্যক্তি বহুতর কষ্টভোগ করিয়াও, উহা সুসিদ্ধ করিতে যত্নবান হয়েন। ভাল কাজের পরিণামে সুফল দর্শে, এবং ঐ ফল আমি অবশ্যই ভোগ করিতে পাইব, মনে এ প্রকার ধারণা না থাকিলে, কেহই সৎকর্ম্মে রত থাকিত না। যিনি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলে, সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন, সেই সুখ ও দুঃখের অবস্থায় থাকিয়াও যদি তিনি ঈশ্বরে ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেন, এবং অধর্ম্মের স্রোতঃ না বাড়ান, তবেই তাঁহার এ সংসারের কার্য্য যথার্থরূপে সম্পাদন করা হয়। যিনি আপনার কাজ, এইরূপে সম্পাদন করেন, তাঁহার পরজন্মে নিশ্চয়ই সদগতি হয়।

প্রতি জন্মেই জীবের পরীক্ষা হয়। জীব পূর্ব্ব-জন্মে যে প্রকার কার্য্য করে, পর-জন্মে তদনুরূপ ফল-ভোগ করিয়া থাকে। জীবের এই সাধারণ-ধর্ম্ম, তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। আর কর্ম্ম-ফল অনুসারে যখন জীবের ঐ উন্নতি ও অবনতি হয় ; তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের উন্নতি ভিন্ন, কিছুতেই তাহার দুঃখ দুর্গতির হাত এড়াইবার উপায় নাই। এক্ষণে দেখা উচিত, কিসে জীবের সেই উন্নতি সাধন হয়? আপনাকে পবিত্র কর, সংক্ষেপে এ কথা বলিলে, কেহ উন্নত হইতে পারে না, এবং সৎপথ গ্রহণ কর, এ কথা বলিলেও কেহ সৎপথ পায় না। সংসার-ক্ষেত্রে থাকিতে গেলে, অগ্রে ভাল-মন্দের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। তৎপরে যাহা ভাল

বলিয়া স্থির হইবে, সেই পথ ধরিয়া চলিবে। ইচ্ছা ও কার্য্যের উপর ভাল-মন্দ নির্ভর করিতেছে। ভাল ইচ্ছা থাকিলে, সৎকার্য্যে মন যায়। আপাততঃ সুখকর বিষয়ে যদিও ক্ষণিক সুখ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু আপনাকে পবিত্র করিয়া, উন্নত করিতে গেলে, সে সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। *ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া সংসার-ব্রতে* ব্রতী হও,—পুণ্যের মঙ্গল-ছায়ায় বিশ্রাম কর,—তবেই দেখিতে পাইবে যে, তোমার অন্তরের ভাব, দিন দিন উন্নত হইতেছে। তুমি তোমার অন্তরকে যতই উন্নত করিতে থাকিবে, দয়াময় ঈশ্বরের কৃপা, ততই তোমাকে সাহায্য প্রদান করিবে। ঐ কৃপা-বলে তোমার সকল দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব হইবে। তখন তুমি এ সংসারের অনিত্য সুখ-ভোগের লালসা পরিত্যাগ করিয়া, সদাই নিত্য-ধামের নিত্য-সুখে অনুরক্ত হইবে। তোমার অন্তরের পিপাসা, যে রস পান করিবার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিত, তখন সেই সুনির্ম্মল জ্যোতির জ্যোতিঃ পরম পুরুষের আবির্ভাবে, তুমি সেই রসপানে অপার তৃপ্তি-সুখের অধিকারী হইবে। এই তোমার, এই মনুষ্য-জন্মের কাজ। এই কাজে নিত্য রত থাক,— দেখিবে, তোমার অন্তর দিন দিন আরও পবিত্র হইয়া উন্নত হইতেছে, হৃদয় আনন্দ-নীরে ভাসিতেছে,—মন ঈশ্বরকে পাইয়া, আর অন্য পথে যাইতে চাহিতেছে না,—সর্ব্বদাই তাঁহার প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে ধাবিত হইতেছে। এ সংসারে, এই তোমার সৎপথ। ইহা ভিন্ন আর যে পথ, তাহাকে কুপথ বলিয়া জান। সাবধান! সে পথের পথিক কদাচ হইও না। কুপথে অনেক প্রলোভন আছে। এই প্রলোভন, সৎপথে যাইতে বিস্তর বাধা দেয়। তুমি সৎপথ ধরিয়া চল, ইহাতে যদি কোন কষ্ট পাও, সহ্য করিয়া যাও। তুমি অটল ভাবে এ পথে, যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই তোমার পরিণাম-ফল শুভদায়ক হইবে। তোমার

এ জন্মের পরীক্ষার ফলে, তুমি পরলোকে উচ্চ-শ্রেণীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মনুষ্য যত দিন না আত্ম-কর্ম্মফলের বিষয় অন্তরে অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়, তত দিন আপনার উন্নতি-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে না। *আমার এখানকার কাজ কি? আমি যে* সুখ-দুঃখ ভোগ করি, ইহার কারণ কি? কার্য্য-ফল কিরূপে ভোগ করিতে হয়? এ সকল বিষয় যত দিন না অন্তরে বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়, তত দিন মনুষ্য মোহাবস্থায় কালযাপন করে। বিবেক-বুদ্ধির বলে, ঐ মোহকে দূর করিতে হয়। চেষ্টা ও যত্নের গুণে, বিবেক-বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায়। বিবেক-বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইলে, মানুষ তখন নিজ কার্য্যের অবধারণে সমর্থ হয়,—যখন সে আপন কার্য্য বুঝিতে পারে, তখনই সে তাহার সদ্গতির পথ দেখিতে পায়। যিনি আপনার সদ্গতির পথ ধরিয়া চলেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক হয়,—ইহজন্ম পরম সুখের নিকেতন হইয়া উঠে। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পরীক্ষা ও ভাবীকালের ফল, বড়ই সন্তোষজনক হইয়া পড়ে। মনুষ্য এ জন্মে পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে বলিয়াই, ইহাকে তাহার পরীক্ষাস্থল বলা হয়।

৪। অদৃষ্ট ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে প্রধান কে?

অদৃষ্টবাদীদের মতে জীবের অদৃষ্টই প্রধান। কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে চেষ্টা পাওয়া বা উহাতে বিরত থাকা, উভয়ই সমতুল্য। জীব অদৃষ্টের লিখন, যখন কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারে না, তখন সে নিশ্চেষ্টই থাকুক, আর কার্য্যে ব্যাপৃত হউক, তাহার অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহা হইবেই হইবে। সমাজ-ক্ষেত্রে বিচরণ কর, দেখিতে পাইবে,—কত নিরন্ন-জন অল্প দিনের মধ্যেই ধনবান হইতেছে, আর লক্ষপতি ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিতেছে,—উৎকট রোগী, আসন্ন-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে, আর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি, হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে,—মূর্খ-ব্যক্তি, জ্ঞানবান হইতেছে, আর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিতেছে,—ধর্ম্মাত্মার চরিত্রে, বহুবিধ পাপ আসিয়া আক্রমণ করিতেছে, আর ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তিও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হইতেছে। সমাজের এই সকল বৈষম্য দেখিয়া, কাহার মনে না প্রতীতি জন্মে যে, মনুষ্যের অদৃষ্টই সর্ব্বপ্রধান। মনুষ্য সর্ব্বদাই আপন অদৃষ্টের অনুসারে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করে,—কখন শুভাদৃষ্টের বলে, সে সুখী হয়, আর কখন দুরদৃষ্টের বিষম বিপাকে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। এ বিষয়ে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে যে, মনুষ্যের যে কিছু সুখ-দুঃখ, উহা তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে; সুতরাং অদৃষ্টকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করা, অদৃষ্টবাদীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে জীবের কর্ম্ম বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পূর্ব্ব-প্রস্তাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, "জীব পূর্ব্ব-জন্মে যে প্রকার কার্য্য করে, পরজন্মে তদনুরূপ ফল-ভোগ করিয়া থাকে। জীবের এই সাধারণ-ধর্ম্ম, তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। আর কর্ম্ম-ফল অনুসারে যখন জীবের উন্নতি ও অবনতি হয়, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের উন্নতি ভিন্ন, কিছুতেই তাহার দুঃখ-দুর্গতির হাত এড়াইবার উপায় নাই।" আর আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, আমাদের কার্য্যক্ষম দেহ রহিয়াছে, মনে কার্য্য করিবার ইচ্ছাও আছে, এবং সেই ইচ্ছা, বিবেক-বুদ্ধির বলে পরিচালিত হইলে, কার্য্যে শুভ-ফল লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও আছে। যখন ঐশ্বরিক নিয়মের এই জীবন্ত ভাব, প্রতি মনুষ্যে লক্ষিত হইতেছে, তখন কর্ম্মে রত থাকা যে দেহীর ধর্ম্ম, এটি, কে অস্বীকার করিবে? মনুষ্য অদৃষ্টের চক্রে ঘুরিতেছে; কিন্তু সেই অদৃষ্ট তাহার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল অনুসারে হয়। আমরা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল অনুসারে যে অদৃষ্ট লাভ করি, আমাদের অবস্থা, তাহার অনুরূপ হইবে বটে; কিন্তু এ জন্মে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যদি আমরা পুণ্য-কার্য্যে অগ্রসর হইতে না পারি, তবে পরজন্মে, শুভাদৃষ্ট কিরূপে লাভ করিব? কর্ম্মের ফল, যখন অদৃষ্টের প্রধান হেতুভূত, তখন কর্ম্ম-ত্যাগী হইয়া, নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকা, কোন মতেই মনুষ্য-জীবনের কার্য্য নহে।

কর্ম্ম অদৃষ্টের জনক। অদৃষ্ট জীবের সঙ্গের সাথী। আমরা যে পিতা-মাতাকে, পরমারাধ্য বিবেচনা করিয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা করি,—স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া, যে ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যাকে ভাল বাসি,—অকৃত্রিম প্রেম-পাশে বদ্ধ হইয়া, যে পতিব্রতা ভার্য্যাতে অনুরক্ত হই,—অক্লান্ত পরিচর্য্যা ও আনুগত্যের পক্ষপাতী হইয়া,

যে পরিজনবর্গের শুভ-কামনা করি, যাহাদের উপকারে আমরা উপকৃত হই, যাহাদের অনিষ্টে আমরা অনিষ্ট বোধ করি, তাহারা যদিও আমাদের অতিশয় নিকট সম্পর্কীয়, তথাপি কর্ম্ম ও অদৃষ্টের সঙ্গে, আমাদের যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পূর্ব্বোক্ত স্বজন সম্বন্ধ তত নয়। লৌকিক সম্বন্ধ, মনুষ্য-জীবনের উপর নির্ভর করে। যে যত কাল জীবিত থাকে, তাহারই সঙ্গে তত দিন এক প্রকার সম্বন্ধ। একের বিনাশে এ জন্মের সম্বন্ধ ছেদন হইয়া যায়; কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে, অদৃষ্টের একপ সম্বন্ধ নহে। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফলে, অদৃষ্ট আমাদিগকে আশ্রয় করে, আর যখন আমাদের বিনাশ হয়, তখন ইহজন্মের কর্ম্ম-ফলের প্রকাশকরূপে, অদৃষ্ট আমাদের আত্মার সঙ্গে যাইয়া, পরলোকে দেখা দেয়; এই জন্যই অদৃষ্টকে সঙ্গের সাথী বলে। এ সংসার পর্য্যন্ত, যদি আমাদের আত্মার পরিণামস্থল হইত; অর্থাৎ আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই, যদি এখানে আমাদের সকল ফুরাইত, তাহা হইলেও অদৃষ্টবাদীদের মতের কতকটা সার্থকতা দেখা যাইত। যখন দেখিতেছি, আমাদের শরীর বিনষ্ট হইলেও, আমরা আত্মার সঙ্গে থাকিয়া, ইহ-লোকের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য, দেহান্তর ধারণ করি, এবং যখন ঐ কর্ম্ম-ফল, তাহার অদৃষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়; তখন ইহজন্মে থাকিয়া, পরজন্মের শুভাদৃষ্টের কামনা করা যে, প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শরীরের কার্য্যকারিতা-গুণ, ইচ্ছার কার্য্য-প্রাপ্তির ভাব, এবং বিবেকের ন্যায়-পথ দেখাইয়া দিবার ভাব, যখন আমাদের শরীরেই রহিয়াছে; তখন কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকা, কখনই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে, কত দূর উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি নিয়ত কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করি, তবেই তাহার ফল-লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। নিশ্চেষ্ট

অলস ব্যক্তি যেমন আপনার অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারে না ; তদ্রূপ আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, দয়াময় ঈশ্বরের প্রদত্ত ক্ষমতার বল দেখিতে পাই না। যদি ঐ ক্ষমতার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা কর, তবে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হও,—দেখিবে, মনুষ্য শিল্প-বিজ্ঞানাদির বলে, কত সূক্ষ্ম ও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে,—কত নব নব সূক্ষ্ম-তত্ত্বের মীমাংসা করিতেছে,—যে কার্য্য মনুষ্যের দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ ছিল, সে সকল তাহারই বুদ্ধি-বলে, অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যা ও শিক্ষার গুণে মনুষ্য এই উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছে ; তন্মধ্যে যে বিদ্যা ও শিক্ষার গুণে, অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, সেই বিদ্যার শিক্ষাই, তাহার সর্ব্বোচ্চ অধিকার পাইবার পথ। ইহাতে প্রবেশ করিতে গেলে, তোমাকে প্রথমে কিছু কষ্ট পাইতে হইবে ; কিন্তু ক্রমে আর তদ্রূপ হইবে না। এ ক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হইবে, ততই পথ খোলসা দেখিতে পাইবে,—মনের আগ্রহ বাড়িবে, তৃপ্তি-সুখের আস্বাদ পাইবে,—যখন অপার তৃপ্তির হেতুভূত পরমাত্মার সহিত তোমার আত্মার সাক্ষাৎকার হইবে, তখন তোমার এই নশ্বর-দেহ সার্থক হইয়া যাইবে, এবং তখনই বুঝিতে পারিবে যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে কত দূর উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কার্য্যে রত থাকাই যে মনুষ্যের প্রধান কাজ, এটি, তখন সহজেই বুঝিতে পারিবে।

অদৃষ্টবাদীদের মতে, যেমন অদৃষ্ট প্রধান, আধ্যাত্মবাদীদের মতে, তেমন কর্ম্মই মনুষ্যেয় নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে, অদৃষ্টের সত্তা উপলব্ধি করা যায় না ; সুতরাং কর্ম্মকে কে না প্রধান বলিয়া স্বীকার করিবে ? কর্ম্ম মনুষ্যের পরম বন্ধু, এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পরম শত্রু। অতএব যে কার্য্যে কর্ম্ম-বন্ধুর সাহায্য পাওয়া যায়, সে কাজে আশা-ভরসা ও উদ্যমের বল

ক্রমেই বাড়ে,—তখন কর্ম্মসূত্রের ছেদন হয় না। যে দীর্ঘপথে চলিতে হইবে, কর্ম্ম-বন্ধু যদি সহায় হয়, তবে কি আর কোন ভয়ের ভাবনা থাকে?

ক্ষুধার সময়ে অন্ন যেরূপ, পিপাসার স্থলে পানীয় তদ্রূপ,—ইচ্ছার সঙ্গে, কর্ম্ম যেরূপ, কর্ম্মের সঙ্গে সিদ্ধি তদ্রূপ,—সিদ্ধির সঙ্গে. ব্রহ্ম-লাভ যদ্রূপ, ব্রহ্ম-লাভের সঙ্গে আনন্দের যোগ তদ্রূপ। তুমি ভাল কি মন্দ,—তুমি যদি কোন কার্য্যে লিপ্ত না থাক, তবে কিরূপে তোমার গুণের পরিচয় পাওয়া যাইবে? তুমি লোক-সমাজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ,—তুমি পুত্র-কন্যা, পরিবার, পরিজন ও প্রতিবেশী-মণ্ডলে বেষ্টিত,—সংসার তোমার হস্তে পড়িয়াছে.—তুমি আর এক সংসার হইতে এ সংসারে আসিয়াছ,—কিছু দিন পরে, আবার অন্য সংসারে চলিয়া যাইবে,—এখানে তোমার পূর্ব্ব-সংসারের ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে দুইটি সংসারের বিষয় বিবেচনার স্থলে দাঁড়াইয়াছে। একে অনুরক্ত ও অপরে ঔদাসীন্য থাকিলে, এক সময়ে দুইটির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারা যায় না। এ স্থলে, মধ্য-ক্রম গ্রহণ করিয়া চলাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তুমি যখন এ সংসারে আছ. তখন অগ্রে এখান-কার কার্য্য-কলাপ সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাও। তোমার সুশৃঙ্খলার গুণে, উভয় সংসারের কাজ, এখানে থাকার অবস্থায়, যাহা করিয়া লইতে পার, দিবারাত্র সে কাজে, অবহেলা করিও না। তোমার পরিবারবর্গের অভাব মোচন ও প্রতিবেশী-দিগের উপকার সাধন করা, যেমন একটি কর্ত্তব্য কার্য্য; তদ্রূপ তোমার অন্তরের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণের বস্তু-সংগ্রহ করা, আর একটি প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য। তুমি এক স্থানে থাকিয়া, যাহাতে উভয় লোকের কাজ করিতে পার, এ ক্ষমতা যেন তোমার জন্মে। তোমার এটি যেন স্মরণ থাকে যে, এ সংসারে বেশী

দিন থাকিতে হইবে না ; অথচ, এই অল্প সময়ের মধ্যে, তোমার পথের সম্বল সংগ্রহ করা চাই। তোমার শরীরের সঙ্গে, জীবনের কিছু দিনের সম্বন্ধ ; কিন্তু তুমি ও তোমার আত্মার সঙ্গে, পরমাত্মার অচ্ছেদ্য চির-সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে,—এটি যেন তোমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে। অতএব তুমি এখানে থাকিয়া, আত্মানুসন্ধানে রত হও। তুমি কে ও তোমার আত্মাই বা কে ? তোমার কার্য্য কি ? এবং পরমাত্মাই বা কে ? আর তোমার ও তোমার আত্মার সহিত পরমাত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ ? এ সকল বিষয় সদ্‌গুরুর নিকট যাইয়া, অনুসন্ধান লও। তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার এ শরীর, পঞ্চ-ভূতে মিশিয়া যায় ; কিন্তু তোমার অস্তিত্ব ও তোমার আত্মার ধ্বংস হয় না। তুমি তোমার এই শরীররূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, কেবল গৃহান্তরে আশ্রয় লও, এই মাত্র। শিক্ষা ও জ্ঞান-বলে, আপনার বল বাড়াইয়া লও,—তখন কার্য্যসিদ্ধির সঙ্গে, ব্রহ্মানন্দের যে যোগাযোগ, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবে। কর্ম্ম-ত্যাগী হইয়া, উদাসীন ভাবে থাকিলে, কেহই এই উচ্চ অধিকারের ফল লাভ করিতে পারে না। এ স্থলে কর্ম্মই যে সকলের প্রধান বিষয়, এটি বুঝাইয়া দিতেছে।

ঈশ্বরকে লাভ করিয়া সুখী হইব, এই ইচ্ছা মনুষ্যের হয় কেন ? এটি তাহার শরীরের কোন ব্যাধি,—না, তাহার মনের এমন কোন ক্ষমতা আছে, যাহাতে সে, পরম পিতার দর্শন-লাভ করিতে পায় ? শ্রদ্ধা ও ভক্তির গুণে, সকলকেই বশীভূত করা যায়। আমাদের ন্যায়বান পিতা, তাঁহার যে সন্তানে, ঐ শ্রদ্ধা-ভক্তির আধিক্য দেখিতে পান, তিনি কেবল তাহারই নিকটে আসিয়া, নিজে দেখা দেন। যে নিয়ত আপনাকে কোন কার্য্য-ক্ষেত্রে ব্যাপৃত রাখে, সেই কাজে, তাহার বহুদর্শিতা ও অভি-

জ্ঞতা জন্মে। সে ক্রমে উহাতে সিদ্ধ-কাম হইয়া উঠে। কার্য্যের এই সাধারণ-ভাব যিনি না জানেন, তাঁহার অমূল্য-জীবনের কাল, বৃথা চলিয়া যায়। যে বাল্যকাল, কেবল ক্রীড়ায় কাটাইল,—যৌবনে, ইন্দ্রিয়-সুখে রত থাকিল এবং বার্দ্ধক্যে, বিলাসী হইল, সে কখন এ সুখের অধিকারী হইতে পারে না। জ্ঞান-গুরুর কৃপাবলে, মনুষ্য এই পথ ধরিতে পায়,—তখন অন্তরকে পবিত্র করা চাই,—সাধন-কার্য্যে যোগ দেওয়া চাই, এবং গুরুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলা চাই,—তবেই সে পরমাত্মার দর্শন পায়। সকল শুভ-কার্য্যের শেষেই, পুরস্কার আছে; কিন্তু এ কার্য্যের সূত্রপাত হইতে, মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, ক্রমে সেই আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; পরিশেষে, সেই নিত্যানন্দ আসিয়া, তাহাকে দেখা দেন। মনুষ্য যখন ভক্তি-মার্গে দণ্ডায়মান হইয়া, দিব্যচক্ষে পরমাত্মার দর্শন পায়, তখনই তাহার মানব জন্ম সফল হয়। মনুষ্যের এই যে সর্ব্বোচ্চ অধিকার, ইহাও কর্ম্ম ছাড়া নহে। অতএব কর্ম্ম-ত্যাগী হইয়া, কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কর্ম্মই মনুষ্যের পূর্ব্ব অদৃষ্ট এবং কর্ম্মই তাহার পর অদৃষ্ট। যে কর্ম্মে ভাবী অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, সেই কর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের প্রধান কাজ। অতএব যাহারা কেবল অদৃষ্টকে প্রধান জানিয়া, অমূল্য-জীবনকে হেলায় কাটাইয়া দেন, তাঁহাদের ভাবী ফল নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে।

৫। জীব-তত্ত্ব

মানুষ নিজে কে? কোথা হইতে আসিল? তাহার এখানকার কার্য্য কি? এবং মৃত্যুর পর কোথায় যায়? এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান না জন্মিলে, তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সম্যক্ শিক্ষা হয় না। যে আপনি আপনাকে না চিনে, সে কেমন করিয়া, আপনার গতি বুঝিতে পারিবে,—তখন সংসারের অযথা কাজে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহার কার্য্য হইয়া উঠে; সুতরাং অগ্রে আপনাকে চেনাই সকলের আবশ্যক হইতেছে।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একটি প্রকাণ্ড পদার্থ। এই পৃথিবী তাহার অন্তর্গত। পৃথিবী নানাবিধ পদার্থে পরিপূরিত। পদার্থ সকল অমর; অর্থাৎ কোন পদার্থই একবারে লয়প্রাপ্ত হয় না। এই আমরা এক্ষণে যে পদার্থটি এক রূপ দেখিতেছি, কালে তাহা ভিন্ন রূপে পরিণত হয়, এই মাত্র প্রভেদ। একের বিকারে অন্যের উৎপত্তি, অথবা যে পদার্থ যে যে পরমাণুর সমষ্টি লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; পুনর্ব্বার তাহাতেই যাইয়া মিশে। সৃষ্টির এই সাধারণ ভাব, একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই, এ বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে জীবের উৎপত্তি ও ইহাদের বিনাশ, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

দেখা যাইতেছে যে, জীবের যে শরীর, উহা জড়-পদার্থ। ইহাতে চৈতন্য এ ভাবটিও আছে,—যাহাকে আমরা জীবের জীবন বলিয়া থাকি। ঐ জীবন যে বলে চালিত হয়, তাহাকে জীবের জীবত্ব বা জীব-ধর্ম্ম বলে। এই জীব-ধর্ম্ম ভিন্ন, প্রতি

জীবেই আত্মার সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মা ঈশ্বরের অংশ। আত্মা সাক্ষীস্বরূপ থাকিয়া প্রত্যেক জীবে বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথিবী যে প্রকার নানাবিধ জড় বা অচেতন পদার্থে পরিপূরিত, তদ্রূপ অনন্ত জীব-প্রবাহ দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত। যখন জীব জড় উপাদানের সহিত মিলিত হয়, তখনই জীবের সৃষ্টি হয়। এই নিয়মে জলে মৎস্য,—আকাশে কীট-পতঙ্গ,—বৃক্ষে বিহঙ্গ, এবং ধরাতলে নানাবিধ জীব-জন্তুর সৃষ্টি হইতেছে।

জীবের উৎপত্তি বিষয়ক নিয়মে, আমাদিগকে ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে, জীবের যে শরীর, উহা পৃথক্ পদার্থ, আর জীবত্ব ও আত্মা উহা হইতে বিভিন্ন; সুতরাং জীব-শরীরের উপাদান, জীবত্ব ও আত্মার পরিণাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাঁহারা মনে করেন, জীবের জীবন বিনষ্ট হইলেই, এ জন্মের সকলই ফুরাইল, এটি তাঁহাদের বিষম ভ্রম। যখন দেখা যাইতেছে যে, এই পৃথিবীর কোন পদার্থই এককালে ধ্বংস হইবার নহে। মৃত্যুর পর জীবের যে শরীর, তাহা ভৌতিক পদার্থে যাইয়া মিলিত হয়, এবং জীবত্ব ও আত্মা ভিন্নাকারে যাইয়া আশ্রয় লয়। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, এই পৃথিবী প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এই পৃথিবী ছাড়া আরও ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য লোক আছে। জীব, শরীর হইতে নির্গত হইয়া, যে সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করে, তখন উহাকে মুক্তাত্মা বলে। ঐ মুক্তাত্মা এ সংসার ছাড়িয়া, সর্ব্বপ্রথমে যে লোকে যায়, উহাকে পরলোক বা প্রথম স্বর্গ বলে। তদুপরি দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য লোক আছে।

পৃথিবী জীবের জন্ম-স্থান। জীব প্রতি জন্মে নূতন নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় ও কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য, জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া

থাকে। কোন কোন মতে, মনুষ্য-জন্ম, তাহার শেষ জন্ম,—মনুষ্য জন্মের পর, আর তাহাকে নশ্বর-দেহ ধারণ করিতে হয় না,—তখন আত্মাই তাহার সূক্ষ্ম-দেহে থাকে। উহাকেই জীবের লিঙ্গ-দেহ বলে; কিন্তু এ মতের পোষক প্রমাণ সর্ব্বত্র দেখা যায় না।

জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে কেহ কেহ আর এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে উন্নতির পর উন্নতি, সংসারের এই গতি। জীব প্রথমে নিকৃষ্ট জীবে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আসিতে আসিতে, যখন তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তখনই সে মনুষ্য-জন্মে আসিয়া স্থান পায়। মনুষ্য হইবার ঠিক পূর্ব্ব-জন্মে মানুষ কি ছিল এবং তাহার এইরূপ পূর্ব্বাপর জন্ম-প্রবাহ ঠিক করা, মানুষের ক্ষমতায়ত্ত নহে; কিন্তু এটি স্থির যে, সে নিকৃষ্ট জীব-শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়া, ক্রমশঃ তাহারই উচ্চ উচ্চ ক্রমে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, শেষে এই মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবের আদি-অন্ত-বিষয়ক ব্যাপার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, এইরূপ নানা মুনির নানা মত আসিয়া পড়ে, এবং তাহাদের কর্ম্ম-ফল সম্বন্ধে বিবিধ তর্ক আসিয়া দেখা দেয়; তন্মধ্যে নাস্তিকদের মতে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমাজে যত অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া দেয়, এমন অন্য বিষয় নহে। একে জীবের আদি ও অন্তের বিষয় নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে, তাহাতে আবার যাঁহারা এই বিষয় লইয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন, তাঁহারা ঘোর বিপদে পড়িয়া যান। জন্ম-মৃত্যুঘটিত বিষয়, পরলোক-তত্ত্বে সবিশেষ বলিবার ইচ্ছা রহিল; একারণ বিষয় সংক্ষেপের দিকে চেষ্টা পাওয়া গেল।

সংসার-চক্র নিয়তই ঘুরিতেছে, এই ঘোরার সঙ্গে স্বভাবের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। নিদারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা,—বর্ষার

পর শরৎ,—শরতের পর হেমন্ত,—হেমন্তের পর শীত এবং শীতের পর বসন্ত ঋতু যেরূপ পর্য্যায় ক্রমে যাতায়াত করে, সেইরূপ মনুষ্যের জীবনে প্রথমে বাল্যাবস্থা, ক্রমে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। সময়-চক্রে দিবা রাত্রির মধ্যে যে, কত স্থানে, কত শত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যাহা অদ্য এক রূপ দেখা যায়, কল্য তাহার রূপান্তর হইতেছে। সময়-চক্র কাহাকেই একাদিক্রমে একভাবে থাকিতে দেয় না। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন করাই স্বভাবের কার্য্য। যখন রাত্রি গত হইয়া, উষা-দেবী দেখা দেয়, তখন সুমন্দসমীরণ-ভরে তরু-লতার কুসুমিত শাখাগুলি, মন্দ মন্দ কম্পিত হইয়া, কেমন সৌরভ বিস্তার করে! জীব রাত্রিকালের শয়ন-সুখ ভোগ করিয়া, পূর্ব্বদিনের শ্রম-ক্লেশ একবারে ভুলিয়া যায়; তখন সে এই নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া, আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতে থাকে। চারি দিকে বিহঙ্গ গণের কল-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর স্বরে তাহার আনন্দ-প্রবাহ অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে অরুণোদয়ে পূর্ব্বদিক কি অপরূপ শোভা বিস্তার করে! তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ রবির ছবিখানি কেমন ধীরে ধীরে আসিয়া, আমাদের নেত্র-গোচর হইতে থাকে। বোধ হয় যেন, এতক্ষণ রবি, নিশির ঘোর অন্ধকাররূপ প্রবল-ভরে চাপা পড়িয়াছিল, তাহা হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাইয়া, ক্রমে মস্তকোত্তলন করিতেছে। একবারে হতাশ হৃদয়ে, পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইলে, যেমন আনন্দ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ অস্তমিত সূর্য্যকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইয়া, আর আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু এ আনন্দ আমরা কতক্ষণ অনুভব করি? যতক্ষণ না সূর্য্য আমাদের মস্তকোপরি আসিয়া, প্রচণ্ড-কিরণ-জাল বিস্তার

করে। তখন কেহই তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে না। আবার গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের কি ভয়ানক উগ্র-মূর্ত্তি! কাহার সাধ্য যে, ঘরের বাহিরে যায়! যখন উত্তপ্ত বায়ু আসিয়া দেহ স্পর্শ করে, তখন বোধ হয়, যেন সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া গেল। অনবরত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর,—জিহ্বা নীরস ও কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া যায়। শীতল জল, শীতল বায়ু এবং শীতল স্থান পাইবার জন্য সকলকেই ব্যাকুল করিয়া তুলে। তখন বোধ হয়, যেন সূর্য্য নিজ-কিরণে পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। আমরা প্রাতে যাহার দর্শনে, প্রচুর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাব! কি আশ্চর্য্য! সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। মধ্যাহ্নকাল হইতে কয়েক ঘণ্টার পর, আবার সেই সূর্য্যকে ক্রমে ক্রমে হীন তেজে পরিণত হইতে দেখা যায়। সেই সময়ে অপরাহ্নের বিষয় মনে আসিয়া, জীবের গতি জানাইয়া দেয়। তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ-কাল গতপ্রায়,—যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, এই সময়ের মধ্যে করিয়া লইতে, অবহেলা করিও না। যে দিন গত হয়, সে দিন, কেহ আর পুনর্ব্বার পায় না; তদ্রূপ জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অংশ বৃথা চলিয়া গেলে, পরিশেষে হতাশ-মনে, শূন্য-হৃদয়ে কেবল নানা প্রকার পরিতাপ করিতে হইবে। দিন থাকিতে আপনাপন কাজ সারিয়া লও। যখন ঘোর অন্ধকার আসিয়া পড়িবে,—চারি দিক নিস্তব্ধ হইবে, তখন জ্যোতিঃহীন চক্ষু লইয়া কি করিবে? কাজ থাকে ত এই বেলা সারিয়া লও।

যে মনুষ্য, সমস্ত দিবসের কার্য্য, অপরাহ্নে সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হয়, সে বিশেষ ত্বরান্বিত ও মনোযোগী হইয়া কার্য্য না করিলে, যেমন তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে না; তেমনই তোমার জীবনের শেষ ভাগের কাজ অসম্পন্ন থাকিলে, সেজন্য

তোমাকেও তৎপর হইতে হইবে। জীবন-বায়ু নিয়তই ক্ষয় পাইতেছে। যে দিন বৃথা গত হয়, সে দিনেও তোমার জীবনের এক দিন ক্ষয় হয়। এই রূপে তোমার জীবন-বায়ু যে, কত দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, শেষে তুমি মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব তোমার দেহে যত ক্ষণ প্রাণ বিদ্যমান আছে, এই সময়ের মধ্যে অহরহঃ আপন কাজ সম্পন্ন করিয়া লও। তোমার কাজ সারিয়া, এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাক, যেন তোমার সেই সম্বল নিজ হাত ছাড়া না হয়। তখন তোমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, তোমার সম্বল, নিজের কাছেই থাকিবে,—তোমার অন্তঃপ্রদেশের নিগূঢ় স্থানে ঐ সম্বল সঞ্চয় কর, যাহাতে উহা আরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার চেষ্টা পাও। এই রূপে তুমি যদি তোমার জীবনের গতি বুঝিয়া চল, তোমার জীবনের দিন রাত সমভাবে গত হইবে। তখন নিশ্চিন্ত মনে, যখনই আপন অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখনই আপনাকে ঐশ্বর্য্যবান বোধ করিবে,—মনে অভাবনীয় উল্লাস আসিয়া দেখা দিবে এবং কোন বাহ্য শোক-দুঃখ আসিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না। তোমার মনে যে চির-শান্তি আসিয়া দেখা দিবে, তাহারই গুণে, তোমার ধৈর্য্য-গুণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে,—তুমি অটল ভাবে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিবে। ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে, আত্মা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়। আত্মা ঈশ্বরের অংশ। ঐ আত্মা যখন জীব-দেহে থাকে, তখন জীবের কার্য্য-দোষে মলিনতা আবরণে আচ্ছাদিত হয়; তখন তাহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ থাকে না। যখন তাহার মলিনতার দূরীকরণ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রীতি-ভক্তির আধিক্য বাড়ে, তখন সেই আত্মা আপনার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরে প্রীতি-ভক্তি

স্থাপন করাই, আত্মার বিশুদ্ধীকরণের একমাত্র উপায়। ঐ বিশুদ্ধ-ভাব লাভ করাই, মনুষ্য-জীবনের প্রধান কার্য্য। জীব-দেহে, আত্মার অবস্থান হেতু, আত্মাকে জীবাত্মাও বলে। এই জীবাত্মার সাহায্যে, জীব পরমাত্মার দর্শন পায়। জীব ফলভোক্তা, আর আত্মা দ্রষ্টা; সুতরাং যাঁহারা আত্মা বা জীবাত্মাকে জীব বলিয়া স্বীকার করেন, এটি তাঁহাদের ভ্রম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—এই পৃথিবী যে রূপ নানাবিধ জড় বা অচেতন পদার্থে পরিপূরিত, তদ্রূপ অনন্ত জীব-প্রবাহ দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত। যখন জীব, জড় উপাদানের সহিত মিলিত হয়, তখনই জীবের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে তাহার জন্ম-মৃত্যু ঘটিত বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে। জীব প্রথমে পুরুষের শুক্রের সঙ্গে, মাতৃ-গর্ভে যাইয়া পতিত হয়। ঐ স্থানে থাকিয়া, তাহার দেহের সৃষ্টি হয়। এই জন্যই মাতৃ-গর্ভকে জীবের উৎপত্তির ক্ষেত্র বলে। আর জীব পিতৃ-দেহ অবলম্বন করিয়া জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া, পুরুষের শুক্রকে বীজ কহে। ক্ষেত্রে বীজ রোপিত না হইলে, যেমন কোন উদ্ভিদ্ জন্মে না; তদ্রূপ মাতৃ-গর্ভে শুক্র-পতন না হইলে, জীবের উৎপত্তি হয় না। বীজ ক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া, যেরূপ রাসায়নিক শক্তির বলে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ জীবের জীবনীশক্তি থাকাতে, সে মাতৃ-গর্ভে আপনার শরীরকে প্রস্তুত করিয়া লয়। দেহ জড় পদার্থ। জড়কে প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া চলিতে হয়। জীবের দেহ, মাতৃ-দেহ হইতে সৃষ্টিত হয় বলিয়া, মাতাকে প্রকৃতি, এবং সে তাহার পিতাকে অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়া, পিতাকে পুরুষ বলা হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের সাহায্যে, যেমন এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি; তদ্রূপ পিতামাতার সংযোগে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবের এই উৎপত্তির সঙ্গে যেরূপ পিতামাতার নিকট সম্বন্ধ

রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার মৃত্যুকালেও এ সম্বন্ধের কোন রূপ বৈলক্ষণ্য হয় না। দেহ, জড়ের সমষ্টি মাত্র। ঐ জড় বা প্রকৃতি জগৎ ব্যাপিয়া আছে। তাহার এই ব্যাপকতা গুণ চিরকাল দেখা যায়; অর্থাৎ যেখানে তাহার উৎপত্তি, সেই খানেই তাহার নিবৃত্তি। এই জন্যই জীবের মৃত্যুর পর তাহার দেহ, এখানকার ভূতলে পড়িয়া থাকে, উহাকেই মাতৃ-অংশ বলে। আর মৃত্যুর পর, জীব সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে। সূক্ষ্ম বস্তুর ঊর্দ্ধ গতি থাকা প্রযুক্ত সে মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধে গমন করে,ইহাকেই তাহার পিতৃ-অংশ কহে। ঐ দেখ, গোলাপ গাছে কেমন একটি মুকুল ধরিয়াছে! উহা শীঘ্রই একটি সুন্দর পুষ্পরূপে পরিণত হইয়া, যখনই প্রস্ফুটিত হইবে, অমনই উহার মধ্যস্থিত সার পদার্থ, অর্থাৎ সুগন্ধ চারি দিক আমোদিত করিয়া, উপরে উঠিয়া যাইবে। তৎপরে উহার পাপড়ি-গুলি ভূতলে খসিয়া পড়িয়া মাটি হইবে। জীবের গতিও ঠিক ইহার অনুরূপ। জীব জন্মগ্রহণের পর, ভূমিষ্ঠ হইয়া এখানে কিছুদিনের জন্য জীবিত থাকিয়া, যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়।

মনুষ্য একাদিক্রমে নিয়ত সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না। পর্য্যায়ক্রমে তাহার সুখ ও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ।" সুখের অন্তে দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ। মনুষ্যের জীবন-চক্র, এইরূপে গমনাগমন করিতেছে। যে ব্যক্তি দুঃখের দুর্দ্দশায় পড়িয়া নিদারুণ কষ্টভোগ করে, আর যে ব্যক্তি বিবিধ প্রকার সুখভোগের অধিকারী হইয়া সন্তৃপ্ত থাকে, তাহাদের বিষয় কাহার নিকট অবিদিত থাকে না; কিন্তু ইহাদের ভাবীকালের জীবন, যে কিরূপে গত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত থাকে। যে সমধিক সুখভোগ করিয়া, পশ্চাতে দুঃখের অনন্ত সাগরে যাইয়া পতিত হয়, তাহার যেমন আশা

ভরসার স্থল দেখা যায় না ; তদ্রূপ যাহার দুঃখের দশার পরি-সমাপ্তিতে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারও তেমনই আনন্দের সীমা থাকে না। সংসারের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। এ বিষয়ে আমাদিগকে ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে, যৎকালে কেহ এ সংসারে আসিয়া দুঃখভোগ করে, তখন সে তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলভোগ করিয়া, কষ্টের মোচন করিতেছে। আর যে সুখভোগ করে, তখন সে তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলভোগ করিয়া, সুখের ক্ষয় করিতেছে। যাহার দুষ্কৃতির মোচন হয়, তাহার জীবনে যেমন ভবিষ্য সুখভোগের সম্ভাবনা থাকে, তেমনই যাহার সুকৃতির ক্ষয় হয়, তাহারও দুঃখের দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। তবেই দেখ, এ সংসারে কেহই নিয়ত সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতে পায় না। যাহার যেরূপ অবস্থা হউক না কেন, তাহার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগের সহিত, জীবের জন্মগ্রহণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহার কৃত কর্ম্মের নাশ কিছুতেই হইবার নহে।

এ সংসার যখন মনুষ্যের পরীক্ষার স্থল, এবং ভাবী কালের শুভাশুভ লাভ করা, যখন তাহার এখানকার কার্য্য-ফলের উপর নির্ভর করে, তখন মনুষ্য এই পৃথিবীতে আসিয়া, যদি নিজের কার্য্য ও গতি না জানিতে পারে, তবে তাহার ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়। মনুষ্যের প্রধান ইচ্ছা সুখে থাকিবে; কিন্তু সেই প্রকৃত সুখ কিসে পাওয়া যায়, সে যদি তাহার প্রকৃত-তত্ত্ব জানিতে না পারে, তবে কিরূপে আপনার অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারিবে? মোহ মনুষ্যের দুঃখাবস্থা আনিয়া দেয়। যত-ক্ষণ তাহার মোহ না যায়, ততক্ষণ সে আপনার সদ্গতির পথ দেখিতে পায় না। মোহকে ত্যাগ করিতে গেলে, ধর্ম্মের

সরল-পথ ধরিতে হইবে,—উদার-ভাবে জগতের প্রত্যেকের প্রতি স্নেহ-মমতা স্থাপন করিতে হইবে,—এই স্নেহ-মমতার যতই আধিক্য হইতে থাকিবে, ক্রমে ততই মোহ-পাশ ছেদিত হইবে। যিনি স্বার্থপর,—কেবল নিজ-স্বার্থের জন্য, সংসারে বিচরণ করেন, তিনি কখন এ পথের পথিক হইতে পারেন না। যিনি সমস্ত জগতের প্রতি আত্মবৎ দৃষ্টি করিয়া, অন্যের সুখে সুখী এবং অন্যের দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, তাঁহারই হৃদয় উন্নত ও উদার-ভাব ধারণ করিয়া থাকে। এ সংসারে থাকিতে গেলে, যদিও আত্মোন্নতি বিষয়ে বিস্তর বাধা বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, তথাপি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া, সংসার-ধর্ম্মে ব্রতী হইলে, সে সকল, অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারা যায়।

মায়াকে পরিহার করা, মোহ বিনাশের প্রধান ঔষধ। ঐ মায়া যদিও সহজে যাইবার নহে, তথাপি অভ্যাসের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, ঐ মায়াকে জয় করিতে পারা যায়। নিকট সম্পর্কীয় ও নিজ বিষয়ে স্বাভাবিক যে এক প্রকার ভালবাসা, তাহাকেই মায়া বলে। ঈশ্বর সমাজ-স্থিতি রক্ষার জন্যই মনুষ্যের মনে ঐ ভালবাসা প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু আত্মার যাহাতে মলিনতা জন্মে, এরূপ ভালবাসা, ন্যায়বান পরম পিতার উদ্দেশ্য নহে। প্রবৃত্তি-গুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য, তিনি মনুষ্যের অন্তরে বিবেক-বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, ঐ বিবেক-বুদ্ধির বলে চলিলে, কখনই মনুষ্যকে মায়ার বশীভূত হইতে হয় না। মায়া আছে থাকুক, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধির বলে চলা চাই। মনুষ্যের যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তেমনই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও রহিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির গুণে, সে ভাল-মন্দ পথ চিনিয়া লইতে পারে ; সুতরাং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির পরিচালন হইলে, মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়।

প্রবৃত্তির অনুকূল পথে চলা, স্বার্থপরতার কার্য্য। আর প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া, আপনার ক্ষমতা বাড়ান, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির

কাজ। যিনি ইন্দ্রিয়-সংযমে পটু, তিনিই প্রকৃত যোগী। যোগ-সাধন ভিন্ন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হইয়া উঠে না। যিনি যোগ-বলে, আপনার ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট মোহ বা মায়ার পরাক্রম থাকে না। সংকীর্ণ-মনে মোহ আসিয়া আশ্রয় লয়। যাঁহার মন প্রশস্ত, তিনি মোহকে পরাজয় করিতে সমর্থ। প্রশস্ত-মনে উদারতার সঞ্চার হয়, সে মনে সংসারের নীচাশয়তা প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই সমতুল্য হয়। তিনি জগতের এক জন সামান্য প্রজা হইলেও, আপনাকে অধীশ্বর জ্ঞান করেন। তাঁহার হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে যে রত্ন-ভাণ্ডার রক্ষিত হয়, সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বরেরও এমন কোন বহু মূল্য রত্ন নাই, যাহার সহিত উহার তুলনা হইতে পারে। মনের উদারতাগুণ মহৎ গুণ। ঐ উদারতা গুণের সাহায্যে আমরা সংসারের মমতা পরিহার করিতে পারি। আমরা যতদিন না সংসারের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিব, ততদিন নিজের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির হইয়া উঠিবে না। অতএব মমতাকে পরিহার করিয়া, মনকে উদারভাবে পরিণত করা, ধর্ম্ম-জীবনের প্রধান কার্য্য। ইন্দ্রিয়ের সংযম কর, এ কথা বলা যেমন সহজ; কিন্তু ইহার কাজ করা, তেমনই কঠিন। যোগ-শিক্ষা ভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রকৃত কার্য্য হইয়া উঠে না। যোগের প্রধান কার্য্য, প্রবল ইন্দ্রিয়দিগের সাধারণ কার্য্যকে রোধ করিয়া, শরীরে একটি নূতন বলস্থাপন করা। চক্ষুর গুণ দেখা, কর্ণের গুণ শ্রবণ করা, মনের গুণ চিন্তা করা, ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের যে যে সাধারণ কার্য্যকারিতা আছে, যোগ-শিক্ষার বলে, উহাদের ক্রিয়ার হ্রাস হয়। তখন শরীর ও মনের এমন একটি অসাধারণ শক্তি জন্মে, যাহাতে সে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া পড়ে। ক্রমে তাহার অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। তাহারই

বলে, সে দর্শনাদির কার্য্য সমাধা করে। আমাদের সাধারণের বিশ্বাস যে, বাহ্যচক্ষুই দর্শন-কার্য্যের প্রধান হেতুভূত; কিন্তু এটি সকল বিষয়ে উপযোগী নহে। মনুষ্যের বাহ্যচক্ষু ছাড়া, তাহাদের আর একটি চক্ষু আছে, যাহাকে অন্তশ্চক্ষু বলে। বাহ্য-চক্ষুর ক্রিয়ানিরোধ না করিতে পারিলে, অন্তশ্চক্ষু দিয়া দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে না। বাহ্যচক্ষুর রোধ করা ও অন্তশ্চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করা, সহজ ব্যাপার নহে। নিয়মাচারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই,—সদ্‌গুরুর উপদেশ পাওয়া চাই এবং সাধন-কার্য্যে যোগ দেওয়া চাই; তাহা হইলে মনুষ্যের অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। এই সকল কার্য্যের প্রণালীগত শাস্ত্রকে যোগ-শাস্ত্র বলে। ঐ শাস্ত্রে যোগ সাধন বিষয়ক বিবিধ উপায় শিক্ষার উপদেশ পাওয়া যায়। কোন সদ্‌গুরু যোগীর নিকট থাকিয়া, তাঁহার উপদেশ মতে শিক্ষা না করিলে, যোগকার্য্যে পারদর্শী হওয়া যায় না। সকল বিষয়ই গুরুসাপেক্ষ। বিশেষতঃ এরূপ দুষ্কর কার্য্যে, উপযুক্ত গুরুর সাহায্য ভিন্ন, সাধারণের ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে না।

হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ অধিকার, যাহা আর্য্য-ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই আর্য্যধর্ম্ম যোগ-শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দর্শন বিনা যেমন বিশ্বাসের মূল দৃঢ়ীভূত হয় না, তদ্রূপ অনির্দ্দিষ্ট বিষয় ভাবনায় বিশ্বাসের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ঈশ্বর আছেন সত্য, তথাপি তাঁহার সত্তা, যতক্ষণ না অন্তরে প্রতিভাত হয়, ততক্ষণ মনের অন্ধকার ঘুচে না। বিশ্বাস বড় চমৎকার বিষয়। যতক্ষণ না অবিশ্বাসের হেতুবাদ গুলির ছেদন হইবে, ততক্ষণ বিশ্বাস সে ক্ষেত্রে আসিয়া স্থান পায় না। শত সহস্র উপদেশের বলে, যাহা না ঘটিয়া উঠে, এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে এত বিশ্বাস আসিয়া পড়ে, যাহা অন্য কোনরূপে বুঝাইয়া

দিবার উপায় হইয়া উঠে না। বিজ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, সকলেরই ফল, প্রত্যক্ষ দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা বাহ্য বিষয়ের দৃষ্টি, যেমন বাহ্য চক্ষুর দ্বারা করিয়া থাকি, অন্তর বিষয়ের দৃষ্টি, তদ্রূপ অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাই। ঈশ্বর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন; সুতরাং তাঁহাকে জানিতে গেলে, অন্তরেন্দ্রিয়ের চালনা করা চাই। যে শাস্ত্রে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের চালনা-প্রণালী প্রকটীকৃত হইয়াছে, উহাকেই যোগ-শাস্ত্র বলে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়াছেন, যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও কোন কার্য্য-কুশল যোগীর নিকট থাকিয়া, যদি আমরা তাহার কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করি, তবেই আমাদের ক্ষমতার বল নিজে নিজে দেখিতে পাই।

বিজ্ঞান, জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রশস্ত পথ। যোগ এ পথ অতিক্রম করিয়া, কত নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা সহজ জ্ঞান-বুদ্ধির আয়ত্ত নহে। যোগের বল অসাধারণ; এই জন্যই বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যোগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকেন। মনুষ্য, বুদ্ধি-বলে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু যিনি এক জন প্রকৃত যোগীর কার্য্য-বল দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান-বুদ্ধি অতি যৎসামান্য বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানের বল, নির্দ্ধারিত কার্য্য-ফল দেখাইয়া দেয়; কিন্তু যোগ-বল অপরিমিত, এবং তাহার কার্য্য-ফলও অভাবনীয়। তর্ক-বলে, বিজ্ঞানের জটিল বিষয় সকলের মর্ম্ম অনুধাবন করা যায়; কিন্তু যোগ-তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া, তার্কিক হত-জ্ঞান হইয়া পড়ে। তিনি বিজ্ঞান-বুদ্ধির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব লইয়া, যতই ইহাতে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হয়েন, ততই দেখিতে পান যে, তাঁহার কোন তত্ত্বই উহার আসল বিষয়ের মূলে যাইয়া স্থান পায় না; অথচ উহাতে অসাধারণ বিবিধ

কার্য্যের সুপ্রকাশ দেখিতে পান। ইহাতে বুঝাইয়া দিতেছে যে, অন্তঃজ্ঞানের কার্য্যকারণ নির্দ্ধারণের সম্যক্ জ্ঞান, বিজ্ঞানের নাই। আর এমনও হইতে পারে যে, আমরা অনেক বিষয়ের ক্রিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু তাহার কারণ জানিবার ক্ষমতা আমাদের জন্মে নাই, পরে ঐ কারণ-জ্ঞানের ক্ষমতা, জন্মিলেও জন্মিতে পারে। এ স্থলে এইটি বুঝিলেও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, মনুষ্যের জ্ঞানের যেমন সীমা নাই; তদ্রূপ কার্য্যের সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে বিলম্বও রহিয়াছে।

মনুষ্য, যত দিন না আপনার এখানকার কর্ত্তব্য কাজ অবগত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, ততদিন ঐ উন্নতির ফল লাভে বঞ্চিত থাকে। আবার যখন সে আপনার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পথ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা পায়, ততই তাহার ঐ জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। তখন মনুষ্যের কার্য্য যে অসাধারণ রূপে প্রকাশিত হইবে, এবং ঐ কার্য্যের পরিণাম-ফল যে বিশেষ সন্তোষজনক, ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। অতএব সংসার-ক্ষেত্রে থাকিতে গেলে, অগ্রে আপনাকে চেনা, যেমন প্রতি মনুষ্যের প্রধান কাজ, তদ্রূপ তাহাদের এখানকার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া, ও তৎপথে অগ্রসর হওয়া তেমনই উচিত ও কর্ত্তব্য হইতেছে।

আমরা হিন্দু-জাতি। হিন্দুর বিষয় লইয়া, যত আলোচনা হইবে, ততই আমাদের আত্ম-জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এজন্য এক্ষণে হিন্দু-জাতি, তাহাদের বর্ত্তমান ভাব, ধর্ম্ম বিষয়ে ভেদাভেদ এবং উপনয়নে উপবীতগ্রহণ, এই সকল প্রস্তাব যথাক্রমে ইহাতে সন্নিবেশিত হইল, পরে অন্যান্য বিষয় প্রকাশ করা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জাতি-তত্ত্ব।

১। হিন্দু-জাতি।

মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি ; কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্রের অবস্থা ভেদে, ইহারা নানা প্রকার জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্যে সকল মনুষ্যই সমান। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ, তাঁহাকে ছাড়িলে, কাহার আদি ও অন্তের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া উঠে না। মনুষ্য মাত্রেই যদি এক জাতি হইল, তবে প্রাচীন হিন্দুদিগের শাস্ত্রে, মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ে, যে ভিন্নভাব দেখা যায়, তাহার কারণ কি ? ইহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই, এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

হিন্দু-শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, ব্রহ্মা মনুষ্য জাতির উৎপাদক। কেহ তাঁহার মুখ হইতে, কেহ তাঁহার বাহু হইতে, কেহ তাঁহার ঊরু হইতে, এবং কেহ তাঁহার পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জীবোৎপত্তির এই অনৈসর্গিক ব্যাপার শ্রবণ করিলে, কাহার মনে না প্রতীতি হয় যে, হিন্দু-শাস্ত্রে মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক যে বর্ণনা, তাহা নিতান্তই ভ্রান্তি-মূলক। জীবোৎপত্তির এরূপ অযথা কার্য্যকারণ ভাব, কে কোথায় দেখিয়াছে ? দেখা দূরের কথা, কেহ কর্ণেও শ্রবণ করে নাই যে, মুখ, বাহু, ঊরু ও পা হইতে কোন মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ-রাজ্য ও সামুদ্রিক কতিপয় প্রাণী ভিন্ন অঙ্গাদি হইতে কাহারও উৎপত্তির বিষয়, কুত্রাপি দেখা শুনা যায় না। ঈশ্বর সকল মনুষ্যের আদি পিতা মাতা। তাঁহার অসাধারণ পবিত্র স্নেহে, সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। কেহ প্রধান, কেহ অধমরূপে সৃষ্ট হইবে, এরূপ ভাব,

সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পুরুষে কল্পনা করা যাইতে পারে না। আমরা সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট, আমাদের জ্ঞান পরিমিত,—আমাদের চক্ষে কেহ ভাল, কেহ মন্দ, এ ভাব জন্মিতে পারে। আমরা যাহাকে ভাল বাসি, সেই আমাদের চক্ষের প্রিয়,—তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারি। আর যাহাকে ঘৃণা করি, তাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া মানি; কিন্তু সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব ন্যায়বান পিতার নিকট, সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে,—কেহই তাঁহার উচ্চ-উদারতায় বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। মনুষ্যত উচ্চ-শ্রেণীর জীব, তিনি যখন অসংখ্য নিকৃষ্ট জীবেরও স্বষ্টিকর্ত্তা হইয়া, সকলকে সমান দৃষ্টিতে দিবারাত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তখন এই উচ্চ শ্রেণীতে যে, তাঁহার এইরূপ কার্য্যের বৈপরীত্য প্রকাশ পাইবে, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে ঐ হিন্দু-শাস্ত্রে মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক যে বর্ণনা আছে, তৎপ্রতি কি ভাবে, কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে; তদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু-জাতি একটি নূতন জাতি নহে। পৃথিবীর আদি উন্নতির সোপানে, প্রথমেই এই হিন্দু-জাতি পদার্পণ করিতে অগ্রসর হয়েন। সেই উন্নতির চরম-সীমা পর্য্যন্ত যদি কেহ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে এই হিন্দু-জাতি• ভিন্ন আর কেহই নহে। এস্থলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর অপরাপর জাতি, ইহাঁদের উন্নতির ক্রম অবলম্বন করিয়া, পশ্চাতে আপনাদের অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে হিন্দু-জাতির এতদূর গৌরব সমস্ত জগৎ ঘোষণা করিতেছে, সেই হিন্দুদিগের শাস্ত্রে মানব-জাতির উৎপত্তি বিষয়ে, এমন অযথাসম্ভব বর্ণনা কেন দেখিতে পাওয়া যায়? অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। এক্ষণে সে বিষয় প্রতিপন্ন করা যাইতেছে।

ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। হিন্দু-শাস্ত্রে ঈশ্বরের এই প্রধান তিনটি গুণ বা শক্তি প্রকাশ থাকাতে, তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ একই তিন, এবং তিনই এক। যিনি যে ভাবে কেন তাঁহাকে স্মরণ-মনন করুন না, সেই একে আসিয়া স্থান পাইবে; সুতরাং ব্রহ্মা মনুষ্যের উৎপাদক, এ কথা বলিলে, এইটি বুঝাইয়া দিতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ মনুষ্যের সংখ্যা ক্রমে যখন অধিক হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহারা একটি সমাজ সংগঠন করিল। ঐ সমাজ হইতেই মনুষ্যের এই উৎপত্তি বিষয়ক বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে। সমাজের কার্য্য-প্রণালী পরস্পরের সাহায্যে, যাহাতে সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়, এই জন্যই কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত হয়, এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধন জন্য, তাহাদের মধ্যে, যাহারা যে বিভাগের উপযুক্ত, তাহাদিগকে সেই সেই বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তৎকালে যাহারা যে নিয়ম বিভাগে আবদ্ধ থাকিয়া কার্য্য করিত, তাহাদের কার্য্য অনুসারে উৎপত্তির স্থানও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর ঐ নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের কার্য্য অনুসারে তাহাদের নাম ও বর্ণের ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে। দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে মনুষ্য চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় বিভাগে ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বিভাগে বৈশ্য এবং চতুর্থ বিভাগে শূদ্র। এই চারিটি বিভাগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তাৎকালিক মানব-জাতির সর্ব্বোচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সে অধিকারে নিয়ত রত থাকিতে গেলে, সমাজের অপরাপর বিষয়ে এক প্রকার ঔদাসীন্য আসিয়া পড়ে; একারণ সমাজ-স্থিতি-রক্ষার জন্য কতকগুলিকে দেশ রক্ষা ও শাসন-কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। আর কতকগুলিকে কৃষি ও

বাণিজ্য ব্যবসায়ে; অবশিষ্ট কতকগুলিকে পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগের সাহায্যার্থে নিয়োগ করা হইল।

মনুষ্য মাত্রেই পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিত ভাবই মনুষ্যের উন্নতির দশা আনয়ন করিয়া দিবার প্রধান কারণ। কোন সমাজে এমন লোক দেখা যায় না, যাহাদের মধ্যে, প্রত্যেকে আপনাপন সংসার বা সমাজের ছোট বড় সকল কার্য্য সমাধা করিয়া, সংসার ও সমাজ রক্ষা করিতে পারে। সংসারী হইয়া, সমাজ-ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত যোগ রাখিয়া, কার্য্য করিতে গেলে, প্রত্যেককেই কোন না কোন একটি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। সমাজের নানা অভাব থাকিতে পারে। অভাব থাকিলে যতক্ষণ না সেই অভাবের পূরণ হইবে, ততক্ষণ সমাজের উন্নতি হইবে না। হিন্দুগণ যখন আপনাদের উন্নতির জন্য যত্নশীল, তখন কার্য্য-বিভাগেরও আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই পূর্ব্বোক্ত চারিটি মূল বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরাপর জাতি, এই চারিটি মূল-বিভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহারের অন্যথা রূপে চলিত, তাহাদের সাধারণ নাম ম্লেচ্ছ-জাতি। ঐ ম্লেচ্ছ-জাতির মধ্যে যবন প্রধান। ঐ যবন হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়া, দেশ বিশেষে, তাহাদের জাতীয় ভাব স্বতন্ত্র প্রকারে দাঁড়াইয়াছে।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই ইহার নিগূঢ় ভাব সকল, আমাদের নেত্র-পথে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রথমে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বুঝাইয়া দেয় যে, যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়াছেন;

অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁহার অনন্ত-জ্ঞান, বিচিত্র শক্তি ও মঙ্গল ভাব অন্তরে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তৎকালের সমাজে যাঁহারা ঈদৃশী ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেন না সকলের আরাধ্য ও পূজনীয় হইবেন? এক্ষণেও আমাদের মধ্যে যিনি ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি কি বর্ত্তমান সমাজে সাধারণের শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় হয়েন না? ঈশ্বরের আরাধনা যখন মনুষ্য-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ-কার্য্য, যিনি ঐ কার্য্যে রত থাকিয়া, আপনার জীবনের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন, তাঁহারই জীবন সার্থক হয়। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার কার্য্য যে, সাধারণের বিশেষ সন্তোষজনক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; সুতরাং তিনিই সমাজের সুনীতির প্রকৃত উপদেষ্টা ও তাঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিয়া চলাই যথার্থ সাধুকার্য্য। পূর্ব্বতন সমাজে যাঁহাদের ঐ রূপ আচার ব্যবহার ছিল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ-পদে বাচ্য হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত পাঠে, আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তৎকালের ব্রাহ্মণগণ হিন্দু-সমাজের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ঈশ্বরারাধনায় নিরত, সত্য-বাক্ মহর্ষিগণ ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা ঈশ্বর-ধ্যানে অপার সুখ-শান্তি লাভ করেন, তাঁহাদের নিকট সাংসারিক অনিত্য সুখ অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। ঐ শ্রেণীর ধর্ম্মাত্মারা এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া, নিজ নিজ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন, অথচ সমাজের কোন বিঘ্ন না ঘটে, এই জন্যই তৎকালে চারিটি শ্রেণী-বিভাগের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মণ বিভাগের পর্য্যালোচনায়, আমরা ইহাই জানিতে পারিতেছি যে, যাঁহারা ব্রহ্মকে বিশেষ রূপে জানেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। এই সংক্ষিপ্ত নামে, ইহাও প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কখন অযথা

কথা আপনাদের মুখ হইতে নির্গত করিতেন না। যাহা সত্য, *ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত, তাহাই ব্রাহ্মণের বাক্য।* অতি পূর্ব্ব-কাল হইতে, তাঁহাদের বাক্যে সাধারণের আন্তরিক বিশ্বাস থাকাতে, অদ্যাপি জন-সমাজে এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, "ব্রাহ্মণের বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে।" অতএব এ সকলে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতেছে যে, তৎকালে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহারা তৎকালের সমাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের পূর্ব্ব-বাক্য সকল, যখন কার্য্যকালে ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় ফলপ্রদ হইয়া থাকে, তখন যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ ও যোগবলে বলীয়ান ছিলেন, তাঁহাদের বাক্য যে অলঙ্ঘনীয় হইবে, একথা কে অস্বীকার করিবে ?

মনুষ্যের অন্তরের ভাব, বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিলে, তাহা যেমন অন্যের হৃদয়ঙ্গম হয়, আকার ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিলে, তত সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্যই বাক্যকে অন্তরের ভাব প্রকাশক বলে। ঐ বাক্য আমরা মুখ দিয়া বাহির করিয়া থাকি। এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন, তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত। মুখ হইতে জন্ম পরিগ্রহ বলিলে, ব্রাহ্মণের কতদূর শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়, যাহারা ব্রাহ্মণের কার্য্যে রত, তাঁহারাই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাক্য উচ্চারণ করিবার যন্ত্র, মুখ। ঐ মুখ, অর্থাৎ বাক্য, যাঁহাদের নিয়তই সত্য ছিল, তাঁহাদের আচার ব্যবহার যে বিশুদ্ধ ছিল, এ কথা ইহার সঙ্গেই বুঝাইয়া দিতেছে।

যে মনুষ্যের কথায়, সকল কাজ চলে, তাহার পক্ষে অন্য কোন ইন্দ্রিয়-চালনার আবশ্যকতা থাকে না। আবার ঐ বাক্যগুলি

যদি নিজে কি অন্যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে, অনেক সময়ে বাক্যব্যয় না করিয়া, স্থির থাকিতে পারা যায়। তৎকালের ব্রাহ্মণগণ যখন সর্ব্বদাই পরমার্থ কার্য্য, ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহাদের মৌখিক বাক্য ব্যয় করিবার বেশি সময় হইয়া উঠিত না, তখন তাঁহাদের লিপিবদ্ধ বাক্য দ্বারাই সমাজ পরিচালিত হইত। ঐ পবিত্রবাক্ ঋষিদিগের রচনা সকল, ক্রমে, হিন্দু-সমাজের ধর্ম্ম-পুস্তক হইয়া উঠিল। অদ্যাপি উহা ঐ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আমরা যতই এই সকল বিষয়ের আদি অন্তের পর্য্যালোচনা করিব, ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব ঋষিবাক্য সকল. কোন কালেই অসত্যতার পরিচয় দিত না। যাঁহাদের বাক্যই সকলের সার, সেই বাক্যের উৎপত্তি স্থান মুখকে, তাঁহাদের জন্ম-স্থান, এ কথা বলিলেত, আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ইহাতেও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ক্ষত্রিয়দিগকে বাহু হইতে উৎপন্ন বলিলে, তাহাতে কোন দোষ দর্শে না। বরং দেখা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয় এই শব্দটি বলিলে, তৎসম্প্রদায়ের কার্য্য কলাপের প্রকৃত ভাবার্থ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেয়। যিনি অন্যের অত্যাচার ও উৎপীড়নাদি হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলে। ক্ষত্রিয়গণ প্রজা-পালন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ, তাহার বাহু-বলই প্রধান বল। যাহার বাহু-বল নাই, সে কেমন করিয়া শত্রু-পক্ষের নির্যাতন হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারে? সুতরাং দৈহিক-বল বলিলে, হস্ত তাহার প্রধান অঙ্গ বুঝায়। কেবল দৈহিক বলাধিক্য থাকিলেও শত্রুকে পরাজয় করা যায় না। স্থলবিশেষে একথাও সম্ভবপর বটে; কিন্তু যিনি শত্রু-

মিত্রের বলাবল ও অত্যাচারের ইতর বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ,—যিনি কর্ত্তব্য-কার্য্য সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,যিনি বিপদ কালেও মুহ্যমান হয়েন না, এবং বিশেষ ধৈর্য্য-গুণ-সম্পন্ন, ঈদৃশ লোক, দৈহিক-বলে হীন হইলেও, তাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই দেশ রক্ষা হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে যাহার নিজবাহু-বল সম্মিলিত হয়, তাহার পক্ষে আর কোন সংশয় থাকে না। তৎকালের সমাজে, যাহারা বলবীর্য্যে ও মানসিক ক্ষমতায় এরূপ তেজীয়ান ছিলেন, তাহাদিগ-কেই এই ক্ষত্রিয় নাম দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ক্ষত্রিয়গণ দেশরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; এই জন্যই তাঁহাদিগকে নরপতি বা রাজা বলিত। রাজার প্রধান কার্য্য, রাজ্য-রক্ষা ও প্রজা-পালন করা। রাজ্য-রক্ষা ও প্রজা-পালন করিতে গেলে, অর্থের আবশ্যকতা দেখা যায়। রাজা প্রজাদের নিকট যে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, উহাই ঐ অর্থ-সংগ্রহের উপায়। যিনি প্রজাদিগের নিকট অর্থ-সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে না জানেন, রাজ্য-রক্ষা করা, তাঁহার পক্ষে বিষম বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। যে রাজার কোষাগার বিবিধ ধন্য-ধান্যে পরিপূর্ণ এবং নগর ও দুর্গাদি যোদ্ধৃবর্গে সুরক্ষিত থাকে, সে রাজ্যে শত্রুর ভয় থাকে না। তথা-কার প্রজাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাপন পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। সে জনপদ শত্রু-পক্ষের অত্যাচারে আলোড়িত হয় না; সুতরাং দেশের উন্নতির পথ চির-কল্যাণময় হইয়া উঠে। পূর্ব্বতন হিন্দু-সমাজে, যাঁহারা আর্য্য নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের তাৎকালিক মহোন্নতি ঐ ক্ষত্রিয়কুল হইতে হইয়াছিল। ঐ ক্ষত্রিয়গণ যদি বল-বীর্য্য ও ঔদার্য্যে সম্যক্ উপযোগী না হইতেন, তাহা হইলে কখনই আর্য্য-জাতির ঐরূপ মহোন্নতি ঘটিত না। ইহাতে সবিশেষ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে ক্ষত্রিয়গণ যে প্রকার যত্ন, পরিশ্রম ও ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া,

দেশ রক্ষা করিতেন ; বর্ত্তমান জগতে কোন একটি জাতিতে, তাহার সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও রাজ-নৈতিক বিষয়সমূহ, যে সকল অসংখ্য সমুজ্জ্বল রত্নে খচিত রহিয়াছে, এক্ষণকার উন্নতিশীল জাতিমাত্রেই তাহার অনুকরণে যত্নবান্। ঐ যত্ন থাকাতেই তাঁহাদের দেশের দিন দিন এত উন্নতির দশা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার মুল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আর্য্য-জাতিকে ধন্যবাদ না দিয়া, কেহই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। এক জন জর্ম্মন পণ্ডিত-শিরোমণি নিজ পুস্তকে এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, "হিন্দুদিগের আর্য্য-ধর্ম্মের কি মহীয়ান ভাব! যে সকল মহৎ তত্ত্ব, আমাদের মহাপ্রভু খৃষ্টের ধর্ম্ম ও মহম্মদ-ধর্ম্মে নাই, এক আর্য্য-ধর্ম্মে তৎসমুদয় পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।" বৈদেশিক জ্ঞান-বলও এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অন্তর ধর্ম্ম-ভাবে পরিষ্কৃত ও বাহুবলে বলীয়ান ব্যক্তি যদি দেশ-রক্ষা কার্য্যের সম্যক্ উপযোগী হইল, তবে তৎকালের যে সকল লোক ঐ রূপ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বল-বীর্য্যের প্রকাশক শব্দে আহ্বান করিলে, তাহা যেমন যুক্তিযুক্ত হয়, অপর কোন শব্দে তাহার তত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হইয়া উঠে না। বল-প্রকাশের প্রধান অঙ্গ বাহু। ক্ষত্রিয়গণ ঐ বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথায় তাহাদের সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার যতদূর পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়, এমন অন্য শব্দে বুঝা যায় না। এই জন্যই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি, বাহু হইতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাহারা কেবল শব্দের অর্থ লইয়া, একে অন্যভাব আনিতে চান ; তাহাদের মতের সহিত যদিও এ বিষয়ের অনৈক্য দেখা যায় ; কিন্তু ইহার অন্তর্নিবেশিত ভাবের সঙ্গে শব্দার্থের কিছুই বিভিন্নতা দেখা যায় না।

এই রূপ বৈশ্য-বিভাগের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, ইহাতেও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ভাব পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিবে, কি প্রকারে বৈশ্যগণ ঊরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বৈশ্য শব্দের অর্থে বণিক্ ও কৃষক বুঝায়। যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্য বেশ বুঝিতে পারিত, তাহাদিগকেই বৈশ্য বলা হইয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্য, সমাজ-স্থিতি-রক্ষা ও দেশের উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়। দেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় ও কৃষি-কার্য্যের প্রচলন না থাকিলে, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্তই কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত। যে দ্রব্য এক দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং আবশ্যক অপর দ্রব্য অন্যত্র ভিন্ন পাওয়া যায় না, এমন স্থলে দ্রব্যাদির বিনিময় ভিন্ন পরস্পরের অভাবের কোন মতে পূরণ হইয়া উঠে না। বাণিজ্য-ব্যবসায় এই অভাব-পূরণের প্রধান উপায়। এই বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রচলন থাকাতেই, আমরা দূর দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সকল, অপর দেশে লইয়া যাইতে দেখি। এই বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কল্যাণে দেশ-বিদেশের নানা অভাবের মোচন ও সুখ-সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতেছে। যে দেশের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ নহে, সে দেশে অর্থাগমের পথ সুবিস্তৃত। সেখানকার সাধারণ লোকেরও অবস্থা দেখিলে, পরিতোষ লাভ করা যায়। আর প্রধানতঃ যাহারা কেবল ঐ কার্য্যে রত থাকে, তাহাদের অবস্থা যে, আরও সন্তোষজনক, এটি কাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

কৃষি ও ব্যবসায়ী হইতে গেলে, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় থাকা আবশ্যক। দেশ বিদেশের আচার-ব্যবহার, দেশোৎপন্ন বস্তুর গুণাগুণ, কোন্ ঋতুতে কি কি দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিলে, তাহাতে অর্থাগম হইবে ও দেশ বিদেশে যাতায়াতের জল ও স্থল-পথ ইত্যাদির

বিষয়, যিনি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয়েন; তিনিই ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যে সুদক্ষ হইতে পারেন। এই ব্যবসায়ের মূলে পরিশ্রম সর্ব্বপ্রধান বিষয়। যাহারা গমনাগমনের কার্য্যে সুপটু নহে, নিতান্ত অধৈর্য্য, তাহারা দূর দেশ পর্য্যটন-কার্য্যে রত থাকিয়া, কি প্রকারে পারদর্শী হইতে পারে? সকল দেশে যাইবার জন্য সর্ব্বদা যানাদি পাওয়া যায় না। স্থল বিশেষে চলাচলের এমনই দুর্গম পথ আছে যে, পথিকগণ, কেবল পদব্রজে অতি কষ্টে তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। আর ব্যবসায়-বাণিজ্য কার্য্য কেবল স্বদেশে থাকিয়াও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এ কারণ এক দেশের লোক, ভিন্ন দেশে, এই ব্যবসায় উপলক্ষে যাইয়া উপস্থিত হয়। যে দেশে যে দ্রব্যের অভাব, তথায় ঐ দ্রব্য লইয়া বিক্রয় করিলে, তাহাতে যেমন লাভ হয়, স্বদেশোৎপন্ন বস্তু দ্বারা, সেই দেশে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে রত থাকিলে, ততদূর লাভবান হওয়া যায় না।

চলাচলের কার্য্যে পটুতা ভিন্ন, ব্যবসায়-কার্য্য সুচারুরূপে চলে না। যিনি স্বদেশে থাকিয়াও কোন ব্যবসায়-কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহাকেও প্রতিদিন ব্যবসায়-স্থানে যাইয়া সকল কার্য্যের তথ্যানুসন্ধান লইতে হয়। "যিনি নিজ-কার্য্য, আপন চক্ষে দেখেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্ণ বর্ষে।" যিনি এই সুনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাঁহার অচিরাৎ সৌভাগ্য ঘটে। আর যিনি ইহার অন্যথা পথে বিচরণ করেন, তিনি মহতী লক্ষ্মী লাভ করিয়াও পশ্চাতে বিষম ঋণ-জালে, জড়ীভূত হইয়া পড়েন। ব্যবসায়ের এই মূল-মন্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে, নিত্য কার্য্যক্ষেত্রে যাওয়া আসা চাই। ঐ যাওয়া আসা, আমাদের পদ-দ্বয়ের উপর নির্ভর করে। যাহার উরু-দেশ সুদৃঢ়, তাহার চলাচলের কোন বিঘ্ন ঘটে না। এই জন্যই তাৎকালিক সমাজে, যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য কার্য্য,

রীতিমত পরিজ্ঞাত ছিলেন, ও যাহাদের উরু-দেশ সুদৃঢ় ছিল, তাহাদিগকেই ব্যবসায় ও কৃষি-কার্য্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল। আর যাহাদের উরু-দেশ সুদৃঢ়, অর্থাৎ যাহারা দূরাদূর গমনে শ্রম-সহিষ্ণু, তাহারাই বৈশ্য শব্দে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই বৈশ্য শব্দের ভাবার্থে, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াদির সবিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদের জন্মস্থান উরু, এ কথা বলিলে যেমন বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা পায়, বৈশ্য-শব্দে তেমনই ইহার পরিষ্কার ভাবার্থ বুঝা যায়।

যাহার চলৎশক্তি সামান্য, অথবা একবারেই উহা রহিত হয়, এমন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবসায়-কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহাকে ঐ বৈশ্য শব্দে উল্লেখ করা যায় কি না ? আমরা এ প্রশ্নেও ইহার বিশেষ সার্থকতা দেখিতে পাই। ব্যবসায় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই কাহাকে একবারে ধনেশ্বর হইতে দেখা যায় না। প্রথমে অবশ্যই তাহাকে নানা প্রকার শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। ব্যবসায়ের প্রধান কাজ ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা। কর্ম্ম স্থানে যাইয়া, নিত্য পরিদর্শন ভিন্ন উহা ঘটিয়া উঠে না। যাহার পা বিকল, তিনি কেমন করিয়া যাতায়াতের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন ? তবে সম্ভবতঃ এটি সত্য, যিনি ব্যবসায়-বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সঙ্গতি সম্পন্ন হইয়া, যদি দৈবগতিকে চলাচলের কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার অবস্থা গুণে যে যানাদি থাকে, তাহারই সাহায্যে যাতায়াত ক্লেশকর হয় না, এবং পরিদর্শনেরও কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এ বিষয়ে আর একটি কথা এই যে, সামান্য ব্যবসায়ে যে প্রকার শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, শরীর অপটু হইলে, তাহার পক্ষে, এ কার্য্য নিতান্তই অসুখের কারণ হইয়া উঠে। উন্নত-ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রমের ভাগ সামান্য। ভৃত্যাদির দ্বারা উহার অনেক লাঘব হয়। "বাণিজ্যে

বসতে লক্ষ্মীঃ” সংসারে বিচরণ কর, এই বাক্যের সার্থকতা কি সর্ব্বত্র সমান রূপে দেখিতে পাওয়া যায় ? যেখানে ইহার অন্তর্ভূত বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই, সেই খানেই ইহার অন্যথা দেখা যায়। সুতরাং ঐ রূপ স্থানে, তাহাকে বৈশ্য না বলিয়া, ব্যবসাদার, এই সাধারণ বাক্যে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। বৈশ্য শব্দে যে ভাবার্থ বুঝায়, তাহা কখনই এ স্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। সুবর্ণ-বণিক্‌, কাংশ্য-বণিক্‌ ও গন্ধ-বণিকেরা যে এই বৈশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত ছিল, এটি অনেকাংশে বুঝা যায়। ইহাদের আচরণ ব্যবহারের দোষাদোষ অনুসারে সমাজে কেহ উচ্চ, কেহ নীচ ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে শূদ্রদিগের উৎপত্তি-বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। দেখা যাইতেছে যে, শূদ্রেরা পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রধান বিভাগের সাহায্যার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহাদের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না, যাহাতে তাহাদের শব্দার্থে কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বুঝায়। শূদ্র-শব্দে যখন সেবক বা সাহায্যকারী, এই ভাবার্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন উপরোক্ত তিনটি বিভাগে যাহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্য করা, শূদ্রদিগের কর্ত্তব্য ছিল। যিনি যে কার্য্যে পারদর্শী হউন না কেন, তিনি যদি আপন কার্য্য-সাধনে অন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হন, সে কার্য্য সমাধা করা, তাঁহার পক্ষে যেমন স্বল্পায়াস সাধ্য হয় ; স্বয়ং ছোট বড় সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করা তেমনই কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। এই জন্যই তৎকালের সমাজে শূদ্রদিগকে সাহায্যার্থে নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই শূদ্রজাতির প্রধান কার্য্য যে, পরের সাহায্য করা ; অর্থাৎ চাকরী, ইহার আভাস অদ্যাপি জন-সমাজের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অধীন ব্যক্তিগণকে উচ্চ-শ্রেণীর পদ-তলে থাকা, এই কথাটি বলিলে, তাহাদের যেমন গৌরবের

বিষয় হয়; এমন কোন ব্যাখ্যা নাই, যাহা বলিলে, এ ভাবটি *বিশেষ রূপে সুপ্রকাশিত করিয়া দেয়। এই আশ্রিত আশ্রয় ভাবটি বহুকাল হইতে চলিয়া আসাতেই যে, শূদ্র-জাতি ব্রহ্মার* পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইটি বুঝাইয়া দিতেছে। কার্য্যে অপটু ও উদ্ধত ভৃত্য প্রভুর যেমন মনোরঞ্জন করিতে পারে না, কার্য্যে সাহায্যকারী অনুগত ব্যক্তি তেমনই সন্তোষের কারণ হয়। পূর্ব্বতন শূদ্রেরা অনন্যমনে, আপনাদের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; এ কারণ বিশেষ পরিতোষের চিহ্ন স্বরূপ তাহাদের জন্ম-স্থান পদতল, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সকলে জানাইয়া দিতেছে যে, হিন্দু-শাস্ত্রে মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক বর্ণনা, উহার অন্তর্নিবিষ্ট ভাব সকল লইয়া বিবৃত হইয়াছে। সহজ কথায় যে অর্থ বুঝায়, তাহার বিভিন্নতা হইলে, কার্য্যের ভাবগতি লইয়া যদি ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কখনই যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রের মূলে প্রবেশ করিতে চান না,—হিন্দুর আচার ব্যবহার, যাঁহাদের দুই চক্ষুর শূল, তাঁহারা ইহার সহজ কথার অর্থ লইয়া, ইহাতে বিষম কলহ উপস্থিত করেন।

সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়াই মনুষ্যের জাতীয়-ভাব সংগঠন হয়। যাঁহারা জাতি মানেন না এবং নিজ জাতিগত বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না যে, তাঁহাদের এরূপ অনুষ্ঠিত কার্য্যে ক্রমে একটি নূতন জাতি গঠিত হইতেছে কি না? এ রূপ স্থলে, এক পক্ষ যেমন তাঁহাদের পূর্ব্ব সাম্প্রদায়িক লোকদের সংস্রব পরিত্যাগ করিতেছেন; তদ্রূপ অপর পক্ষ, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে বিরত হইতেছেন। সমাজের অন্তর্ভূত এই সকল

বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, মনুষ্য *কখনই একবারে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। যে নিজে জাতি-ভ্রষ্ট হয়, তাহাকেও যখন তন্নিম্নে যাইয়া,* তাহার একটির আশ্রয় লইতে হয়, তখন জাতীয় ভাব, মনুষ্যের আর কেমন করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ পাইতে পারে? এক্ষণে সংক্ষেপে জাতিগত আধ্যাত্মিক ভাবের আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতের মহর্ষিগণ আহারাদি বিষয়ে যে প্রকার ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বিষয়ের নিগূঢ়-তত্ত্ব, এমনই সূক্ষ্ম, যাহা সাধারণ হৃদয়ে বোধগম্য হইবার নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া, কখনই সে গুলি উপেক্ষার যোগ্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ ভারতে আহারের সঙ্গে জাতিগত আধ্যাত্মিক ভাব যত দূর প্রবল দেখা যায়, অন্যান্য দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। উচ্চ-শ্রেণীর অন্ন নিম্ন-শ্রেণীর লোকে অবাধে আহার করে; কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর অন্ন কুত্রাপি উচ্চ-শ্রেণীর লোকে গ্রহণ করে না; এই যে জাতিগত ভাবটি প্রচলিত, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা ইহার অন্তর্ভূত বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না; তাঁহারাই জাতিগত পার্থক্যে নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন। একটুকু স্থিরচিত্তে ইহার অন্তর্নিহিত কার্য্যকারণ গুলি ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে জাতীয় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে, তাহাতে যে সুমহৎ উপকার দর্শে, তাহার অন্যথায় নিশ্চয়ই মহানর্থ উৎপাদন করে। এক্ষণে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দেখা যায়, ভারতের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আহার যেমন পরিশুদ্ধ ও সত্ত্ব-গুণপ্রদ, তন্নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের আহার্য্য বস্তু তেমনই রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত। যে যে নিয়ম প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হওয়া যায়, তন্মধ্যে আহারের নিয়ম

রক্ষা না পাইলে কোন রূপেই সে পথের পথিক হওয়া যায় না। উদ্ভিজ্জভোজী জীবদিগের স্বভাব, স্বভাবতই নিতান্ত মৃদু। আর আমিষভোজী জীবদিগের স্বভাব, স্বভাবতই নিতান্ত উগ্র। প্রকৃতির এই জীবন্ত-ভাব সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে এইটি বুঝিতে হইবে যে, যিনি যে প্রকার পথাবলম্বী হইবেন, তাঁহাকে তদনুরূপ নিয়ম গুলি পালন না করিলে, সে পথের যথার্থ পথিক হওয়া যায় না। এই জনাই আর্য্য-জাতির উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা আমিষ পরিত্যাগ করিয়া, নিরামিষভোজী ছিলেন। আর যাহারা বল-বিক্রমের কার্য্যে রত থাকিতেন, তাঁহারাই আমিষ ভক্ষণে তৃপ্তি বোধ করিতেন। অপরাপর জাতি যাহারা অধিকাংশ সময়ে উদ্ভিজ্জ ও সময় বিশেষে আমিষ ভক্ষণ করিত, তাহাদের স্বভাব অপেক্ষাকৃত অনুগ্র। এই সকল প্রকাশ্য বিষয়ের আলোচনা করিলে, ইহাতে জাতিগত প্রথা কেবল আংশিক প্রকাশ পায়; কিন্তু আর একটু অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে, ইহার নিগূঢ় ভাবের উদ্ভেদ হয়। তখন জাতীয় ভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যে সকলের পক্ষে উচিত, এটি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এক্ষণে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

মনুষ্যের জাতিগত ভাব, যেমন স্বজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন অন্য জাতিতে দেখা যায় না। এই জন্যই আমরা স্বজাতির নিকট থাকিয়া, জাতীয় ভাব শিক্ষা করি। যে, যে সমাজের অন্তর্গত, তাহাকে সেই সমাজ-প্রচলিত পানাহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়; সুতরাং ঐ পানাহারের গুণে তাহার জাতীয়ভাব গঠনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এই পানাহার সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় কথা আছে। এস্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আহার্য্য-বস্তুর দ্রব্যগত গুণ। দ্বিতীয়তঃ সংস্রব ও প্রস্তুতের প্রণালী। কোন বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থায় যে গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহার প্রস্তুত-প্রণালীর ইতর বিশেষ হইলে, তাহার গুণের অনেকটা ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন কোন শাক সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে, যে গুণ বর্ত্তে, সেই শাককে তৈল সংযোগে ভাজিয়া আহার করিলে, তদ্রূপ ফললাভ করা যায় না এবং ঐ শাককে মসলা বিশেষের সহিত পাক করিলে, আরও বিভিন্ন প্রকার হইয়া উঠে। ইহাকে দ্রব্যগত ভাব বলে। এই রূপ বস্তু বিশেষের সহিত সংযোগে পাক-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সংস্রব ও প্রস্তুত-প্রণালীর বিষয়টি বলা আবশ্যক হইতেছে।

মনুষ্য মাত্রেরই শরীরে বৈদ্যুতিক-শক্তির ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শক্তি মনুষ্যের সংস্রব প্রণালীগত ভাবে, অন্য বস্তুতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা বাহ্য-দৃষ্টিতে উপলব্ধ হইবার নহে; সুতরাং উহাকে বড়ই সূক্ষ্ম বিষয় বলিতে হয়। অথচ এ বিষয়ে ভারতের মনীষীরা যে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, নিম্ন-শ্রেণীর প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য আহার করা, কোন উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। অনেকে স্বগোত্র কিংবা স্বপাকে রন্ধন ভিন্ন যে আহার করেন না, তাহার প্রকৃত কারণ কি? আজ দেশে পাশ্চাত্য-বিদ্যার আলোচনার প্রাচুর্য্য থাকাতে, বৈদ্যুতিক-শক্তির ক্রিয়া-গুলির ভাব অনেকাংশে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে, প্রাচীন মহর্ষিগণ যে উহার নিগূঢ়-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাঁহাদের আদিষ্ট আসন, উপবেশন, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কার্য্যে উহার বিস্তর পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকন্তু আহার সম্বন্ধীয়

বিষয়টি আরও চমৎকার। জল ও অগ্নির সংযোগ বিনা, রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আর রন্ধনের সঙ্গে পাচকের সংস্পর্শ বড়ই নিকট সম্পর্ক। জল ও অগ্নির শক্তি-গ্রাহিণী ক্ষমতা থাকাতে, যে ব্যক্তি রন্ধন করে, তাহারই সংস্পর্শে ঐ আহার্য্য-বস্তুতে, তাহার স্বভাবের ভাব সংক্রমণ করে। যে নিয়ত এক জনের প্রস্তুত অন্ন আহার করে, তাহার স্বভাব, ক্রমে পাচকের ভাবে আসিয়া পরিণত হয়। এই জন্য নীচ-জাতি, যদি উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকের পাচক হয়, তবে তাঁহার স্বভাব, অনুলোম ক্রিয়াতে তাহারই অনুরূপ কেন না ঘটিবে? আহার্য্য-বস্তু ও তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়াগত ভাব রহিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হইলে, কখনই কাহাকে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হয় না। এ বিষয়ে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক, পানাহার বিনা, জীব-দেহ রক্ষা পায় না। আর ঐ পানাহারের সঙ্গে, যখন স্বভাবের ইতর বিশেষ গুণ বর্ত্তে, তখন নীচ-প্রকৃতি জনের হস্তে প্রস্তুত দ্রব্য, আর কেমন করিয়া, উচ্চ-শ্রেণীর লোকে গ্রহণ করিতে পারে? যদি স্বভাবকে উন্নত করিতে হয়, তবে সজ্জন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষের হস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করাই যুক্তিযুক্ত। যেখানে ইহার অভাব হইবে, তথায় স্বহস্তে পাক করাই বিধেয়। প্রকৃতি যখন তাহার জীবন্ত-ভাব প্রত্যেক বিষয়ে দেখাইয়া দেয়, তখন কাল্পনিক তর্ক-বিতর্ক কেবল মহানর্থের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদিও, ভারতীয় মহর্ষিদিগের প্রবর্ত্তিত আচার-ব্যবহারের নিয়মগুলির কারণ, প্রকাশ্যভাবে সকল স্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই; তথাপি তাঁহাদের প্রতি কার্য্যের বিষয়-পর্য্যালোচনা করিলে, তন্মধ্যে অভূতপূর্ব্ব মহান্ ভাবের পরিচয়, নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। যদি এই মহৎভাব রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক হয়, তবে তাহার সঙ্গে একটি জাতীয়ভাব আসিয়া পড়ে কি না?

এবং ঐ জাতীয়ভাব রক্ষা না পাইলে, কিরূপে উহার ফললাভে সমর্থ হওয়া যায়? ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু, কিন্তু বাহ্য-ক্রিয়া-কলাপে, উহার যতগুলি প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে সাবধান না হইলে, আসল বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায় না। ধর্ম্ম-পথে প্রবেশ করিব, অথচ ধর্ম্মের নিয়মে চলিব না, যাহাদের এ প্রকার মতি-গতি, তাহাদের ধর্ম্ম-ভাব কেন না ভিন্নভাবে দাঁড়াইবে? বেশ স্থির, ধীর ও নিবিষ্ট মনে ধর্ম্মের পথে চলিতে হইবে। ইহাতে যথেচ্ছাচারী হইয়া চলিলে কোন ফল দর্শিবে না। তাই বলি, পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের আদিষ্ট পথ অবলম্বন কর, তাহা হইলেই ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিতে পারিবে। হিন্দুর প্রতি কার্য্যের সুব্যবস্থা তাঁহাদের আদিষ্ট বিধির সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। কেবল আত্ম-স্বাধীনতারূপ দুরাচারকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, সাম্য-নিকেতনের উপযোগী হইতে পারিবে। যত আদেশ, উপদেশ, বিধি এ সকলই হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যন্তরে সন্নি-বেশিত রহিয়াছে,—নুতন সৃষ্টির কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, যাহা আছে, তাহা পালন করিতে পারিলেই যথেষ্ট। আমরা কাল-বশে পড়িয়া হতবুদ্ধি হই, তাই, হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি না। হিন্দু-সন্তানগণ যে কেন পর-ধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিতে যান, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়? আত্ম-ধনে বঞ্চিত হওয়া, কোন হিন্দুরই উচিত নহে। তাই বলি, হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-সমাজে বিশেষরূপে আলোচিত হইতে থাকুক, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই অচিরে সুফল দর্শিবেই দর্শিবে। কাল-দোষ ও শিক্ষা-দোষে, বর্ত্তমান সমাজে যে সকল অনর্থ উৎপাদন করিতেছে, পশ্চাল্লিখিত কতিপয় বিষয়ে, সে সকল ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাওয়া যাইবে।

২। হিন্দুর বর্ত্তমান ভাব।

সংসারাশ্রমে থাকিতে গেলে, সকলেরই এক একটি নির্দ্ধারিত উপজীবিকা থাকা আবশ্যক। অর্থাগমের উপায় ভিন্ন, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। এই জন্যই বর্ত্তমান সমাজে চাকরী ও ব্যবসায়ের সংখ্যা ক্রমেই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বৃদ্ধিরও অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণের নিজ জাতীয় ব্যবসায়, এক্ষণে প্রায় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য-চ্যুত হইয়া, নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন, এবং বৈশ্য ও শূদ্র জাতি আপনাদের ব্যবসায়ে থাকিয়া, আর পূর্ব্বের ন্যায় উপার্জ্জনে সমর্থ হইতেছে না,—শরীর রক্ষোপযোগী বিশুদ্ধ দ্রব্য সকলের মূল্য, এক্ষণে কোথায় দ্বিগুণ, কোথায় বা চতুর্গুণ হইয়াছে,—বিদেশীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষার গুণে, কত নূতনবিধ ব্যয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্যেরা হিন্দু-রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেন, তখন সকলকেই হিন্দু-ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলিতে হইত; সুতরাং তাঁহাদের নিজ নিজ আচার ব্যবহার ও ব্যবসায়ের উপর অন্য কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। তাহাতেই সকলের সংসার-যাত্রা অবাধে নির্ব্বাহ হইয়া উঠিত; কিন্তু এখন আমরা বিধর্ম্মাক্রান্ত রাজার হাতে পড়িয়াছি। এখন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার সকলই ভিন্নরূপ হইয়াছে; কিসে নিজে নিজে অর্থোপার্জ্জন করিব, বর্ত্তমান সমাজে এই চেষ্টার অভাব কুত্রাপি দেখা যায় না। অধিক কি, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয় এবং বিবাহ কার্য্যও অর্থোপার্জ্জনের প্রধান পথ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কত নূতন ধরণের চাকরী ও ব্যবসায়ের পথ দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান-সমাজে অর্থ-লালসার প্রবলতা হেতু সাধারণের আহার্য্য বস্তুতেও নানাবিধ অনিষ্টকর দ্রব্য-সংযোগে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ অবাধে চলিয়া আসিতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয়! নর-হত্যা ও গো-হত্যা করিয়াও অনেককে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে যত্নবান্ দেখা যায়। রাতারাতি ধনবান হইবার লালসায় সংসারে এবম্বিধ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, নর-হত্যা ও জীব-হত্যার স্রোতঃ এত প্রবল যে, কিছুতেই সে সকল নিবারণের উপায় হইয়া উঠিতেছে না। এই সকল দোষ নিবারণের জন্য ধর্ম্মাধিকরণ যত নূতন নূতন আইনের স্বষ্টি করিতেছেন, ততই তৎসমুদয়ের মধ্যে অভাবনীয় অভিনব উপায় আসিয়া দেখা দিতেছে। এক অর্থ-লালসার প্রবলতায় পড়িয়া, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, জাতি-বিচারের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করা, কি ভয়ানক ব্যাপার! ভারতের যে আর্য্য-জাতি সমস্ত পৃথিবীতে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের সন্তানগণের এরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া, অশ্রু সংবরণ করা যায় না। যাঁহারা জাতি-বিচারের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন না,—জাতীয় ব্যবসায় ধরিয়া চলেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা সমাজের হিত-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে, ইহার শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই ন্যায্য বলিয়া প্রতীতি হইবে।

সমাজ নানা প্রকার দুঃখ-দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা পাইবে, এবং পরস্পরের সাহায্যে অবাধে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, এই উদ্দেশে পূর্ব্বতন আর্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত মূল চারিটি বর্ণ-বিভাগের স্বষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ চারিটি মূল-বর্ণ হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ণীত ছিল। কেহই আপন

সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভিন্ন, অপর সম্প্রদায়ের কার্য্য করিত না। সমাজের অভাব ঐ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহায্যে মোচিত হইত; সুতরাং যে, যে বিভাগে থাকিয়া, অন্যের কার্য্য করিয়া দিত, সে তাহার নিকট কিছু কিছু সাহায্য পাইত। এই পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত ভাবই, সমাজের উন্নতির মূল কারণ ছিল। এখন ব্যবসায়ের অন্ত নাই, অনেকে পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন সম্প্রদায়ের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তথাপি বৈদেশিক শিল্প-জাত দ্রব্যের প্রচলন দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহাতে সত্বর এ দেশকে হৃত-সর্ব্বস্ব হইতে হইবে, তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজে যেমন নানাবিধ বিষয়ে অর্থের প্রয়োজন দেখা যায়, তেমনই প্রত্যেক ব্যবসায়ে প্রতারণার আধিক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অকৃত্রিম দ্রব্যের যেমন আদর ছিল, এখন কৃত্রিম দ্রব্যের তেমনই সমাদর দেখা যাইতেছে। এখন সৎ অসতের,—ভাল মন্দের বিচার বড়ই দুর্লভ। এখন মনুষ্যের মন যেমন নানা বিষয়ে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে, দ্রব্যাদি প্রস্তুতেও তেমনই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অনেকের বিশ্বাস ও ধারণা যে, এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা, শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি পাইতেছে; এ কারণ অনেক অকেজো বস্তু লইয়া, সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। তাঁহাদের এ কথায় কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে, অগ্রে তাহা দেখা যাউক, পশ্চাতে আপনাদের মতামত প্রকাশ করা যাইতেছে। যদি পূর্ব্বাপেক্ষা শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে অকৃত্রিম দ্রব্য আর পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে প্রস্তুত হয় না কেন? আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞান অকৃত্রিম দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কেন এত ভীত হয়? তাহাদের যত আধিপত্য কেবল কৃত্রিম

বিষয় লইয়া। শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক বিচারে আমাদিগকে, ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে, মনুষ্য যত নিকৃষ্ট-বৃত্তির চালনায় রত থাকে, ততই তাহাদের ঐ বিষয়ক জ্ঞান বাড়িয়া যায়; অকৃত্রিম বিষয়ে একবারে অন্ধ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান জগতে সত্যের আর আদর নাই। ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, এখন সকল বিষয় কৃত্রিমতার চাক্‌চিক্যে অনুরঞ্জিত; খাঁটি বস্তু পাওয়া এক প্রকার দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বতন শিল্প-বিজ্ঞানের কার্য্যের সন্ধান লয়েন না, তাঁহাদের চক্ষে বৈদেশিক চাক্‌চিক্য আসিয়া যে বিশেষ শোভা ধারণ করিবে, এটি অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু অদ্যাপি ভারতের স্থানে স্থানে পূর্ব্বতন শিল্প-বিজ্ঞানের যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, কত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, সে সকল দেখিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। ইহাতেই বুঝা যাই-তেছে যে, পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকবল এখনও আর্য্য-বিজ্ঞানের ন্যায় সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায় নাই। যাহার মন নানা বিষয়ে প্রধাবিত হয়, সে যেমন কোন একটি কার্য্য সুচারু রূপে সমাধা করিতে অক্ষম; তদ্রূপ আধুনিক বিজ্ঞান-বল, কোন একটি চূড়ান্ত বিষয়ের শেষ সীমায় যাইতে সমর্থ হইতেছে না। যত কৃত্রিমতার বিষয় লইয়া, বিজ্ঞান ঘুরিয়া বেড়াইবে, ততই তাহার কার্য্যফল, এই রূপেই প্রকাশ পাইবে। যখন দেখিবে, বিজ্ঞান সৎবিষয়ের চর্চ্চায় রত আছে,—নূতন নূতন অকৃত্রিম বিষয় প্রস্তুত ও তাহার আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছে, তখনই জানিবে যে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট-পথ দেখা দিয়াছে। শিল্প-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের মানসিক ব্যাপা-রের এই রূপ বিস্তর যোগাযোগ রহিয়াছে। যাঁহারা ইহার আলোচনায় রত থাকেন, তাঁহারাই ইহার নিগূঢ়-তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন।

কালের কি বিচিত্র গতি! এককালে এই হিন্দু-জাতির পরম সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। এখন ইহার সন্তান সন্ততি-গণের কি শোচনীয় দশা আসিয়া উপস্থিত! আমাদের সমাজে যে ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বর্গের মোক্ষ-ফল উপভোগ করিতেন; এক্ষণে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার দেখিলে, হৃদয় মর্ম্ম-বেদনায় যারপর-নাই ব্যথিত হয়। কালের কবলে পড়িয়া সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-বলের খর্ব্বতা হইল,—নিম্ন-শ্রেণীর লোকে তাঁহাদের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল, এবং হিন্দু-ধর্ম্মে সাধারণে বিষম কলহ আনিয়া উপস্থিত করিল। ইহার মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রাচীন আচার ব্যবহারের যতই খর্ব্বতা হইবে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-ভাব, ততই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিবে। মনুষ্য উন্নতির পর উন্নতির পথে ক্রমেই চলিয়া আসিতেছে, এই উন্নতির পথে কেহই বাধা দিতে পারে না। এক্ষণে দেশের যে প্রকার মতি-গতি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ ভরসা করা যায় যে, অসারত্ব-পরিপূর্ণ হিন্দু-ধর্ম্মের সত্বর বিসর্জ্জন হইবে। এই সকল অযথা কথা হিন্দু-সমাজের যেখানে যাইয়া স্থান পাইয়াছে, তথাকার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তথায় জাতি গেল, কর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল, কেবল যথেচ্ছাচার আসিয়া দেখা দিল। এখন যাঁহার বক্তৃতার জোর প্রবল, তিনিই সমাজের নেতা হইয়া উঠিয়াছেন। ধন্য ভারত! তোমার সকল সন্তান যে, এ কুহকে পড়িয়া, জাতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম একবারে হারাইতে বসেন নাই; এইটি পরম সৌভাগ্যের বিষয়! যেখানে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই, কেবল সেই খানেই ইহার এই রূপ প্রকোপ দেখা যায়।

অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে কার্য্যে বিশুদ্ধতা প্রকাশ পায় না। অন্তরকে বিশুদ্ধ করিতে গেলে, নিয়মাচারী হইতে হয়। সমাজের নিয়মাবলীর শ্রেষ্ঠতা আমরা অবশ্য স্বীকার করি এবং উহা

দোষাশ্রিত থাকাও সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু নিয়মাচারী বলিলে, সমাজের নিয়ম ধরিয়া চলা বুঝায় না। অন্তরকে পবিত্র কর, সংক্ষেপে এ কথা বলিলে, ইহার অন্তর্ভূত অনেক বিষয় বলিতে হয়। নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তিদিগকে দমন করিয়া, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিদিগকে উত্তেজিত করা, পবিত্রতার কাজ। যে এই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে, তাহাকেই নিয়মাচারী বলে। নীচাশয়তা ও উদারতা এক স্থানে দাঁড়াইতে পারে না। ক্ষণিক নীচাশয়তা ও ক্ষণিক উদারতা, এ ভাবও বিশুদ্ধতার পরিচয় দেয় না। অন্তর বিশুদ্ধ না হইলে, প্রকৃত উদারতার কার্য্য ঘটিয়া উঠে না। দ্বেষ, হিংসা, কলহ, অহঙ্কার, নিন্দা ও স্বার্থপরতা এ সকল নীচভাবকে, এককালে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজের সাধুতা দেখিয়া, যখন অপরের মন উচ্চ ভাবে গঠিত হয়, তখনই উহা প্রকৃত সাধুতার পরিচয় দিয়া থাকে। অত্মোন্নতির কার্য্য যত নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তত সমাজের নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করে না। সমাজ লৌকিকতায় পূর্ণ থাকিতে পারে, আত্মোন্নতি নিজের নিজের কার্য্য। আমাদের দেশে, ব্রাহ্মণগণ যখন এ ভাবের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সামাজিক কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন। একবার হিন্দুদিগের তপস্বী ও মহর্ষিদিগের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। যাঁহাদের উদারতা, সাধুতা ও বিশুদ্ধ-ভাব ভারতের অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে ইহার কি শোচনীয় দশা উপস্থিত! সেই ভারত যে, পুনর্ব্বার নিজ-দশা প্রাপ্ত হইবে, ইহা বড় কম দুরাশার কথা নহে।

কাল এ ভাবকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছে; তথাপি কাল-মাহাত্ম্য যদিও অনেকে বিশ্বাস না করেন, তাহাতে হানি নাই; কিন্তু পুর্ব্বাপর ও বর্ত্তমান কালে, যে সকল কার্য্য ঘটিয়া

আসিতেছে, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া, কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিতে পারা যায়? সত্য-কালের ঋষি-বাক্যগুলি, যখন ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রতি কার্য্যে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়া আসিতেছে, তখন সেই ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্যে অবহেলা করা, বড়ই অবৈধ কার্য্য। আমাদের মন নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে,—সকল বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না; তাই আমরা সুদূর-দর্শী দেবতাদের বুদ্ধির উপরও আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় খাটাইতে যাই। মূলে ভুল দাঁড়াইলে, পর পর সকল বিষয়ে, ভুল আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু কাল যখন নিজ নিজ কার্য্য-ফল, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখাইয়া দিতেছে, তখন উহাতে অবিশ্বাস করা, বিষম বিড়ম্বনার কাজ। মনুষ্যের বয়স, বল, বীর্য্য ও কার্য্য, এ সকল বিষয়ের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক বিবরণে এ সকলের সবিস্তর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মনুষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা যে সকল বিষয়ে, হীনতার দিকে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

সমাজ-ক্ষেত্রে বিচরণ কর, সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাইবে যে, বিশুদ্ধ-ধর্ম্মের অঙ্কুর কোন ক্ষেত্রেই স্থান পাইতেছে না। ক্ষেত্র ও বীজের ঐক্য না হইলে, কোন বৃক্ষের সুফল কামনা করা যায় না। এ স্থলে অনেকের মনে এ তর্ক আসিতে পারে যে, পূর্ব্বেও ঈশ্বর ছিলেন, এখনও তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর পূর্ব্বেও মনুষ্য ছিল, এবং এখনও তাহারা রহিয়াছে, তবে কেন আমরা চেষ্টা পাইলে, সেই জগৎ পিতাকে না পাইব? এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া, আমরা স্বীকার করি; কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে আমাদের অন্তর এমনই কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে যে, সেই বিশুদ্ধ ভাবের সত্তা উপলব্ধি করিতে গিয়া, অবশেষে আমরা বিপথগামী হইয়া পড়ি। সংসারের কুটিলতা, নীচাশয়তা, হীনতা ও স্বার্থপরতা আসিয়া, আমাদের মূল-কার্য্যে বিধিমতে বাধা দেয়। কালের কেমন গতি

আসিয়া উপস্থিত, ঐ সামাজিক দোষ, আমরা সময়ে সময়ে বেশ দেখিতে পাই, এবং মনে মনে বুঝিতে পারি ; তথাপি ঐ সকল পরিত্যাগ করা, কিম্বা সংশোধনে যত্নবান্ হওয়া, আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি না। আমাদের ঐ সকল হীনতা দেখিয়া, পাছে কেহ আমাদিগকে অধার্ম্মিক মনে করে ; এ জন্য সে সমস্ত অন্তরে পোষণ করিয়া রাখি,—প্রকাশ্যে এক ভাব দেখাই, আর অন্তরের কাজ গোপনে সম্পন্ন করি। বর্ত্তমান-সমাজে, এই প্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। যে সমাজের অন্তর বিশুদ্ধ নহে, সে কিরূপে জ্যোতির জ্যোতিঃ বিশুদ্ধ ভাবের আলোক অন্তরে ধারণা করিতে পারিবে ? ঈশ্বরকে লাভ করা অন্তরের কার্য্য। যদি সেই অন্তরই অবিশুদ্ধ রহিল, তবে তাঁহার প্রিয়-কার্য্য-সাধনে, আমরা কিরূপে উপযোগী হইব ? ইন্দ্রিয়-সংযম, দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করা, আপনাকে উদারভাবে পরিণত করা, ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান কার্য্য। যতক্ষণ না আমাদের ঐ হীনতার পূরণ হইবে, ততক্ষণ সমাজের কল্যাণ নাই। সমাজকে উন্নত করিতে গেলে, সমাজের সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ দৃষ্টি যতক্ষণ না সাধুভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে, ততক্ষণ অন্যের মন আকৃষ্ট হইতে পারে না। চৈতন্য, বুদ্ধ, প্রভৃতি মহাত্মগণ এ সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল।

বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম, সন্নীতির আকর ; আর বিদ্যালয় উহার প্রধান উপদেষ্টা। ধর্ম্মের সঙ্গে বিদ্যালয়ের এইরূপ নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের ঘোর বিসম্বাদ জন্মিয়াছে। এক্ষণে বিদ্যালয়ে রাশি রাশি পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে ; কিন্তু তন্মধ্যে এরূপ এক খানিও পুস্তক দেখা যায় না, যাহা পাঠ করিলে, বিদ্যার্থীর আত্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা পাওয়া, এক্ষণকার শিক্ষার প্রধান বিষয়। এই শিক্ষার সঙ্গে

মনুষ্যের আত্মোন্নতির বিষয় কিছুই দেখা যায় না,—কেবল বাহ্য-জ্ঞানের উপার্জ্জনে, অমূল্য জীবনকে কাটাইয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, উহাকে অর্থকরী-বিদ্যা বলে। এই অর্থকরী-বিদ্যার সাহায্যে কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়েন বটে, কিন্তু জীবনের সার-তত্ত্বে একবারে বঞ্চিত রহিয়া যান। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহারাই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পর্য্যাপ্ত মনে না করিয়া, অবসরে পৈতৃক ধর্ম্ম-শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন এবং তদনুসারে চলিতে শিক্ষা করিয়া, ভারত-মাতার মুখোজ্জ্বল করেন। ফলতঃ যত দিন না বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে,ততদিন এ দেশের কল্যাণকামনা করা যায় না।

ধর্ম্ম, জাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রকাশক। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার-ব্যবহার দেখিলেই জানিতে পারা যায়, কে, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী। আবার এই আচার-ব্যবহার, যেখানে সুপ্রকাশ না পায়, সেখানে কে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। আমরা দেখিতেছি যে, কোন ব্যক্তিকে কল্মা পড়াইয়া, মহম্মদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে, সে যেমন মুসলমান এই নামে অভিহিত হয়, এই রূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিকে খৃষ্টান বলে, আর আর্য্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিকে হিন্দু কহে। এই সকলে, আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, জাতি মনুষ্যের আদি কারণ নহে। মনুষ্যের জ্ঞান ও ইচ্ছার উপর জাতীয়তা নির্ভর করিতেছে। কোন ব্যক্তি এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, যত দিন ঐ ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে চলিতে থাকে, তত দিন, তাহাকে সেই ধর্ম্মাবলম্বী বলা যাইতে পারে। মনুষ্য, সমাজের অধীন থাকিয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নামে অভিহিত হয় বটে, কিন্তু সে যত দিন না সেই সম্প্রদায়ের মূল-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তত দিন কেহই

তাহাকে সেই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করে না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাধীনতা, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে রহিয়াছে। ধর্ম্ম-সাধন ভিন্ন, জীবের সদ্গতির উপায়ান্তর নাই। এই জন্যই মনুষ্য কোন না কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে নানা প্রকার ধর্ম্ম-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং যে, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, সে, সেই ধর্ম্মের নামানুসারে একটি পদবী লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ অবলম্বিত ধর্ম্মের নিয়মানুসারে না চলে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মের নাম মাত্রে, তাহার কোন গৌরব হয় না। আমরা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, আধুনিক ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ ধর্ম্ম-পালনে অনেকাংশে শিথিল হইয়াছেন; এজন্য তাঁহাদের গৌরবেরও লাঘব হইয়া পড়িয়াছে। এই হীনতা দেখিয়া কি স্বীকার করা উচিত যে, হিন্দু-ধর্ম্মে সাধুতা ও উদারতা গুণ নাই, এই জন্যই তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা আসিয়া উপস্থিত? ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির মূল-কারণ আলোচনা করিয়া দেখিলে, সবিশেষ বুঝিতে পারা যাইবে যে, হিন্দু-ধর্ম্মের কেন এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিল? জাতীয় স্বাধীনতার উপর সকল বিষয়ের উন্নতি নির্ভর করে। এই হিন্দু-জাতি, বহুকাল হইতে ঐ স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। দেশ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিরতিশয় যন্ত্রণার হাতে পড়িয়াও যে, অদ্যাপি ইহার মূল একবারে বিশুষ্ক হয় নাই, এইটিই হিন্দু-ধর্ম্মের বিশেষ গৌরবের বিষয়!

রুচি ও নিয়মাবলীর সংগঠনে, ধর্ম্মের মূলে ভুল-ভ্রান্তি ঘটিতে পারে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, এ বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে। কোন ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, যদি মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে না চলে, সে যেমন মুসলমান হইয়াও প্রকৃত

মুসলমান হয় না, তদ্রূপ কোন খৃষ্টান যদি যিশু খৃষ্টের নিয়মাবলী ধরিয়া না চলে, তাহাকে তেমনই প্রকৃত খৃষ্টান বলা যায় না। এই রূপ যিনি আর্য্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, হিন্দুদের নিয়মানুসারে না চলেন, তাঁহাকেও হিন্দু বলা যায় না। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা দেখা যায় না। আবার যে সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী প্রকৃষ্ট নহে, তথায় বহুবিধ কার্য্যে সদোষ ভাব প্রকাশ পায়; এ কারণ ধর্ম্মের মূল-বন্ধন, সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীর উপর অনেকটা নির্ভর করে। যে সম্প্রদায়ের নিয়মাবলীর শ্রেষ্ঠতা আছে এবং ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে অনুরক্ত লোকের সংখ্যা অধিক রহিয়াছে, তথায় সে ধর্ম্মের উন্নতি না হইয়া থাকিতে পারে না। আর যেখানে ইহার অন্যথা ঘটিবে, সেখানে ধর্ম্মের মূলে ভুল কেন না হইবে? ধর্ম্ম পালন করিব না, অর্থাৎ ধর্ম্মের নিয়মে চলিব না; অথচ ধার্ম্মিক বলিয়া, প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, এটি বিষম বিড়ম্বনা! যে সমাজে এরূপ ভাব আসিয়া দেখা দিয়াছে, তথায় ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য কেমন করিয়া প্রকাশ পাইবে?

এক্ষণে ভারতের স্থানে স্থানে ও দেশ বিদেশে যে ভাব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া ভরসা হয় যে, হিন্দু-ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সকলের অন্তরে প্রতিভাম্বিত হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মের বিমল স্রোতে যে কেবল ভারতবর্ষই পরিষিক্ত হইয়াছে, তাহাও নহে। এক্ষণে যাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমুন্নত,—যাঁহারা স্বাধীনতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, সেই জর্ম্মন, আমেরিক ও ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেকে, হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও উদারতা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। আর্য্য-ধর্ম্মের মহীয়ান ভাবের উপকারিতা প্রযুক্ত তাঁহাদের দেশের স্থানে স্থানে এক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং উহার কার্য্য

প্রচারের জন্য কয়েক খানি নূতন পত্রিকার সৃষ্টি হইয়াছে। আর বড়ই আনন্দের বিষয়! বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবগণ, যেরূপ উত্তেজিত ভাব ধারণ করিতেছেন, ইহার পরিণাম-ফল চিন্তা করিলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, দিন দিন বিশুদ্ধ ভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। সত্য-ধর্ম্ম লুক্কায়িত থাকিবার নহে,—কোন না কোন রূপে নিশ্চয়ই সুপ্রকাশিত হইয়া উঠিবে।

যে ধর্ম্মে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই তাহার ধর্ম্ম; তথাপি এই ধর্ম্ম লইয়া, জগতে কত মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু-ধর্ম্ম বহুতর সাম্প্রদায়িক বিভাগে বিভক্ত; একারণ অনেকের বিশ্বাস যে, উহাদের মূল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্ম। যাঁহারা উহার মূলে প্রবেশ করেন না, কেবল উপরিভাগ দর্শন করেন, তাঁহাদের পক্ষে, এ ধারণা বিচিত্র নহে। কোন বিষয়ের মূলে ভুল হইলে, তাহার অনেক বিষয়ে ভুল আসিয়া পড়ে। নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল, যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, সকাম ধর্ম্মের মূলও ঠিক সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং সাকার ও নিরাকারবাদীদের মূল যে একটি ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কোন বিষয়ের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ ঘটে। মূলে প্রবেশ করিতে, যেমন সকলের ক্ষমতা নাই; তদ্রূপ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করিয়া, বস্তু-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। ঘোর নাস্তিকেরাই ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন, আর তাঁহারাই বলেন যে, ঈশ্বরের সত্তার উপলব্ধি করা যায় না; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন না, ঈশ্বরের সত্তা অন্তরে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হিন্দু-ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মূলে, কেন অনৈক্য জন্মিবে? তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্প্রদায়বিশেষের কার্য্য-কলাপ ও নিয়মাবলীর বিভিন্নতা

থাকিতে পারে; কিন্তু ঐ নিয়মাবলী, সেই সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোক সকলের মনঃকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সকলের কোনটিতে, কোন দোষ সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া, ধর্ম্মের মূলে কখনই দোষ আসিতে পারে না। ধর্ম্মের মূলে যে সকল মহৎতত্ত্ব থাকে, সে সকল কোন কালেই লোপ পায় না। বিষয় বিশেষে আমরা অনেক সময়ে, কথায় একরূপ বলিয়া থাকি, কিন্তু যখন তাহার ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তখন অন্য ভাবেরও সঞ্চার অনুভব করিতে পারি।

হিন্দুর সকল তত্ত্বই, তাহাদের ধর্ম্মের সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, এমন কার্য্য নাই, যাহার প্রকৃষ্ট উপদেশ, হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে না পাওয়া যায়। আহারে, বিহারে, শয়নে, মরণে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে যত প্রকার কার্য্যে মনুষ্যকে লিপ্ত থাকিতে হয়, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের সুব্যবস্থা এমনই সুন্দররূপে প্রকাশিত রহিয়াছে যে, তদনুসারে চলিলে, মনুষ্য নিশ্চয়ই অপার সুখ-শান্তির অধিকারী হইতে পারে। তথাপি এই হিন্দুগণ কেন এত হীনতার দিকে আসিয়া পড়িয়াছেন, এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে, যাঁহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অযথা পথে ঘুরিয়া বেড়ান, কেবল তাঁহারাই সমাজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনেন। এই জন্যই হিন্দু-সমাজের এত দুর্দ্দশা আসিয়া পড়িয়াছে। যদি হিন্দু-নাম বজায় রাখিতে হয়,—হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর,—হিন্দুর নিয়মে চলিতে শিক্ষা কর; তবেই হিন্দুর যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে।

৩। ধর্ম্মবিষয়ে ভেদাভেদ।

ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছা, তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যে রত থাকা, মনুষ্যের একটি স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। যাহার যেমন ধারণা ও যাহার যেমন বিশ্বাস, এবং যাহার যেমন ক্ষমতা, সে সেই ভাবে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। পৃথিবীর আদি কাল হইতে মানুষ এই রূপে চলিয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতেও এই ভাব লইয়া চলিতে থাকিবে।

যদিও ব্রহ্ম-জ্ঞানের মূল অধিকার, প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু দেশ কাল ও পাত্রের অবস্থা অনুসারে, ঐ মূল-তত্ত্বের স্বরূপ, সর্ব্বত্র এক ভাবে প্রকাশিত হয় না।

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে উপাসকগণ দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সাকারবাদীকে স্থূল উপাসক এবং নিরাকারবাদীকে সূক্ষ্ম উপাসক বলা যায়। ক্রিয়ার আধিক্য থাকিলে, স্থূল জ্ঞানও সূক্ষ্মত্বে যাইয়া স্থান পায় এবং ক্রিয়া-দোষে সূক্ষ্মত্বেও স্থূলত্ব আনিয়া দেয়।

উদারতা ও স্বাধীনতার গুণে হিন্দু-ধর্ম্ম কল্পতরু রূপে সৃষ্ট হইয়াছে। যিনি, যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ ধারণা, যেরূপ বিশ্বাস ও যেরূপ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, ইহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই ভাবেই, ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেন,—কাহাকেও ইহার ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। হিন্দু-ধর্ম্মে এই উদারতা ও স্বাধীনতা গুণ থাকাতেই, স্থূলোপাসকগণ ক্রমে ধর্ম্মের মধ্যম ক্রমকে লাভ করিতেছে, এবং তাহারাই আবার সূক্ষ্মত্বে যাইয়া স্থান পাইতেছে।

যদিও হিন্দু-ধর্ম্মে স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব সম্বন্ধে অবান্তর ভেদ রহিয়াছে, তথাপি ইহার মূল-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলে, যেরূপ সুফল পাওয়া যায়, ঐ ভেদাভেদ লইয়া বিচার করায়, তত উপকার দর্শে না।

সাকারবাদীরা ঈশ্বরের প্রীতি-কামনা সিদ্ধির জন্য যেমন প্রয়াসী, নিরাকারবাদীরাও তেমনই ঈশ্বরের প্রীতিকর কার্য্য-সাধনের অভিলাষী,—এক দল, গন্তব্য পথ চিনিয়া লইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; আর এক দল, ঐ পথ পাইবার জন্য, অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ইহাদের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ।

যেখানে গন্তব্য পথ ঠিক না হইয়া উঠে, তথায় যাইতে গেলে, পথিককে অবশ্যই এ পথ, সে পথ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যাহার তথায় যাইবার ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, সে নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায়ে যাইয়া উপস্থিত হয় ; কিন্তু যিনি গন্তব্য স্থান চেনেন, তাঁহার তথায় যাইতে বেশি প্রয়াস পাইতে হয় না। এই সহজ উদাহরণের মত, যদি ঈশ্বরকে লাভ করিবার পথ হইত, তাহা হইলে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জগতে এত মতামত দেখিতে পাওয়া যাইত না।

উপাসকদের মধ্যে যাহারা যে ভাবে উন্নত হইয়াছেন, আর তদপেক্ষায় হীন-দশায় যাহারা পড়িয়া আছেন, তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃ-সদ্ভাব থাকা যেমন উচিত, ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, উভয়ে উভয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করা, তেমনই গর্হিত কার্য্য।

ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া, তাঁহাকে লাভ করা, মনুষ্য-জন্মের যেমন প্রধান কাজ,এ জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহার সহিত ইহার তুলনা দেওয়া যায়। এই ধনে বঞ্চিত জনকে যিনি সিদ্ধমনোরথ করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকেই নর-শ্রেষ্ঠ বলা

যায়। আর্য্য-জাতির সিদ্ধ-যোগী ও মহর্ষিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন।

যাঁহারা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহারাই লোক-স্থিতি-রক্ষার প্রধান হেতু। আবার ইহাঁদের মধ্যে, যাঁহারা বিশুদ্ধ-জ্ঞানে, বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তাঁহাদের আদিষ্ট বিধিগুলি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলা, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

পৃথিবীতে আর্য্য-জাতি যেমন বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, অন্য কোন স্থানে, এমন সুন্দর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না ; সুতরাং ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই আর্য্য-ধর্ম্মে যেরূপ উপকার লাভে সমর্থ হয়েন, এমন অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না।

হিন্দু-ধর্ম্মে এমন কোন অভাব নাই, যাহার জন্য কোন হিন্দুকে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয়।

বিশুদ্ধ-ধর্ম্মের এমনই নির্ম্মল-ভাব, যে হৃদয়ে একবার স্থান পায়, তাহা অমৃতের আধার হইয়া উঠে। ক্ষেত্র ও বীজের অনৈক্য বশতঃ কোন কোন স্থলে হিন্দু-ধর্ম্মে বিসদৃশ ভাব দেখা গেলেও, কখনই মূল-ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

হিন্দু-ধর্ম্মের মূল এমনই দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ,—ইহার ক্ষেত্র এমনই সুবিস্তীর্ণ এবং ইহার অধিকার-তত্ত্ব এমনই সর্ব্বজনের অধিগম্য যে, ইহাতে প্রবেশ করিতে, কেহই কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না। যাহার যে প্রকার অধিকার, যাহার যে প্রকার ধারণা, যাহার যে প্রকার ক্ষমতা এবং যাহার যে প্রকার বিশ্বাস, সে সেই সম্বল গ্রহণ করিয়া, ইহার কোন না কোন দিকে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। এই পৃথিবীর লোক, অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত, তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ-সৌষ্টব, বর্ণ, স্বর এবং মানসিক-বৃত্তি

সকল, পরস্পর কোন না কোন বিষয়ে যেমন অনৈক্য থাকিলেও, সকলকেই মনুষ্য বলিয়া ডাকা হয়, তেমনই এই হিন্দু-ধর্ম্মে মনুষ্যকে ধর্ম্ম-পথে আনিবার জন্য, এত সুব্যবস্থা রহিয়াছে যে, এই পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের মনোবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাব ধারণ করিলেও, তাহাদের প্রত্যেককে, এই হিন্দু-ধর্ম্মে আনিতে পারা যায়। এই মহৎতত্ত্ব ইহার অভ্যন্তরে আছে বলিয়াই, ভারতের হিন্দু-জাতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতের এমন স্থান দেখা যায় না, যেখানকার লোকেরা কোন প্রকার ধর্ম্ম-ভাব গ্রহণ না করিয়া, একবারে ধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া রহিয়াছে। নিবিড় জঙ্গলে সামান্য পর্ণ-কুটীর অবলম্বন করিয়া, যে সকল অসভ্য-জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম-ভাবের অভাব নাই।

দেশ কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্মও বিভিন্ন গতি লাভ করিয়া থাকে। যে দেশ, যখন সকল বিষয়ে উন্নতির উচ্চ সীমায় যাইয়া পড়ে, তথায় ধর্ম্মোন্নতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জর্ম্মনি তাহার প্রত্যক্ষ উদারণ-স্থল। যাঁহারা যিশু খৃষ্টের মতামত ধরিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিয়া আসিতে-ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আর বাইবেলের অনুবর্ত্তী হইয়া, সন্তুষ্টচিত্তে থাকিতে পারিতেছেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের মহীয়ান ভাব তাঁহাদিগকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে, এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে হিন্দু-জাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৎস্য, মাংস ও মদিরা ব্যবহার প্রথা যে ধর্ম্ম-পথের বিঘ্ন জনক, ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া, নিরামিষ আহার করিতে অভ্যাস করিতেছেন। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম ভাব প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম যে,

মনুষ্য-জীবনের প্রধান অবলম্বনীয়, এটি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, যেমন মনে আনন্দের সঞ্চার হয় ; তেমনই এই বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা দেখিয়া, নিরানন্দ উপস্থিত হয়। যে ভারতের ধর্ম্ম-ভাবে ম্লেচ্ছেরাও হিন্দু-ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন,এখন সেই ভারত,আবার পর-ধর্ম্ম-ভাব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন ; ইহাই অতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় !

হিন্দু-ধর্ম্মের এমনই মহীয়ান ভাব যে, কাহাকেও অন্য ধর্ম্মের সাহায্য লইয়া. ধর্ম্ম-রাজ্যে অগ্রসর হইতে হয় না। যাঁহারা ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া, পর-ধর্ম্মে ঋণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন অকারণ চশমা ব্যবহারের দোষে, নিজ দৃষ্টি-শক্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন ; তদ্রূপ যাঁহারা ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ পাইবার আশয়ে পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারে যাইয়া পড়েন। খদ্যোতের যদি শুভ্র-কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া, নিবিড়ান্ধকার বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, পূর্ণ-চন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভায়, জগৎ কেন এত অনুরক্ত হইবে ? যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের মূলে প্রবেশ করেন না, ইহার অভ্যন্তরে বিচরণ করেন না, এবং ইহার কার্য্য-বিধি অনুসারে চলিতে শিক্ষা করেন না, তাঁহারাই মোহান্ধে পড়িয়া, পর-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের চক্ষে হিন্দুর সকল বিষয়ই দোষযুক্ত দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যখন সমস্ত জগতের হিতকারী হইয়া, প্রত্যেকের অন্তরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াও তাহাকে ক্রমেই উন্নতির সোপানে লইয়া যায়, এবং শান্তি-সুখের অধিকারী করে, তখন যিনি হিন্দু হইয়া, নিজ-ধনে বঞ্চিত হয়েন, তিনি নিজে যে, নিজের অপকারসাধন করেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যখন যে দেশের ধর্ম্মভাব, কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আইসে, তখন উপধর্ম্মের পরাক্রম দেশকে আক্রমণ করিতে থাকে। এতদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, কোন মতেই থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম-সাধন তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ; এই জন্য যখন যে দেশের ধর্ম্মভাব শিথিল হয়, তখন সে দেশ, পর-ধর্ম্মগ্রহণেও পরাঙ্মুখ হয় না। কিছু কাল পূর্ব্বে যখন এই ভারতবর্ষ মুসলমানদের অধিকৃত হইয়াছিল, তখন তাহাদের প্রবল অত্যাচারে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, লোপাপত্তির দশায় উপস্থিত হয়। তৎপরে বর্ত্তমান ইংরাজগণ তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া, এই সাম্রাজ্য গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহাদের ধর্ম্মযাজক (পাদরি) মহোদয়দিগের কুহকে পড়িয়া,অনেকে স্বধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। অল্প দিনের মধ্যে কত যুবক, যুবতী যাইয়া, খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন,—সমস্ত দেশে যেন একটা সংক্রামক পীড়া আসিয়া দেখা দিল। হিন্দুর বিশুদ্ধ-ধর্ম্মভাব, ইহা দেখিয়া, আরও লুক্কায়িত হইয়া পড়িল। এখন দেশ কিসে রক্ষা পায়, এই সর্ব্ব-সংহারিণী ব্যাধির মহৌষধ কোথায় মিলে, এই চিন্তা সকলের মন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। দেশের এই শোচনীয় দশা দেখিয়া, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বেদ ও উপনিষদের অন্তর্গত ধর্ম্ম-ভাব লইয়া, যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, অধুনা তাহাকেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বলে। আর্য্য-ধর্ম্মের কি মহীয়ান ভাব! যে বিজাতীয় ধর্ম্ম আসিয়া, এ দেশকে একবারে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহার সে ক্ষমতা রহিল না। যদিও স্বীকার করা যায় যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ধর্ম্মভাবটি তাৎকালিক সমাজের আংশিক হিতসাধন করিয়াছিল, তথাপি উহা এক্ষণে যে ভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু-সমাজের সহিত উহার কোন রূপ সংস্রব দৃষ্ট হয় না। উহা

হিন্দুত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে হিন্দু-সমাজের সহানুভূতিও লাভ করিতে পারিতেছে না।

যে ব্রহ্ম-জ্ঞান সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছে, সেই পর-ব্রহ্মের উপাসনা ও তাঁহাকে পাইবার জন্য মনুষ্য যে কত ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার সংখ্যা হইয়া উঠে না। ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হওয়া ও তাঁহার স্বরূপ গ্রহণ করা, অন্তরের কাজ। যিনি অন্তরের অন্তর,—অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিচালনা বিনা কে এ পথে অগ্রসর হইতে পারে? অন্তরকে পরিষ্কৃত ও পরি-চালিত করিবার উপায় যোগ-সাধন। যোগ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, মন বিশুদ্ধ ও একাগ্র হইয়া উঠে। ঐ বিশুদ্ধতা ও একাগ্রতার বলে, মনুষ্য ব্রহ্মালোকদর্শনে সমর্থ হয়। যতক্ষণ না মনু-ষ্যের ঐ ক্ষমতা জন্মে, ততক্ষণ, সে কেবল বহির্বিষয়ের আলো-চনায় রত থাকে। বহির্বিষয়ের আলোচনায় রত থাকাতে, মনুষ্যের মোহাবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। আর যখন সে ঐ আলোচনার কার্য্যে বিরত হইয়া,অন্তরের কার্য্যে অগ্রসর হয়,তখনই তাহার সেই মোহ বিনষ্ট হইয়া যায়। যখন মোহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ পায়, তখন তাহার নিকট বাহ্য-বিষয়ের আন্দোলন তত শোভা পায় না,—সে নিয়তই পরমার্থ-সাধনের কার্য্যে রত থাকে। যাঁহারা ধর্ম্ম-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া, সংসারের বাহ্য-জ্ঞানের কার্য্য লইয়া, ঘূরিয়া বেড়ান এবং আপনাদের কতকগুলি মত-স্থাপন ও উহাদিগকে পোষণ করিবার জন্য আপনারা ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন, তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মে না এবং সাধন অঙ্গের প্রধান সহায় যে যোগ-বল,উহা প্রায় তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এ অবস্থায় কতকগুলি সুমধুর নাম ও ঈশ্বরের মহিমার বন্দনা পাঠ করা, তাঁহাদের ধর্ম্ম-চর্চ্চার সার কার্য্য হইয়া উঠে। ইহা যদি ধর্ম্ম-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরকে অন্তরে ধারণা

করিবার জন্য যে যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারত কোন সার্থকতা দেখা যাইত না ? কেবল অবৈধ আরাধনা, উপাসনা ও বক্তৃতার বলে, পরমার্থ-তত্ত্বে কেহই সম্যক্ অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্যই এইরূপ ব্যক্তিগণ সতত বহির্বিষয়ের আন্দোলনে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। অতএব ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে গেলে, অগ্রে অন্তরেন্দ্রিয়কে পরিষ্কৃত ও পরিচালিত করিবার যে উপায় রহিয়াছে, তাহার পথ ধরা সকলেরই প্রয়োজন হইতেছে।

ইহাতে বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য-জগতে ঘূরিয়া বেড়ান, ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃষ্ট পথ নহে। এই গুলি যদি ইহার প্রশস্ত পথ হইত, তাহা হইলে, আধুনিক-সমাজে, সামাজিক কার্য্য লইয়া, এতটা আন্দোলন চলিত না। যদি কেবল বাহ্য-আন্দোলনে ধর্ম্ম-কার্য্য-সিদ্ধির উপায় হইয়া উঠিত, তাহা হইলে, এত দিনে নব্য ভারত নিশ্চয়ই ধর্ম্মের চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিত। অনেকের বিশ্বাস যে, আন্দোলন বিনা, কার্য্য-সিদ্ধির উপায় হইয়া উঠে না। আমরা তাঁহাদের এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দেখা উচিত, কি ভাবে আন্দোলন করিলে, অভিলষিত কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে এবং ঐ অভিলষিত কার্য্য, যুক্তিসঙ্গত কি না ? যে বিষয়ের জন্য আন্দোলন করা আবশ্যক, প্রথমে সেই বিষয়টির নিগূঢ়-তত্ত্ব মনে স্থান পাওয়া চাই ; তৎপরে সাধারণের উপকারার্থে আন্দোলন আবশ্যক। যে আন্দোলনে মূল বিষয়ের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়, সে আন্দোলনের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করা, যদি মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে যে উপায়ে, তাঁহার দর্শন-জ্ঞান জন্মে,—প্রত্যেকে যাহাতে তাহার প্রকৃষ্ট পথ ধরিতে পারেন, প্রথমে তাহারই চেষ্টা পাইতে হইবে।

গন্তব্য-স্থানের ঠিকানা জানিয়া, গমন-কার্য্যে অগ্রসর হইলে, যেমন তথায় যাইবার পথ সুগম হইয়া পড়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল ব্যক্তির পক্ষে, তেমনই দুষ্কর হইয়া উঠে। সমাজের বন্ধন থাকিলে, মনের অনেকাংশে চাঞ্চল্য নিবারণ হয়; কিন্তু যাঁহারা সমাজের নেতা হইবেন, তাঁহাদের জ্ঞান-বল, তাঁহাদের কার্য্য-বল ও তাঁহাদের যোগ-বল এমনই প্রবল থাকা আবশ্যক, যাহাতে গন্তব্য স্থানের পথ, সহজে অপরকে দেখাইয়া দিতে পারেন। এক জন অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে লইয়া যাইতে পারে না; তেমনই যাঁহার অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই,তিনি কেমন করিয়া, অন্যের মানসান্ধকার বিনষ্ট করিতে পারিবেন? ঈশ্বর যদিও সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন, এ কথা সত্য; তথাপি অন্তরের মলিনত্ব যতক্ষণ না বিদূরিত হয়, ততক্ষণ সে হৃদয় পরমাত্মার দর্শন-জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। অন্তরের পবিত্রতা সাধন সদ্গুরুর উপদেশসাপেক্ষ; সুতরাং সদ্গুরুর কৃপাবল, এ পথের প্রধান সম্বল। যেখানে গুরু-শিষ্যের যথার্থ সম্মিলন হয়, সেই খানেই জ্ঞান প্রতিভান্বিত হইয়া উঠে। জ্ঞানের কাজ, জানাইয়া দেওয়া; যিনি যে বিষয় জানিতে চান, সেই বিষয়ের জ্ঞানে যিনি পারদর্শী, এরূপ লোক ভিন্ন অন্যের নিকট, তাহার যথার্থ-তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না। সংসারে জ্ঞান-শিক্ষার অন্ত নাই, এবং উপদেষ্টারও অভাব নাই; তন্মধ্যে পরমার্থ-তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানে, ইহার গুরু-শিষ্যের বিস্তর অভাব দেখা যায়। শিষ্য যদিও মিলে; কিন্তু সদ্গুরু মেলা বড়ই দুর্ঘট। ধর্ম্ম-গুরু এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাঁহার এক হুঙ্কার-ধ্বনি শ্রবণ করিলে, পাপীর পাপ-তাপ বিদূরিত হইয়া যায়,—ভাবুকের ভাবদল বিকশিত হয়, —প্রেমিকের প্রেম-ভাব সহস্র ধারে বর্ষণ করে,—ভক্ত জনের অন্তশ্চক্ষুর ক্রিয়া-বল, আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এরূপ

গুরুর বল বিনা এ পথে চলিতে কাহারও সামর্থ্য নাই। যাঁহারা কেবল বাহ্য আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া, অন্তরকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অন্তরের ক্ষুধা নিবারণের তৃপ্তিকর ভোজ্য পাইবার উপায় হইয়া উঠে না। ঈশ্বরকে লাভ করা অন্তরের কাজ। যে উপদেশ ও যে নিয়মের বলে, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া অন্তরের বল বৃদ্ধি পায়, সেই জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিনা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। যিনি এরূপ ভাবে ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হয়েন, তাঁহারই যত্ন চেষ্টা সফল হয়। অতএব আসল কাজে মন দিয়া, বাজে কাজ পরিত্যাগ কর,—ধর্ম্মের মূলে যে সকল সুমহৎ-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, অযথা পথে ভ্রমণ করিলে, কখনই আসল পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই জন্যই বলিতেছি, শাস্ত্রোক্ত বিধান ধরিয়া চল, সুদূরদর্শী ঋষিদিগের বাক্যে বিশ্বাস কর,—জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া, যে সার-তত্ত্ব, আর্য্য-ধর্ম্মে রহিয়াছে, তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। নব্য ভারত পূর্ব্বতন আচার-ব্যবহার ভঙ্গের যত দূর পরিচয় দিতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন, —মনুষ্য-জীবনের যথার্থ পথ ছাড়িয়া, অযথা পথে ভ্রমণ করিবেন, এবং ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রবল-স্রোতে পড়িয়া যারপরনাই কষ্টভোগ করিবেন।

প্রবল কুজ্ঝটিকা-জালে সমাচ্ছাদিত হইলে, যেমন অদূরবর্ত্তী পরিচিত স্থানও চক্ষের অগোচর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আধুনিক হিন্দু-সমাজ নানা প্রকার বাহ্য আড়ম্বর ও লৌকিকতার কার্য্যে জড়ীভূত হইয়া, আপনাদের গন্তব্য পথে যাইতে বঞ্চিত হইতেছেন। পাপের ফল মহাকষ্ট,—পুণ্যের ফল অতুলানন্দ। মনুষ্য যতই ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হয়, ততই তাহার অন্তর বিশুদ্ধ হইয়া, আনন্দ-রসে সন্তৃপ্ত হইতে থাকে; কিন্তু যেখানে তাহার

অন্য ভাব আসিয়া দেখা দেয়, সেখানে অন্তর কলুষিত হইয়া অশেষবিধ দুঃখ-যন্ত্রণার উৎপীড়ন সহ্য করে। অতএব অগ্রে গন্তব্য পথ স্থির না করিয়া, অযথা পথে ভ্রমণ করিলে, তাহার পরিণাম ফল যে, এই রূপ অশুভদায়ক হইবে, তাহার বিচিত্র কি? শূন্য মনে যেমন কোথায়ও যাওয়া যায় না এবং প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে যেমন চেষ্টা প্রধান বল, সেইরূপ ভ্রম প্রমাদ রহিত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হইয়া উঠে না। যাঁহারা সন্তোষের লালসায় ও বাহ্যানন্দের পিপাসায় পড়িয়া, যথেচ্ছাচারের পথ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই যে শূন্য-মনে ও নিরানন্দে কালযাপন করিতে হয়, তাহার কারণ এই, ধর্ম্মের সঙ্গে যে নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া, তাঁহাদের এই প্রকার দশা ঘটে।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এই শরীর তাঁহার শ্রেষ্ঠ নিকেতন। এই শরীরকে কি ভাবে আনিতে পারিলে, ইহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ভাবের জ্ঞান-সঞ্চার হইতে পারে, ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই, প্রথমে তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অভ্যাসের গুণে, আয়ত্তে না আসিলে, কখনই ইহাতে ব্রহ্মালোকদর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে না। বিনা প্রয়াসে, বিনা কষ্টে, যদি এ হেন কার্য্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে যোগ-বলের কোন আবশ্যকতা দেখা যাইত না; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, যোগ-শিক্ষা বিনা, পরমার্থ কার্য্যে কাহারও অধিকার জন্মে না। যোগ, যোগীর প্রধান সম্বল এবং ঐ যোগ, ব্রহ্মকে লাভ করিয়া দিবার প্রধান বল। যিনি যোগাসনে আসীন হইয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিচালনে সমর্থ হয়েন, তাঁহারই চেষ্টা ফলদায়ক হইয়া উঠে। যোগের ক্রিয়াফল অসাধারণ। অসাধারণ-ব্যাপারে

প্রবৃত্ত হইতে গেলে, অসাধারণ বল থাকা আবশ্যক। হস্তের দ্বারা নানা প্রকার কার্য্য করা যায়,—পা দিয়া যাতায়াত করা হয়,—চক্ষু দ্বারা দর্শন-জ্ঞান জন্মে এবং মুখ দিয়া, পান-ভোজন-কার্য্য সম্পন্ন হয়; কিন্তু যোগিগণের কার্য্য, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা হস্তের কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়া,—পা দিয়া কোথায় না যাইয়া,—বাহ্য-চক্ষু দিয়া, কিছুই না দেখিয়া এবং মুখ দ্বারা কোন পানীয় বা ভোজ্য গ্রহণ না করিয়া, এক স্থানে স্থিরভাবে থাকিয়া, উহাদের কার্য্য করিয়া লয়েন। যোগী যখন যোগাসনে বসেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি কত কার্য্য করিতেছেন,—কত স্থানে গমন করিতেছেন,—কত কি অভাবনীয় বিষয় দর্শন করিতেছেন, এবং ঐ সঙ্গে কত সুমিষ্ট রসের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। আহা! যোগের কি চমৎকার ক্ষমতা! উহার তুলনা দেওয়া, সহজ ব্যাপার নহে!

এই রত্নাকর পৃথিবীতে বহুবিধ মণি-মাণিক্য বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তথাপি কয় ব্যক্তি তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন? বিচক্ষণ জহুরী বিনা, যেমন রত্নাদির পরিচয় পাওয়া যায় না এবং রত্ন সকল সংগ্রহ করিতে, তাহারা যেমন সমর্থ হয়, তদ্রূপ সাধারণের অদৃষ্টে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ যদিও সকল মনুষ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি একরূপ রহিয়াছে; কিন্তু অঙ্গাদি নিগ্রহ-বিষয়ে কয় জন পারদর্শী হয়েন? নিয়মাচারী সদ্গুরু যোগীর উপদেশ ভিন্ন কিছুতেই অঙ্গাদি-নিগ্রহে সমর্থ হওয়া যায় না। মনুষ্যের মন আছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, ঐ মনকে স্থির করিতে চেষ্টা পাইলে, ক্ষণিকের জন্য তাহা আয়ত্তে আইসে, এ কথা যদিও সত্য; কিন্তু অঙ্গাদির চেষ্টা রহিত করিবার ক্ষমতা জন্মিলে, তাহা যেমন অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে, এমন অন্য কোন উপায়ে হইয়া উঠে না। আমাদের চক্ষু, বাহ্য-বস্তুর বর্ণ ও রূপাদি দর্শন করিয়া,

মনে যে নানা প্রকার চিন্তা আনিয়া দেয়, ইহাতে মনকে সুস্থির রাখিতে পারা যায় না। অবার কর্ণে উৎকট ও গম্ভীর শব্দের প্রতিঘাত আসিয়া মন চঞ্চল করে; কিন্তু অঙ্গাদির স্থৈর্য্য আয়ত্ত হইলে, আর কোন রূপাদি দর্শন, কি কোন শব্দাদির শ্রবণ-জ্ঞান, চক্ষু-কর্ণে আসিয়া স্থান পায় না,—শরীর অটল-ভাব ধারণ করে ও মন একাগ্রতার চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হয়। তখন মনে যে কত নব নব ভাব ও আনন্দের সঞ্চার হয়, যাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। এই যে যোগ, যাহা আর্য্য-ধর্ম্মের মূলে অবস্থান করিতেছে, যাহা বিনা কাহারও ইহাতে প্রবেশের অধিকার জন্মে না, এ কথা কেন মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার না করিব? যথাস্থানে ঐ যোগ-শাস্ত্রের কতিপয় বিষয় সাধ্যানুসারে প্রকটন করিতে চেষ্টা পাওয়া যাইবে। ঐ মূল যোগ যত দিন না আর্য্য-সন্তানগণ বুঝিয়া, ইহার পথ ধরিতে পারিবেন, ততদিন আর্য্য-ধর্ম্মের মহতী আশা ফলবতী হইবার নহে।

যখন যে দেশের হীনাবস্থা ঘটে, তখন তাহার অগ্রে, ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করে। লোক ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট না হইলে, কোন দেশের শোচনীয় দশা ঘটাইতে পারে না। এই হিন্দু-ধর্ম্মের বহুদিন-ব্যাপী হীনতাই, এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের প্রধান অন্তরায়। এ দেশ যে কত দিন, এই হীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে, যাহা স্মরণ হইলে হত-জ্ঞান হইতে হয়। এই হিন্দু-ধর্ম্মের যদি বিশুদ্ধ সারবত্তা গুণ না থাকিত, তাহা হইলে,কখনই ইহার স্থায়িত্ব এত দিন দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। বৌদ্ধ,মুসলমান ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়, ইহার বিপক্ষে যে কত দূর নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন; তথাপি ইহার মূল কিছুতেই বিশুষ্ক করিয়া দিতে পারে নাই। গুপ্তভাবে ইহার অন্তঃস্রোতঃ অবাধে চলিয়া আসিতেছে। এখন

সেই আর্য্য-ধর্ম্ম যদি তাঁহাদের সন্তানগণের হাতে পড়িয়া, লোপা-পত্তির দশায় গিয়া দাঁড়ায়, তবে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা স্বীকার করি, বহুদিন ধর্ম্ম-চর্চ্চা একবারে প্রচ্ছন্নভাবে চলিতে ছিল, অনেকে ইহার শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে ছিলেন না; সুতরাং ইহা লইয়া হিন্দু-সমাজে, নানা প্রকার অনৈক্য উপস্থিত হইতে পারে। পুনর্ব্বার যখন ইহার অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য-বিধিগুলি ধরিয়া, সকলে কার্য্য করিতে শিক্ষা করিবেন, তখন ইহার দ্বারা যে দেশের উন্নতি কামনা করা যাইতে পারে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়! সে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে, অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। যদি কিছু সূচনা হয়, তাহাও সর্ব্ববাদী সম্মত নহে; এই জন্যই সময়ে সময়ে এত দুঃখ ও ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ধর্ম্ম-ভাবে আকৃষ্ট জনের মনের কি বিচিত্র গতি! কেহ কেবল নিজের হিতের জন্য তৎপর,—কেহ নিজের ও সাধারণের উপকার-ব্রতে ব্রতী,—আর কেহ কেবল নিজের ও নিজ স্ত্রী, পুত্র-কন্যাগণের হিত-কামনা করেন। সংসারে সাধারণতঃ এই তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়। যাঁহারা কেবল নিজের উন্নতি-কল্পে যত্নবান তাঁহাদিগকে বিবেকী বলে,—যাঁহারা নিজের ও সাধারণের হিত-সাধনে রত, তাঁহাদিগকে সংসারী বলে,—আর যাঁহারা কেবল নিজের ও আপন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের শুভ-কামনা করেন, তাঁহারা না বিবেকী ও না সংসারী। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত উদাসীন, যোগী ঋষিগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ-শ্রেণীর গৃহিগণ। তৃতীয় শ্রেণীতে নিতান্ত স্বার্থপর লোক সকল। বিবেকীর ভাব যেমন উচ্চ উদারতার পরিচয় দেয়,—উচ্চদরের সংসারিগণের ভাবেও ইহার মধ্য-ক্রমকে বুঝাইয়া দেয়,—আর

না বিবেকী ও না সংসারী, ইহাঁদের ভাবে তেমনই এ দুয়ের বিপরীতভাব জানাইয়া দেয়। বৈরাগ্য ও সাংসারিকতার কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উদাসীন ও যোগী-ঋষিগণ সংসারের কোন ধার ধারেন না,—উচ্চ-শ্রেণীর গৃহিগণ আপনাদের কার্য্যে নিয়ত এ ধার পরিশোধ করিয়া আসিতেছেন,—তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সমাজে যাঁহাদের যতটুকু দোষ দৃষ্ট হইতেছে,এ স্থলে, তাহা প্রকাশ না করা উচিত বোধ করি না। আমরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহার যতই বিশুদ্ধ দেখিতে থাকিব, ততই পরিতোষ লাভ করিব। যেখানে ইহার অন্যথা-ভাব প্রকাশ পায়, সেখানে মর্ম্ম-বেদনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই স্বজাতির কার্য্যে সদোষভাব দেখিলেই, বলিতে ইচ্ছা হয়।

আধুনিক নব্য দল যে ভাবে সংসারী হইয়াছেন, তাঁহাদের এক দিকে যেমন নূতন সম্ভাব সংস্থাপিত হইতেছে; অন্য দিকে তেমনই নিকট-সম্বন্ধ ত্যাগ পাইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, নিজ নিজ পিতা-মাতা ও ভাই-ভগ্নী ইহারা পর হইয়া পড়িল! যদি সংসারাশ্রমে থাকিয়া, ধর্ম্ম-বীজ বপন করিতে হয়, তবে অগ্রে সংসারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করাই উচিত হইতেছে। আমরা অনেক ভ্রাতৃগণের বিষয় জ্ঞাত আছি, যাঁহারা সাংসারিক সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, ঐ নূতনবিধ সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। কেহ তাঁহার পিতা-মাতা, কেহবা আত্মীয় স্বজনের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের ঈদৃশ কার্য্য কখনই সংসারাশ্রমী লোকের আদরণীয় হইতে পারে না। হিন্দু-সমাজে এরূপ ভাবে থাকা, অনেকটা খৃষ্টানদের অনুরূপ। এ বিষয়ে তাঁহারাই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না যে পিতা-মাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছেন,—পরে জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেন,—এখন নিজে নিজে সকল

বিষয়ে সমর্থ হইয়া, যদি সেই পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ না করিলেন, তবে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে আর কতদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন? এইরূপ সাংসারিকের পক্ষে নিজ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ইহারা পর হয় না; কিন্তু তাঁহাদের পিতা-মাতা প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়গণ, কোন্ অপরাধে অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন, ইহারত কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না? হিন্দু-ধর্ম্মের এমন কোন ক্রিয়া-কলাপ দেখা যায় না, যাহার জন্য পুত্রকে পিতা-মাতার অসন্তোষের ভাগী হইতে হয়? নব্য ভারত আপনাদের আচার-ব্যবহারের দোষেই, তাঁহাদের পরমারাধ্য পিতা-মাতাকে হারাইয়া বসিতেছেন,—সহোদর সহোদরার সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন এবং আত্মীয় স্বজন পরস্পরে সাহায্যদানে বঞ্চিত হইতেছেন।

হিন্দু-ধর্ম্মের এমন কোন কুভাব নাই, যাহাতে কাহাকে সমাজ-চ্যুত অথবা আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিতে হয়। হিন্দুর আচার-ব্যবহার যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে, ম্লেচ্ছ জাতির আচার-ব্যবহার তেমনই বিসদৃশ ভাব আনিয়া দেয়। হিন্দু যতই ম্লেচ্ছ-জাতির সংস্রবে ঘনিষ্ঠতা জন্মাইবে, ততই তাহাদের আচার-ব্যবহারে ঐ দোষ আসিয়া স্পর্শ করিবে। বিশুদ্ধ-দুগ্ধ যেমন বিন্দুমাত্র গো-মূত্র সংযোগে অপকৃষ্টতা লাভ করিয়া,অভক্ষ্য হইয়া উঠে, হিন্দুর আচার-ব্যবহারও সেইরূপ ম্লেচ্ছ-সংসর্গে অনুন্নত ভাব আনিয়া দিয়া, সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটায়। আমরা বৈদেশিক আচার-ব্যবহার, যাহা বিশুদ্ধ বোধে গ্রহণ করিব,তাহার পরিণাম-ফল কখনই এ দেশের হিন্দু-ধর্ম্মের পোষকতা করিবে না। হিন্দুর পরিচ্ছদ, হিন্দুর ভোজ্য-ভক্ষ্য এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহার, যেমন হিন্দু-ধর্ম্মের পোষক,—বৈদেশিক পরিচ্ছদ, বৈদেশিক পান-ভোজন ও বৈদেশিক আচার-ব্যবহার, তেমনই হিন্দু-ধর্ম্মের

অনিষ্টদায়ক। যাঁহারা দেশ কাল পাত্রের বিচার না করিয়া, কেবল বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণপ্রিয়, তাঁহারাই হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই যে স্বজাতির বিকৃত ভাব, ইহাই স্বজাতির ধর্ম্ম-নাশের প্রধান কারণ। এক্ষণে নব্য হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে যে ভাবে স্বজাতীয় ভাবকে হারাইতে বসিয়াছেন, কিছু দিন এ ভাবে চলিলে, আর তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া প্রভেদ করা ভার হইয়া উঠিবে। জাতীয় ভাব যেমন মনুষ্যের স্বজাতীয় ধর্ম্ম জানাইয়া দেয়, ধর্ম্ম-ভাবও তেমনই তাহার স্বজাতীয় ভাবকে দেখাইয়া দেয়। এই জন্যই বলিতেছি, হিন্দু-সমাজে ক্রমে যত বিধর্ম্মী আসিয়া দেখা দিবে, ততই তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দু-জাতি হইতে পৃথক্ ভাবে দাঁড়াইবেন। অতএব হিন্দু হইয়া, হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া, অহিন্দুমতে চলা, কোন হিন্দুরই উচিত নহে। যদি স্বজাতির ধর্ম্মের গৌরব-বর্দ্ধনে ইচ্ছা থাকে, তবে হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও হিন্দুর ধর্ম্ম-পদ্ধতি শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হও, তবেই হিন্দু-ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৪। উপনয়নে উপবীত-গ্রহণ

ত্রিসন্ধ্যা যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। ঐ যোগ উপবীত-ধারণের পর হইতে, ব্রাহ্মণেতে আসিয়া স্থান পায়। উপনয়ন শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা ঊর্দ্ধে গমন। পূর্ব্বতন আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও সদ্গুণের সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপবীত দিয়া, ব্রাহ্মণ এই শ্রেষ্ঠ উপাধিটি প্রদান করা হইয়াছিল। এই উপনয়ন শব্দের অর্থে, যে উচ্চভাব প্রকাশ করে, উহার কার্য্য-প্রণালীগত ভাবেও উহা সমর্থন করিয়া দেয়। তথাপি এ বিষয়ে যে তর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, যে বয়সে ব্রাহ্মণগণ এই উপবীত-ধারণ করেন, তৎকালে তাঁহাদের ঐ সকল মহৎ গুণ জন্মে না, অথচ এই শ্রেষ্ঠ উপাধিটি কেন পাইয়া থাকেন ?

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই,—সমাজ-বন্ধনের একটি স্বাভাবিক নিয়ম যে, যেখানে কোন সাম্প্রদায়িক একতা সম্মিলিত হয়, সেখানে জাতীয়ভাবের বিকাশ হয়, কেহই এ নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। এ বিষয়ে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মণগণ যেমন নিজ সম্প্রদায়ের অধীন থাকিয়া, ব্রাহ্মণ এই উপাধিটি প্রাপ্ত হয়েন ; তদ্রূপ এই জাতীয় ভাবটি পাইবারও তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। কোন একটি সম্প্রদায়বিশেষের নাম উল্লেখ করিলে, যেমন ঐ সঙ্গে ঐ সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহার ও সেই জাতীয় ভাবটি মনে

আসিয়া উদয় হয়, তেমনই ব্রাহ্মণের উপবীত-ধারণ যে, তাঁহাদের জাতীয় ভাবের একটি প্রধান বিষয়, ইহাও বুঝা যায়। উপনয়ন ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সংস্কার। উহা হইতে বঞ্চিত থাকার ত কোন কারণ দেখা যায় না। উপনয়নে উপবীত-গ্রহণ করা, তাহার একটি প্রধান চিহ্ন। ঐ উপবীত-গ্রহণ বিনা ব্রাহ্মণের কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে না। এই উপবীত-ধারণের পর হইতে, ক্রমেই যখন তাহার উন্নত দশা উপস্থিত হয়, তখন ঐ শুভ-চিহ্নের আদর্শ স্বরূপ শুভ্র উপবীত যে, তাহার ভাবী মঙ্গলের একমাত্র কারণ, এ কথা অনায়াসে বোধগম্য হয়।

যে উপবীতের পর হইতে ব্রাহ্মণের পুত্রগণ সদনুষ্ঠানে রত হইবে, এবং ব্রাহ্মণ বলিলে যে সকল মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক, তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনায় যখন তাহাকে উপবীত প্রদান করা হয়, তখন ইহা কখনই অযৌক্তিক মতের পোষক হইতে পারে না। বাল্যাবস্থা মনুষ্যের জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রশস্ত কাল। ঐ বাল্যকাল হইতে, যাহাতে আপনাপন পুত্রগণ স্বজাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া আইসে, ন্যায়-বান্ পিতা-মাতার তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকা একটি প্রধান কাজ। যে পিতা-মাতা সন্তানগণের হিত-কামনার জন্য, তাহাদিগকে সৎপথ ধরিতে শিক্ষা দেন, এমন পিতা-মাতার উপদেশ ও সাহায্য পাওয়া নিরতিশয় প্রার্থনীয় বিষয়। সচরাচর দেখা যায়, যে কার্য্যে দোষ দর্শে ও যাহার পরিণাম-ফল শুভদায়ক নহে, এরূপ কার্য্যে সাধারণে প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়া থাকে; কিন্তু যাহার মূল, এত সুমহৎ ভাবে পরিপূর্ণ, তাহা কখনই নিন্দাবাদের উপযুক্ত বিষয় হইতে পারে না। এই ব্রাহ্মণের উপবীত-ধারণে যে, কেবল একটি

সাম্প্রদায়িক বাহ্য চিহ্ন প্রকাশ পায়, এমনও নহে। এই উপবীত থাকাতে, তাঁহাকে বিস্তর নীচ কাজে রত হইতে বাধা দিয়া থাকে। যে নীচাশয়তা মনুষ্যকে হীনতার চরম সীমায় আনিতে পারে, এবং আত্মোন্নতির পথের প্রধান শত্রু; তন্নিবারক যে যজ্ঞোপবীত, তাহা কখনই বাহ্য-শোভার জন্য নহে। কত যুগযুগান্ত কাটিয়া গেল, অদ্যাপি জন-সমাজে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র জাতির মধ্যে যদি কেহ কোন সামাজিক গর্হিত কার্য্য করে, সে তত নিন্দনীয় হয় না, যত এক জন ব্রাহ্মণ ঐ দোষে দোষী হইয়া, সমাজে নিন্দনীয় হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় ভাবের প্রধান নিদর্শন-স্বরূপ উপবীত থাকিলে যে, ধর্ম্ম-সাধনের কোন বাধা জন্মিতে পারে, ইহার এমন কোন কারণ দেখা যায় না। বরং উহা পরিত্যাগ করিলেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ হয়।

উচ্চ-উদারতা ও সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহার ধরিয়া চলার কাজ পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে উদারতার গুণে লঘু-গুরুর কোন ভেদাভেদ থাকে না, তাহাকেই উচ্চ-উদারতা বলে। তর্ক কি বক্তৃতার বলে, এ উদারতা কেহই লাভ করিতে পারে না। যিনি তন্ময়, অর্থাৎ যাঁহার সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তি হইয়া, কেবল ঈশ্বরে যাইয়া মন লীন হইয়াছে, তাঁহারই মনে এই উচ্চ-উদারতা দেখা দেয়। যখন যাঁহার এই উদারতা-গুণ জন্মে, তখন তিনি লৌকিকতার সকল বিষয়েই বিসর্জ্জন দিতে পারেন। এই জন্যই বলা হইল যে, উচ্চ-উদারতার কাজ স্বতন্ত্র। আর সংসারাশ্রমে থাকিতে গেলে, সকল সুনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। তাহা না ধরিয়া চলিলে, সমাজে অন্যের দুর্নীতি-সংশোধনে বিস্তর ব্যাঘাত আসিয়া পড়ে।

এই উপবীত সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব রামকৃষ্ণ পরম-

হংসের সহিত মৃত কেশবচন্দ্র সেনের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কোন কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে; এ স্থলে তাহার সারাংশ প্রকাশ করা যাইতেছে। উক্ত পরম-হংসের মতে, ব্রাহ্মণের উপবীত-ধারণ করাই উচিত,—স্বেচ্ছা কি বল পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগের কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণ উচ্চ-উদারতায় উপস্থিত হইলে, উহা আপনা হইতেই পরি-ত্যক্ত হইবে। যেমন নারিকেল বৃক্ষের পত্র, কেহ জোর করিয়া উন্মোচন করে না, উপযুক্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, উহা আপনা হইতেই গাছ হইতে খসিয়া পড়ে। সুদূরদর্শী পরমহংসের মতটি যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনই সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি যদিও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন না, এ কারণ তাঁহার কথা-বার্ত্তায় বেশি পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইত না; কিন্তু অতি সহজ কথায়, এমন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, যাহা শুনিয়া, অনেক মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ত্রিসন্ধ্যা যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। এই ত্রিসন্ধ্যার মূলে, যে সকল সদ্ভাব-ব্যঞ্জক সুব্যবস্থা আছে, যিনি উহার প্রত্যেক-গুলির নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহার অন্তরের বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে,—শুভ্রালোকের বিমল-জ্যোতিঃ আসিয়া, তাঁহার মুখ-মণ্ডলের শ্রীসম্পাদন করে, এবং ন্যাসাদি কার্য্য-বিধির গুণে শরীরে পূরক, কুম্ভক ও রেচ-কাদি যোগের অঙ্গ আসিয়া দেখা দেয়। যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নিগ্রহ না হইলে, যোগ-মার্গে প্রবেশ করা যায় না, এক ত্রিসন্ধ্যার গুণে ব্রাহ্মণে সেই অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উপবীতের পরে, ত্রিসন্ধ্যা ব্রাহ্মণেতে আসিয়া দেখা দেয়। যে উপবীত, মেরু-দণ্ডকে বেষ্টন করিয়া থাকে, ত্রিসন্ধ্যা-

কালে, ঐ বীজবদ্ধ উপবীত-সূত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক বলের সাহায্য পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক-বল একাগ্রতাকে আনিয়া দেয়। মনে একাগ্রতা জন্মিলে, তাহা দ্বারা যে, সুমহৎ কার্য্য-সাধনের উপায় হইবে, এটি অনায়াসে জানা যায়। বসিবার আসন, পরিধান বসন এবং উপবেশনের নিয়মে যোগ-কার্য্যে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়। পট্ট-বস্ত্র পরিধান এবং উত্তানভাবে কুশাসন বা রোমজ আসনে বসিবার গুণে, শারীরিক বৈদ্যুতিক-বল সংরক্ষিত হয়। যখন ধ্যান ধারণার আবেগে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ঐ সংরক্ষিত বৈদ্যুতিক-শক্তির গুণে, শরীরের কোন অপকার হইতে পারে না; অথচ মন তন্ময় হইতে শিক্ষা পায়। যে ত্রিসন্ধ্যা ও উহার কার্য্যবিধির অন্তরে, এই সকল সুমহৎ তত্ত্ব সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহার প্রধান সংস্কার যে উপনয়ন, এবং যজ্ঞোপবীত যাহার শুভ্র চিহ্ন, তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যে উৎকর্ষে, অপকর্ষ দেখা দিয়া, নীচাশয়তাকে আনিয়া দেয়, সে পথ ধরিয়া চলা, কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। বরং যাঁহারা ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই উপবীত বিশেষ কার্য্যকারক হইতে পারে।

যজ্ঞোপবীতের আর একটি নাম ত্রিদণ্ডী। এই ত্রিদণ্ডী শব্দে "কায়বাঙ্মনোদণ্ডযুক্তঃ" এই অর্থ প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক দণ্ড বিধান করে বলিয়া, উহাকে ত্রিদণ্ডী বলে। যে ব্যক্তি এই ত্রিদণ্ডী ধারণ করেন, তাঁহার এই ত্রিবিধ পাপের শান্তি হয়। একবার স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখুন, যজ্ঞোপবীতের মধ্যে এই যে সুমহান্ ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা ধরিয়া চলিলে, মনুষ্য কোন্ গুণে না বিভূষিত হইয়া পড়েন? সমাজে দণ্ড-বিধির (আইনের) প্রচলন থাকাতে, যেমন দুষ্কর্ম্মে

প্রশ্রয়পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে ; তদ্রূপ এই ত্রিবিধ পাপের দণ্ডদাতা স্বরূপ এই ত্রিদণ্ডী, ব্রাহ্মণের অঙ্গে সংলগ্ন থাকাতে, তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিরত হইবার শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছে। এই ত্রিদণ্ডী ধারণ-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে আর এক ভাবে, এই অনুশাসন করিতেছে,—যিনি উপরোক্ত ত্রিবিধ পাপ হইতে বিরত না হইবেন, তিনি একত্রবদ্ধ যষ্টিত্রয় দ্বারা দণ্ড পাইবার উপযুক্ত হয়েন। যে দণ্ডের ভয় থাকিলে, সৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয়,—মনুষ্যের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাহাকে সুনীতির প্রধান আদর্শ বলিয়া গণ্য করাই উচিত।

যে পথ ধরিয়া চলিলে, হিন্দু-ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন পথে ভ্রমণ করিলে কোন সার্থকতা দেখা যায় না। যথেচ্ছার কার্য্য যেমন ভিন্ন, ন্যায় ও যুক্তির পথ তেমনই বিভিন্ন। যিনি ন্যায় ও যুক্তির পথ ধরিয়া চলেন, তাঁহাকে কখনই বিপথগামী হইতে হয় না। এই জন্যই বলা হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের সার বস্তু উপনয়ন ও উপবীত। এই উপনয়ন ও উপবীত-গ্রহণ করা, যেমন ব্রাহ্মণের ভাবী উন্নতির প্রশস্ত পথ, উহার পরিত্যাগ, তেমনই অধো-গতির সোপান।

যিনি ধর্ম্ম-গিরির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করেন, তাঁহার অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবেই হইবে। এরূপ মহাত্মার নিকট যে, সকল বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে মন অধর্ম্মের অবিশুদ্ধতা-জালে জড়ীভূত, তাহার অন্তর কখন এ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। ধর্ম্মের বিশুদ্ধতায় সূক্ষ্ম-তত্ত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। আমাদের একজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত পরমহংসের অন্যবিধ বিষয় লইয়া, যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে এ বিষয় বিশদরূপে বুঝা

যাইবে। আর এতৎ পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার আছে, এ কারণ এ স্থলে, তাহার সারাংশ প্রকাশ করা গেল।

যাঁহার সহিত উক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথোপকথন হয়, এ স্থলে তাঁহার নাম প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যিনি এক জন বিদ্যা-বুদ্ধি-সমুন্নত খ্যাত-নামা পুরুষ,—যিনি নিরন্ন জনের প্রধান সহায়, এবং পরোপকার করা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকা, যাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। তাঁহার স্বভাবের এইটুকু মাত্র পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তিনি কোন সময়ে, পূর্ব্বোক্ত পরমহংসের নিকট প্রকাশ করেন, যে মনুষ্যের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ-মাৎসর্য্য, এই ষড়-রিপু বশীভূত হইয়াছে, এমন লোকেরও সন্নিকট দিয়া, যদি কোন রূপলাবণ্যবতী কুলটা চলিয়া যায়, তখন তাঁহার মন কেন একটু বিচলিত হয়? রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহার উত্তরে কহেন, উহা সে ব্যক্তির মনের কোন কার্য্য নহে! দুশ্চরিত্রা কুলটাদিগের যে একটি আকর্ষণ-বল জন্মে, তাহারই গুণে, সে তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া দেয়। আমরা তাঁহার এই সদ্‌যুক্তিপূর্ণ উপদেশে জ্ঞাত হইতেছি যে, মনুষ্য সংসর্গের দাস। যে লোক, যেরূপ সংসর্গে থাকে, তাহার স্বভাব ঠিক তদনুরূপ হইয়া উঠে। স্বভাব সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আসিয়া, তাহাকে আক্রমণ করে। এই জন্য যাহারা নিয়ত নীচ-সংসর্গে থাকে, তাহাদের স্বভাব যে নিতান্ত অধোগতিতে যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? তখন তাহাদের মনে এক প্রকার সংস্কার বা বল আসিয়া দেখা দেয়। ঐ শক্তির বলে, তাহারা সাধু লোকেরও পদস্খলন করিয়া দিতে পারে। যোগ-শাস্ত্রে, দৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাবে বারাঙ্গনাদের দৃষ্টি-শক্তির কার্য্যের উল্লেখ করিয়া, যে সিদ্ধান্তটি প্রকাশিত আছে, এটি ঠিক তাহারই অনুরূপ প্রশ্নোত্তর।

এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই,যাঁহারা বলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁহাদের এ কথা যদি যথার্থই সত্য হয়, তবে তিনি এই যোগ-শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তটির অনুরূপ সদুত্তর কি প্রকারে দিতে সমর্থ হইলেন? কেহ কেহ তাঁহার এই শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তটি শুনিয়া, তাঁহাকে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী মনে করিতে পারেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা তাঁহার যত দূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে ভিন্ন ভাবের উদ্বোধ হইতেছে। তিনি যে কেবল ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা বলে, ঐ প্রশ্নটির শাস্ত্রোক্ত বিধির অনুরূপ উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এইটি এ স্থলে বুঝাইয়া দিতেছে। ধর্ম্মের বিশুদ্ধতার বল, অন্তশ্চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়; সুতরাং তখন তাঁহার যাহা পড়া হয় নাই, তিনি যাহা অন্যের নিকট শ্রবণ করেন নাই; তাহারও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসিয়া, তাঁহার মনে স্থান পায়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল, তাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ সুপ্রকাশিত থাকে। এমন অনেক সাধু-যোগীর ক্ষমতার বিষয় দেখা শুনা গিয়াছে যে, তাঁহাদের নিকট কেহ উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার সমস্ত মানসিক প্রশ্নাদির বিষয় বলিয়া দিয়া থাকেন। ঈদৃশ যোগিগণের ক্ষমতা কোথা হইতে জন্মে? তাঁহাদের এ ক্ষমতা কেবল ধর্ম্মের বিশুদ্ধতাগুণে জন্মিয়া থাকে। ঐ বিশুদ্ধতাগুণ যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মিয়াছিল, এটি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। এস্থলে এতর্কও আসিতে পারে,—ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা গুণ, কিরূপে মনুষ্যে আসিয়া স্থান পায়? তদুত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যোগানুষ্ঠানের ক্রিয়া-বলে, মনুষ্যের মনোবৃত্তির এমন একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে, যদ্দ্বারা সে সদসৎ সকল বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে। উহাকেই ধর্ম্মের বিশুদ্ধতাগুণ বলা যায়।

লোকদর্শন করিতে সমর্থ হয়। এ কারণ বলা যাইতে পারে যে, উপনয়নে উপবীত-গ্রহণ করিয়া, তত ফল দর্শে না, যত তাহার কার্য্য-বিধির অনুসারে চলিলে, উপকার লাভ করা যায়।

দৃষ্টি-শক্তির যে অসাধারণ ক্ষমতা, ইহা অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। এ বিষয়ে পশ্চিম দেশবাসী অনেক যোগীর উক্তি যথা,—

"যোগীকো ভোগীকো রোগীকো জান্,
আঁক্‌মে নিশান্ ঔর্ আঁক্‌সে পছান্।"

(জান্—হৃদয় বা অন্তঃকরণ, নিশান্—চিহ্ন, পছান্—পরিচয় পাওয়া বা জ্ঞাত হওয়া।)

যোগী, ভোগী কি রোগী ইহাদের মনের ভাব, চোক মুখের ভাবভঙ্গী দেখিলেই জানিতে পারা যায়।

যাঁহারা অন্তরের ইচ্ছাকে চক্ষুতে আনিতে পারেন, তাঁহারাই লোক সকলকে আত্মমতে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। অন্তরে যে ভাব প্রবল থাকিবে, ক্রমে তাহা চক্ষুতে আসিয়া স্থান পায়; সুতরাং তখন কাহাকে সাধু অসাধু বলিয়া জানিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

এই সকলে বিশেষরূপে জানাইয়া দিতেছে যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস এক জন প্রকৃত যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অন্তর সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম-তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিত। ঐ ক্ষমতা তিনি কেবল যোগ-বলে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, যোগ-তত্ত্বের কোন বিষয় জ্ঞাত নহেন, এবং কার্য্য-বিধিকে উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের মত যে ভিন্নভাবে দেখা দিবে, তাহা বিচিত্র নহে। অস্থির-প্রকৃতি, অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি, ধর্ম্মের শেষ সীমায় যাইয়া দেখা দেয় নাই, তাহাদের মত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল হইবারই

কথা। যখন তাহাদের অন্তরের বল, জ্ঞান-গিরির উচ্চ-শিখরে যাইয়া উপস্থিত হইবে ; তখন ইহার সার-তত্ত্ব আপনা হইতেই জানিতে পারিবে। সংসারের গতিই এইরূপ, আজ আমরা যে বিষয় লইয়া, ঘোর আন্দোলন করি, হয় ত কল্য তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাহাতে কোন প্রতিবাদের কথা না থাকিতে পারে। এইরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহার বাহ্যে একরূপ ভাব প্রতিভাত হয় ; তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, আর আমরা উহাতে সে ভাব দেখিতে পাই না। এই জন্যই বলা যাইতেছে, যাহা লইয়া প্রতিবাদ করিতে হয়, অগ্রে তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া উচিত। তৎপরে ভাল মন্দের বিচার করিলে, শেষ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেখানে কোন সুব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। সমাজে যে বিষয়ের অভাব থাকে, তাহার যাহাতে পূরণ হয়, বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। এখন দেশের যে প্রকার অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভাল মন্দের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এখন যিনি কোনরূপ বিদ্যা-বুদ্ধিতে গণ্যমান্য, সকলে তাঁহারই মতের পোষকতা করিয়া থাকে। কার্য্যের পরিণামের, অর্থাৎ ভালমন্দের প্রতি তত লক্ষ্য রাখা হয় না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে এই একটি প্রধান দোষ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এজন্য হিন্দু-ধর্ম্ম এত সুব্যবস্থাপূর্ণ থাকিলেও, ইহার তত উন্নতিসাধন হইয়া উঠিতেছে না। সুদূরদর্শী মহর্ষিগণ হিন্দু-ধর্ম্মে যে সকল সুব্যবস্থার বীজবপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সকল বিষয়ের প্রকৃত-তত্ত্ব অবগত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের কোন কারণ থাকে না, অথচ ধর্ম্মোন্নতির পথে থাকিয়া, মনুষ্যকে বিপথগামী হইতে হয় না।

যদি সৎ-পথ ধরিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন করা উচিত হয়, তবে আর্য্য-ঋষিদিগের আদিষ্ট বিধির অনুসারে চলাই প্রত্যেক হিন্দুর উচিত ও কর্ত্তব্য হইতেছে। আজ আমরা যাহার সুফল দেখিতে না পাই, কল্য কি দুই দিন পরে, তাহার বিশুদ্ধ-ফলে নিশ্চয়ই অধিকারী হইতে পারি। সকল বিষয়েই ফলপ্রাপ্তির সম্ভবমত কাল প্রতীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই জন্যই বলা হইতেছে যে, ব্রাহ্মণে উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের কার্য্য-বিধির অনুসারে চলিতে থাকুন, তাহাতে সুফল দর্শিবেই দর্শিবে। যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলে, হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার দিকে না থাকিয়া, ভিন্ন পথে যাইয়া দাঁড়ান হয়; সুতরাং কার্য্য-বিধি লোপ পায়, এবং ইহার সুফল প্রত্যাশারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।—

অযত্নে পাইলে রত্ন, যদি ভাগ্য-বলে,
তবে কেন, তার মালা, না পরিবে গলে?
পবিত্র যজ্ঞের সূত্র, করিলে বর্জ্জন,
ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-বল, যায় অকারণ।
তাই বলি, বুঝে সুজে, নিজ পথ ধর,
বাড়িবে হিন্দুর যশ, ভারত-ভিতর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোক-তত্ত্ব।

১। পরলোক বা পরকাল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মৃত্যু আর কিছুই নহে, কেবল জীবের গৃহান্তরে প্রবেশ করা মাত্র। দেহ-বিনাশের সঙ্গে জীব কর্ম্মানুবর্ত্তী দেহ লাভ করে। পুরুষ গমন কালে এক পদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া, যেমন অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে; আর জলৌকা তৃণান্তর অবলম্বন করিয়া, যেমন পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে, সেই রূপ কর্ম্ম-পথে বর্ত্তমান জীবও মৃত্যুকালে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জীব ও তাহার আত্মার মরণশীল গুণ নাই; কিন্তু দেহের সে ভাব আছে। যখন রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না,—যখন নানাপ্রকার দুঃখ শোকে শরীর ও মন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই মৃত্যু আসিয়া শরীরে দেখা দেয়। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা দেখা না দিলে, মৃত্যু কাহাকেও নিজ-পথে আনিবার চেষ্টা পায় না। যে মৃত্যুর নাম স্মরণ করিলে, আমরা যারপরনাই ভীত হই; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রতীতি হইবে যে, মৃত্যু আমাদের পরম বন্ধু। যে বিপদের সময়ে সাহায্য করে, তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলা যায়। যেখানে মৃত্যু দেখা দেয়, সেখানে তাহার এ গুণের অন্যথা হয় না। যিনি মৃত্যু লক্ষণগুলি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই ইহার সদসৎ বিষয়ের অনুধাবনে সমর্থ হইবেন। জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের নিয়মাধীন। যে জন্মিয়াছে, তাহার এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। যদিও ঐ মৃত্যুর সঙ্গে শরীরের নাশ হয়,

তথাপি জীবের অস্তিত্বের বিনাশ হয় না। জড়-ধর্ম্মীর বিনাশ বা বিকৃত-ভাব ধারণ করা, তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। চেতন পদার্থ জীব ও আত্মা, ইহার অন্যথা ভাব ধারণ করে ; অর্থাৎ শরীর নষ্ট হইলেও ইহাদের ধ্বংস হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, মৃত্যু জীবের সকল অনর্থের মূল। মৃত্যু না থাকিলে, এ সংসার সকল সুখের আলয় হইত,—জরা-জীর্ণ কলেবর লইয়া, কাহাকেও এত কষ্ট ভোগ করিতে ও ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া হতাশ হইতে হইত না। ঈশ্বরের নিয়মে দোষারোপ করা, বা প্রকৃতির জীবন্ত ভাবকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া, তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা, এ দুইটিই সমান। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা-মাতা, তাঁহার জ্ঞান-বল-ক্রিয়া অসীম। যে মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, জীবে জীবন ও আত্মা আসিয়া সম্মিলিত হয়, সেই মঙ্গলময়ের সাধু ইচ্ছাতে আবার জীবের দেহ-পাত হয়। এই জন্যই বলা হয় যে, জীবের জন্ম-মৃত্যু তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। মৃত্যু যদি দেহীর ধর্ম্ম না হইত, তবে কত লোককে রোগ-শোকাদির নিদারুণ যন্ত্রণার জ্বালায় অস্থির হইতে হইত,—অসৎ কাজের স্রোত নিরুদ্ধ হইত না এবং কত অনৈক্যের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া, দেশকে প্লাবিত করিয়া দিত, যাহা মনে করিতে গেলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সংসারে এই মৃত্যু থাকাতে, লোকস্থিতি রক্ষার প্রধান উপায় হইয়া উঠিয়াছে। যদি মৃত্যু দেহীর ধর্ম্ম না হইত, তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণ আর কিছুতেই ভয় করিত না। এক দিকে, এই মৃত্যু সংসারের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া, যেমন দেহীর দেহ বিনষ্ট করিয়া দিতেছে, তেমনই জ্ঞান-ভাণ্ডারের সুপ্রশস্ত পথ দেখাইয়া, আত্মাকে পবিত্র ভাবে চলিতে শিক্ষা দিয়া যাইতেছে। জীব উন্নতির পর উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে

এবং অধোগতির পথ পরিত্যাগ করিবে; পুণ্যাত্মগণ মৃত্যুর নিকট এই জীবন্ত উপদেশ লাভ করিয়া, উহাকে জীবন-সখা জ্ঞান করেন।

যাহাদের কার্য্য, ভাবী সুখের কারণ, মৃত্যু তাহাদের নিকট পরম বন্ধু। আর যাহারা মহামোহে মুগ্ধ,এখানকার বৈষয়িক সুখকে জীবনের সার বিবেচনা করে, কেবল তাহারাই এই মৃত্যুকে বিষম শত্রু বোধ করিয়া থাকে। পুণ্যাত্মগণ মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়েন না,—মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে শুভযোগ। তাঁহারা এই দেহ-পিঞ্জর হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া, পরলোকে যাইয়া, অপার আনন্দ ভোগ করিবেন, ইহা তাঁহাদের যেমন প্রার্থনীয় বিষয়; বিষয়-ভোগ-লালসা, তেমনই অসুখের কারণ বলিয়া প্রতীতি হয়। এক দল লোক সংসারের বিষয়-সুখকে অনিত্য বোধে পরিত্যাগ করে,অন্যে তাহাতে অনুরক্ত থাকিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। যাহারা এ সংসারের গতিবিষয়ের পরিণামফল মনে অনুধাবন করিতে যত্ন করে না এবং নিজের কিসে চিরোন্নতি হইতে পারে, এ পথ ধরিতে চেষ্টা পায় না,তাহারাই আপনাদের জীবনকে অযথা পথে লইয়া, দারুণ কষ্টভোগ করে। বিষয়ের সুখ বিষয়ে; যখন বিষয়-বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেই বিষয়ের উপভোগ করিতে পারিলে, আংশিক সুখ বোধ হয়। যেখানে তাহার অভাব বা ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে নানা প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা আসিয়া দেখা দেয়। বিষয়ে আসক্ত জনের সুখ একরূপ, আর বিষয়ে অনাসক্ত জনের সুখ অন্য প্রকার। বিষয়ীর সুখ, বিষয় লইয়া; বিবেকীর সুখ, বিষয় পরিত্যাগ করিয়া। সংসারে এই দ্বিবিধ সুখের পথ থাকাতে, কেহ বৈষয়িক ও কেহ বিবেকী এই পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। বিষয়-ভোগে অনুরক্ত জনকে রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু আসিয়া, বিধিমতে কষ্ট দিতে

থাকে। আর বিবেকী ব্যক্তি, বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া, সমস্ত যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পান। যেখানে ভোগের আধিক্য, সেখানে রোগ-ভয় দেখা দেয়। বিষয়ীর ভোগ-বাসনা যেমন নানা প্রকার, রোগের প্রকোপও তেমনই অসংখ্য। কেহ কেবল অর্থোপার্জ্জন ও বিষয়-লাভের প্রত্যাশায় বিব্রত,—কেহ ইন্দ্রিয়-সেবায় আসক্ত,—কেহ অনিষ্টকর পান-ভোজনে অনুরক্ত,—কেহ চৌর্য্যাদি দুর্নীতির অনুবর্ত্তী, ইত্যাদি যে, যে পথের পথিক হয়, তাহাদের প্রত্যেককেই কোন না কোনরূপ মনোবিকারের কুহকে পড়িতে হয়। ঐ মনোবিকারকে বৈষয়িক সুখ বা দুঃখ বলা যায়। যাহারা সুখের লালসায় বিষয়-ভোগে লিপ্ত হয়, তাহাদের পরিণাম-ফল কেবলই দুঃখদায়ক। বিষয়ী লোক, যে সুখকে সুখ মনে করে, বিবেকী ব্যক্তি তাহাকে দুঃখময় বোধ করিয়া, পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হয়েন। অতএব এক বৈরাগ্য বিনা, এ সংসারে কোন বিষয়েই প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। ইহা ভিন্ন, যাহা সুখের নিদান বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহার পরিণাম-ফল, দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ও অসুখের প্রধান হেতুভূত। বিষয়ের সুখ ক্ষণিকের জন্য। যদি কোন রকমে ঐ সুখের ভঙ্গ হয়, তবে কত দুঃখ, কত শোক ও কত মনস্তাপ আসিয়া, মনকে ব্যথিত করে। আর যদি ঐ সুখে নিয়ত রত থাকিতে পায়, তাহাতে দেহ-ভঙ্গ ও রোগাদির প্রবল যন্ত্রণা আসিয়া, তাহাকে বিধিমতে বিব্রত করিয়া তুলে। অতএব এ সকলে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতেছে যে, যাহার পরিণাম-ফল সুখের কারণ নহে, তাহা কখনই প্রকৃত সুখ-শব্দে বাচ্য হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা উচিত, এ সংসারে এমন কি কার্য্য আছে, যাহার পরিণাম-ফল সুখজনক? ঈশ্বরে প্রীতি-ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই এ সংসারের সার কাজ। যিনি এই কাজে

রত থাকেন, তাঁহারই পরিণাম-ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অগ্রে সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তিতে বিসর্জ্জন না দিয়া, কেহই এ পথে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাতে যদিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু কিছু দিন এ ভাবে চলিতে পারিলে, ইহার পরিণাম-ফল যে সন্তোষজনক, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

একবার ইহার বিপরীত পথের দিকে মনকে লইয়া যাও, দেখিবে, ইহার প্রতি কার্য্যে অসন্তোষের চিহ্ন, ওতপ্রোতভাবে বদ্ধ রহিয়াছে। যাহার অর্থ-লালসা বলবতী, সে কেবল অর্থোপার্জ্জনের পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করে। অর্থাগমে তাহার মনে যেমন আনন্দ জন্মে, এমন অন্য বিষয়ে দেখা যায় না। এ স্থলে অর্থই তাহার সন্তোষের কারণ। যদি কোন কারণে, তাহার ঐ অর্থোপার্জ্জনে বাধা আসিয়া পড়ে, তবে তাহার নিরানন্দের আর অবধি থাকে না। আবার যদি ঘটনা ক্রমে, তাহার ঐ অর্থনাশ হয়, তখন নিদারুণ মনস্তাপ উপস্থিত হয়। আর যদি কোন দুর্দ্দৈব ঘটনায় তাহার উপার্জ্জনের কোন প্রতি-বন্ধক না ঘটে, ক্রমেই ঐ অর্থ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাতেও তাহার ঐ অবস্থায়, ঐ অর্থ লইয়া, মনের বিশেষ সন্তোষও জন্মে না। সে ঐ অর্থ পাইয়া, চৌর্য্যাদির ভয়ে সদাই ভীত থাকে, পাছে কেহ ঐ অর্থ অপহরণ করে। যদি চৌর্য্যাদির ভয়ের আশঙ্কা না থাকে, তথাপি সে সর্ব্বদাই মনে করে, কিরূপে ঐ অর্থ বৃদ্ধি পায়,—কিরূপ নিয়মে উহা ব্যবহার করিলে, কোন ক্ষতি না হয়। এক অর্থ লইয়া, কেবল এইরূপ চিন্তা বলবতী হইয়া, সদাই অস্থির রাখে। তবেই দেখ, যে অতিশয় অর্থপ্রিয়, তাহার অর্থলাভ হইলেও অসুখ, এবং উহা না পাইলেও অসুখ;

অথবা ক্ষতি হইলেও অসুখ,—তাহার অসুখ কিছুতেই ঘুচে না,—কোন না কোন প্রকারে একরূপ মনোবেদনা, তাহাকে নিশ্চয়ই পাইতে হয়। এইরূপ, যে, যে বিষয় উপভোগ করে, অথবা উহা পাইতে বাধা পায়, তাহার সকল অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, জানিতে পারা যায় যে, অনিত্য কোন বিষয়েই চির-শান্তি মিলে না।

প্রবৃত্তির অনুকূল-পথে প্রবেশ করিলে, প্রথম প্রথম যে কিছু সুখ মনে করা যায়, ক্রমে উহাতে আর ততটুকু সুখানুভব হয় না; পরিশেষে বিস্তর অসুখের কারণ আসিয়া দেখা দেয়। বিষয়ের সুখ বিষয়ে, এবং ঐ বিষয়ই অসুখ আনিয়া দেয়। যাহার সুখ পাইতে গিয়া, জীবিতাবস্থায় এত গোলযোগে পড়িতে হয়, আবার যখন তাহার মৃত্যুর বিষয় স্মরণ হয়, তখন আরও নানা প্রকার ভাবনা-চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া, মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। তখন মনে হয়, আমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, যে অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, আমার অবর্ত্তমানে, আমার পুত্র-কন্যাগণ, ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে, কত কষ্টভোগ করিবে,—হয় ত এই ধন কোন শত্রুপক্ষের হস্তে পড়িবে। ইত্যাকার কত যে মনো-বিকার উপস্থিত হয়, যাহার সংখ্যা করা যায় না। এই মনো-বিকারে সে ধনেশ্বর হইয়াও মনঃকষ্ট ভিন্ন আর কিছুই ভোগ করে না। ইহাতে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেছে যে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি প্রকৃত সুখ উপভোগ করিতে পারে না।

যিনি প্রকৃত সুখার্থী, তাঁহাকে ধর্ম্ম-ব্রতে ব্রতী হইতে হয়। আত্মোন্নতি বিনা প্রকৃত সুখ কোথায়ও মিলে না। বিষয়ী ও ধনশালী ব্যক্তি, বিষয় ও ধন পাইয়া, যে ভাবে চলে, তিনি সে ভাবে চলেন না। লোভ, ক্ষোভ, দ্বেষ, হিংসা এবং বিষয়-বাসনা তাঁহার চক্ষুর শূল হইয়া উঠে। সকলে সমান-দৃষ্টি, সকলে

সমান-প্রীতি এবং সকলেরই সঙ্গে সমান সখ্যভাব, এগুলি তাঁহার স্বভাবের পরিচায়ক। তাঁহার অন্তরের যে চির-সন্তোষ, তাহা কোন সময়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। যাহাতে প্রত্যেক জীব চিরসন্তোষের অধিকারী হয়, তিনি নিয়তই এই শুভকামনা করিয়া থাকেন। তিনি নিজ-সুখকে, তত আবশ্যক বোধ করেন না, যত অন্যের কষ্ট দেখিলে, দুঃখ বোধ করেন। "সন্তোষম্ পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।" তিনি এই মহাবাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া, সর্ব্বদাই চলিতে শিক্ষা পান। যিনি সন্তোষসুখামৃত পান করিতে অভিলাষী হয়েন, তাঁহার পক্ষে এই মহাবাক্য যেমন তৃপ্তিদায়ক, এমন আর কিছুই দেখা যায় না। যিনি আপনার সুখ অপরকে বিভাগ করিয়া দিয়া উপভোগ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার সুখকেই প্রকৃত সুখ বলা যায়। স্বার্থপর ব্যক্তি কখনই এ সুখের অধিকারী হইতে পারে না, এবং অপরকেও সুখী হইতে দেয় না। যে নিয়তই আপনার দিকে, সকল সুখকে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা পায়, তাহার পদে পদে ঐ সুখে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি সুখার্থী হইয়া বারম্বার বাধা পান, তখন তাঁহার আর ঐ সুখের আস্বাদ কি প্রকারে পাওয়া হয়? এইরূপ পার্থিব সুখ-লালসা যে অশেষ দুঃখের কারণ এটি বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতেছে।

অদূরদর্শী পাপাত্মারা যে, নিজ নিজ কার্য্যদোষে আপনাদের জীবনকে কলুষিত করে, ধর্ম্মের সুমধুর রসাস্বাদ উপভোগ করিতে না পাওয়াই, ইহার প্রধান কারণ। তাহাদের মধ্যে, যে এই রস পান করিতে পায়, সে বুঝিতে পারে যে, বিষয়ের হলাহল পানে, কেবলই দুঃখ-দুর্গতি আনিয়া দেয়,—চিরশান্তি ও প্রকৃত সুখ, তাহাতে ঘটিয়া উঠে না। এমন অবস্থায় সে আর আপনার অধোগতির দিকে যাইতে চায় না। কিসে সুখ, কিসে দুঃখ, এটি

তখন সে বেশ বুঝিতে পারে। মনুষ্যের উন্নতি ও অবনতির যে পৃথক্ পৃথক্ পথ আছে, তাহাকে ইহার বিষয় আর বুঝাইয়া দিতে হয় না। এখন সে আপনার সদ্গতির উপায় দেখিয়া লইতে সমর্থ হয়। যিনি সুখের অবস্থায়, দুঃখের যন্ত্রণা এবং দুঃখের অবস্থায় সুখের আস্বাদ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই সুখ-দুঃখের বিষয়, যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কোন্ সুখে কিরূপ উন্নতি বা অবনতি, এবং কোন্ দুঃখে প্রকৃত সুখী হওয়া যায়, মনুষ্য যতদিন না, উন্নতি ও অবনতি, এই দুইটির ইতর বিশেষ, পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারে, ততদিন তাহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। যে অবনতির দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া, পরিশেষে আপনাকে ধর্ম্ম-পথে ফিরাইয়া লয়, তাহারই জ্ঞান বলবৎ হয়,—সে আর উন্নতির পথ ছাড়িয়া যায় না,—ক্রমেই উহার শ্রেষ্ঠতার দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা পাইয়া থাকে।

অবনতির পথের গতি ঠিক ইহার বিপরীত। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি অধোগতির পথ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা করিলে, তাহার আর দুঃখ-দুর্গতির অবধি থাকে না। সে মোহান্ধে মুগ্ধ হইয়া, যতই ইহাতে প্রবেশ করে, ক্রমে এমনই পাপ-পঙ্কে যাইয়া পড়ে যে, তখন তাহার আর উত্থানের ক্ষমতা থাকে না। এই উন্নতি ও অধোগতি লইয়া, মত-ভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু যে কার্য্যে আত্ম-গ্লানি ও যাহার পরিণাম-ফল অসন্তোষ-জনক, তাহাকে অধোগতির পথ বলে। এই পথে চলিলে, জীব চিরকাল অশান্তি ভোগ করে। আর যাহাতে আত্ম-প্রসাদ জন্মে ও যাহার ভাবীফল তৃপ্তিদায়ক, তাহা উন্নতির পথ। এই পথে বিচরণ করিলে, আত্মোন্নতি হইতে থাকে। যে এ পথে বিচরণ করে, সে চির-শান্তির সুমধুর ফলের রসাস্বাদনের অধিকারী হয়। এ

অবস্থায় যাহার দেহ-পতন হয়, সে মৃত্যুকে, অমৃত-ধামে লইয়া যাইবার প্রধান সহায় বোধ করে। তাহার মৃত্যুতে, যেমন সন্তোষ ও আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পায়, বিষয়াসক্ত জনের মৃত্যু তেমনই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। আহা! বিষয়-ভোগের কি ভয়ানক কুহক! মনুষ্য, জন্ম-গ্রহণ করিয়া, এ সংসারে কিছু দিনের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; পরিশেষে সকলকেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বৈষয়িক লোকের ভ্রম দূর হয় না। সে তথাপি মনে করে, আমি জীবিত থাকিয়া, বিষয় উপভোগ করিব। বিষয়-বাসনায় আকৃষ্ট জনের যে অপার দুর্গতি আনিয়া দেয়, বিষয়-ভোগে অবিরত রত থাকা ভিন্ন, ইহার অন্য কারণ দেখা যায় না। যে, বিষয় ভোগের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, সে কখনই চির-সুখের অধিকারী হইতে পারে না। এ অবস্থায় যখন তাহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়, তখন তাহার কি ভয়ানক বিপদ,—কি ভয়ানক যন্ত্রণা ঘটে! সে একে রোগের উৎকট উপসর্গে আক্রান্ত, আবার তাহার মনে নানা প্রকার হতাশার আবির্ভাব হয়। এই ভাবে, সে যতক্ষণ জীবিত থাকে, তাহার প্রাণ-বায়ু একবার বিষয়ের আলোচনা করিয়া, যেমন কষ্ট পায়, পরক্ষণে পরকালের বিষয়, তাহার স্মরণ পথে আসিয়া, তেমনই বিধিমতে কষ্ট দিতে থাকে। সে তখন এই ভাবে অনুতাপ করে, হায়! আমি কি নরাধম! আমি আমার সমস্ত জীবন-কাল, কেবল বিষয়ের উপভোগে কাটাইয়া দিলাম, এখন দেখিতেছি যে, মৃত্যু আমার প্রাণ-বায়ুকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। হায়! কি কষ্ট! আমার শরীর ক্রমেই নিস্তেজভাব ধারণ করিতেছে, এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হইলে দেখিতেছি, আমার বিষয়-বিভব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ, ইহাদের মধ্যে কেহই আমার সহিত যাইয়া,

আমার কোন সাহায্য করিবে না। আমি যাহাদের জন্য এত কষ্ট, এত যত্ন পাইয়া, বিষয়-বিভব লাভ করিলাম,—কত যত্ন ও কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, সে সকল রক্ষণাবেক্ষণ করিলাম; এখন এ সকল বিষয়েও আমাকে বঞ্চিত হইতে হইল! হায়! আমি ঘোর মোহান্ধে পড়িয়াছিলাম! এখন আমার সঙ্গে এমন কোন সম্বল রহিল না, যাহা লইয়া পরলোকে যাইবার পথে চলিতে পারি। এখন আমার কষ্টের কি ভয়ানক দশা উপস্থিত! আহা! এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না। আমি যতদিন জীবিত ছিলাম, কেবল ছার বিষয় লইয়াই কাটাইয়াছি। এখন দেখিতেছি যে, এই বিষয়ই আমার সকল অনর্থের মূল। আমার এত বিষয়-বিভব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ বিষয় নাই, যাহা লাভ না হওয়াতে আমার এত কষ্ট হইতেছে, আমি যদি আমার জীবনের কিয়দংশ ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া ঈশ্বরের করুণা উপার্জ্জন করিতাম, তাহা যে এখন আমার সন্তপ্ত হৃদয়ের মহৌষধ হইত। হায়! কি কষ্ট! আমাকে যে এরূপ কষ্টে পড়িতে হইবে, তাহা ত এক দিনের জন্যও ভাবি নাই। এখন ভাবিয়া, কোন উপায় দেখি না,—শরীর-মন একবারে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন হে দয়াময়! তোমার দয়া বিনা এ পাপী-তাপী জনের উদ্ধার কৈ? আমি আমার সদ্গতির উপায় কিছুই করিয়া যাইতে পারিলাম না। ইত্যাকার পরিতাপ ও পশ্চাত্তাপে অনুতপ্ত হওয়া, বিষয়ের সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানজনিত তৃপ্তিসুখের অধিকারী হইয়া, মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করেন, তাঁহার মৃত্যু-কাল কি সুখের সময়! তাঁহার মুখারবিন্দের কমনীয় ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, নিতান্ত পাপী-তাপী জনেরও দুঃখ-শোক বিদূরিত হইয়া যায়। তাঁহার বিস্ফারিত নয়ন-দ্বয়ের জ্যোতিঃ এমনই সুন্দরভাব ধারণ করে, যেন তিনি

এই অনিত্য সংসারের সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, অমৃত-ধামে যাইবার জন্য, সোৎসুক-চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—যেন স্বর্গের মনোহর ছবি সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, আরও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন,—হস্তদ্বয় হৃদয়াকাশে বিন্যস্ত করিয়া এ ভাব প্রকাশ করেন, যেন তিনি আপন হৃদয়েশ্বরকে নিকটে পাইয়া, প্রেম-ভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। তখন তাঁহার অধঃ অঙ্গের সমুদয় তেজঃ উত্তমাঙ্গের দিকে যাইতে থাকে,—ধূম্রাকারে উহা ব্রহ্ম-রন্ধ্র হইতে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে যাইয়া উপস্থিত হয়। ঐ তেজকেই জীবের জীবত্ব বলে। একটি লোহার গোলাকে দগ্ধ করিলে, যেমন অগ্নির তেজঃ ঐ গোলার প্রত্যেক পরমাণুতে যাইয়া প্রবেশ করে, তেমনই জীব, শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া, সমস্ত শরীরে বিকাশ পায়। মনুষ্যের মৃত্যুর সঙ্গে জীব যখন নিজ তেজঃ আকর্ষণ করিয়া, ঊর্দ্ধে গমন করে; তখন শরীরের আর উষ্ণতা গুণ থাকে না। যে তেজঃ বলে দেহ চৈতন্য বিশিষ্ট ছিল, এখন উহা আর সে ভাবে দেখা যায় না।

জীব প্রতি জন্মেই মৃত্যুর দশা লাভ করিয়া থাকে। যদিও সকলের মৃত্যু একরূপ নহে, তথাপি মৃত্যু যে একটি যন্ত্রণাদায়ক বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জীব শরীরকে ত্যাগ করিয়া, প্রথমে যে লোকে যায়, তাহাকে সাধারণতঃ পরলোক বলে। সকল জীব যে একটি নির্দ্দিষ্ট লোকে যাইয়া সম্মিলিত হইবে, এমন কোন কারণ নাই। যাহার যেরূপ ক্ষমতার বল, তদনুসারে সে সেই লোকে যাইয়া স্থান পায়। এই পৃথিবীর নানা স্থান, যেমন বহুবিধ দেশ, নগর ও গ্রামাদি সংজ্ঞায়, এক স্থানটি অপর স্থান হইতে বিভিন্ন; তদ্রূপ পরলোকে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য লোক আছে। স্বদেশ যেমন সকলেরই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, যিনি কিছু দিন দেশান্তরে থাকিয়া,

পরে স্বদেশে যাইবার জন্য সমুৎসুক হয়েন, তথায় যাইয়া সুখী বা দুঃখী হউন, উহা তাঁহার পক্ষে যেমন বাঞ্ছনীয় বিষয়; তদ্রূপ প্রত্যেক জীব, মৃত্যুর পর, আপনাদের উপযুক্ত লোকে যাইয়া, ইহ-জন্মের কর্ম্ম-ফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগের অধিকারী হয়।

মনুষ্য প্রতি জন্মেই, নূতন নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর সে ভূলোকের কর্ম্ম করিয়া, ভুবর্লোকে যাইয়া উপস্থিত হয়। আমরা এখানে থাকিয়া যেমন সাংসারিক নানা প্রকার কার্য্য ও বিষয়-ভোগের কাজে রত থাকি, তাহাদের মধ্যে, সেই রূপ বা অন্যবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় না, এমনও নহে। এ সংসারে থাকিবার কালে, যাহার যে প্রকার প্রকৃতি ছিল,—যে যেমন কার্য্য করিয়াছিল, তাহার ফলভাগী হইয়া, সে সেইরূপ কার্য্যে রত হয়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানে, আমরা এ বিষয়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, যোগ পরিশিষ্টে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা পাইব। আর এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, পর-প্রস্তাবে বলা যাইবে; এ কারণ বিষয়-সংক্ষেপের দিকে চেষ্টা পাওয়া গেল।

২। মৃত্যুর পর উন্নতি কি অবনতি ?

মনুষ্য যতদিন এ সংসারে থাকে, ততদিন যখন তাহাদের অনেকে এখানকার কর্ত্তব্য-কার্য্য অবধারণ করিতে অসমর্থ, বা ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তখন মৃত্যুর পর, তাহাদের কি প্রকার দশা ঘটিবে, ইহার বিষয় স্থির করিয়া লওয়া বড়ই দুষ্কর বিষয়। মনুষ্য ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও বিবেকের বলে যত দূর জানিতে পারে, উহাই তাহার পারলৌকিক জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায়। সাধারণতঃ যদি প্রতি মনুষ্য ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিত, তাহা হইলে এ সংসারে পাপতাপ, দুঃখ-দুর্গতির এত আধিক্য হইতে পারিত না। বিশেষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার বলে ঐ জ্ঞান মনুষ্যে আসিয়া দেখা দেয়। মনুষ্যের জ্ঞান-বলেরও সীমা নাই এবং তাহাদের কার্য্যকলাপেরও শেষ নাই। জ্ঞান-ভাণ্ডারের ক্রিয়া যেমন স্বল্পায়াসসাধ্য নহে, সামান্য জ্ঞানের কার্য্য তেমনই সহজ ও সুবোধ্য। পাপাচারী যদি জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমৃত-বারি পান করিতে সমর্থ হইত, তবে সে কেন এই দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়া, পাপ-তাপের অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিবে? সাধারণ-জ্ঞান কাহাকেই বড় শিক্ষা পাইতে হয় না। ঈশ্বরের সৃষ্টির এমনই কৌশল যে, তাহা অনায়াসে সকল জীবে আসিয়া দেখা দেয়। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, যাহা জীবের অতি দুর্লভ বিষয়, তাহার বিষয় জানিতে গেলে, বিশেষ চেষ্টা, বিশেষ অধ্যবসায় এবং মনের আগ্রহাতিশয় সহকারে সে পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বিনা চেষ্টা, বিনা অভ্যাস ও বিনা শিক্ষায় এ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। যাঁহারা এ পথের পথিক হইতে চান, তাঁহারা সাংসারিক সমুদয় বিষয়ে

জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল ঐ সার তত্ত্বে মনোযোগী হয়েন। এই জন্যই তাঁহারা সংসার-তত্ত্ব অপেক্ষা, পরমার্থ-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। তুমি যে মানুষ, একজন যোগীও সেই রূপ; তথাপি তাঁহার পরমার্থ-বিষয়ের জ্ঞানের সম্যক্ উন্মেষ কেন দেখা যায়? যে, যে কাজে থাকিয়া, কেবল তাহারই উন্নতি-সাধনের চেষ্টা পাইতে থাকে, তাহার ঐ কাজে কেনই বা উন্নতি না হইবে? আমাদের মন বিষয়-জালে সদাই জড়ীভূত, ক্রমে এমনই সংকীর্ণ ও অনুদারভাব আসিয়া দাঁড়ায়, যাহাতে আমরা ঐ মহৎ তত্ত্বের আলোচনায় বা তৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে অসমর্থ হইয়া পড়ি। পান-ভোজনের চেষ্টা, আসঙ্গলিপ্সা, অপত্য-স্নেহ ইত্যাদি সহজ-জ্ঞান, যেমন সকল প্রাণীতে দেখা যায়, মনুষ্যের মনে এ সকল নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি ভিন্ন আরও কত সুমহৎ ভাবের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহা অঙ্কুরোৎপাদিত ও বৃক্ষ রূপে বৃদ্ধিগত না হইলে, তাহার সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। আমরা এমন উচ্চ অধিকারী হইয়াও, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া না লই, সে দোষ আমাদের নিজের। ইতর প্রাণীগণ অপেক্ষা মনুষ্যের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা যে বেশির ভাগ ইহার মূল কারণ কেবল এই। আমরা যদি ঐ প্রকার অধিকারী হইয়া, ঐ বিবেক বুদ্ধির বলে, আপনাদের শ্রেষ্ঠকার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া না লই, তবে আমরা যাহাদিগকে নিকৃষ্ট-প্রাণী মনে করি, তাহাদের সহিত আমাদের কি ইতর বিশেষ থাকে?

জীবের যে মৃত্যু, উহা তাহার পুনর্জন্ম বা সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ মাত্র। আমরা কোন আত্মীয় জনের মৃত্যু দেখিয়া, যেমন দুঃখ-শোকে অভিভূত হই, বারংবার তাহার নাম উল্লেখ ও কার্য্য-কলাপ স্মরণ করিয়া, মনে যারপরনাই অশান্তি লাভ করি, তেমনই তখন মুক্তাত্মার অবস্থিতি ক্ষেত্রে আনন্দের ধূম পড়িয়া যায়। মুক্তাত্মার

আপনাপন আত্মীয়গণ (যাহারা স্থূল-দেহ গ্রহণ করে নাই) পীড়িত ব্যক্তির মুক্তির অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয় । তাহাকে দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত দেখিলে, তাহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না । উৎকট-পীড়া, যাহাতে মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ বিকার বলিয়া থাকে, তাহাতে পীড়িত ব্যক্তি, মৃত আত্মীয় স্বজনের নাম উল্লেখ করিয়া ডাকে,—কেহ হাস্য করে এবং কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া থাকে । মস্তিষ্কের এরূপ অবস্থা ঘটিবার কারণ কি ? চিকিৎসকগণ মনে করেন, জ্বরের অত্যধিক উষ্ণতা বশতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্মিয়া, ঐ প্রকার বিকৃতভাব আসিয়া দেখা দিয়াছে ; কিন্তু আমরা ইহাতে অন্য ভাবের সঞ্চার দেখিতে পাই । মনের সুস্থিরতা,অর্থাৎ মানসিক চেষ্টাশূন্যতা, অথবা এক বিষয়ের ভাবনায়, মনের এক প্রকার ক্রিয়া জন্মে, যাহাতে সে সম্মুখাগত মুক্তাত্মাদের অবয়ব-দর্শন ও তাহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতে পায় । এই জন্যই সে মৃত পরিচিত লোককে দেখিয়া, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকে, এবং তাহাদের মধ্যে এমন মুক্তাত্মা আসিতে পারে, যাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া, অথবা কথার ভাব ভঙ্গী শুনিয়া, না হাসিয়া থাকিতে পারে না । আর যদি তাহাদের কাহার উগ্র-মূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা দেখিয়া ভয় পায় এবং সেই জন্যই কান্দিয়া উঠে । এ বিষয়ে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, মনুষ্যের মৃত্যু হইলে কেবল তাহার বাহ্য-দেহ নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু তাহার অস্তিত্বের ধ্বংস হয় না । জীব আপন দেহগত সাদৃশ্য লইয়া, যে সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ করে, উহা আমাদের বাহ্য-চক্ষুর গোচর নহে । আমরা যদি কোন উপায়ে আপনাদের মনকে সূক্ষ্মত্বে আনিতে পারি, তখন নিকটবর্ত্তী মুক্তাত্মাকে দেখিতে পাই এবং

তাহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেও সমর্থ হই। বিকারে মানসিক ভাব এক প্রকার সূক্ষ্মত্বে দাঁড়ায়, এই জন্যই বিকারী রোগী তৎসমীপবর্ত্তী মুক্তাত্মাকে দেখিতে ও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয়। মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের মুখ হইতে, মধ্যে মধ্যে যে অত্যদ্ভুত বিষয়াদির কথা-বার্ত্তা কহিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, মনের একাগ্রতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যাদেশ ইত্যাদি বিষয়ও ইহার অন্তর্গত।

প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র এস্থলে প্রকাশ করা গেল। উৎকট পীড়ার অবস্থা অথবা যখন কোন দুর্বিষহ আপদ বিপদে পড়িয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তখন মনুষ্য অনন্যোপায় দেখিয়া ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় মনুষ্যের মনোবৃত্তির একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পায়। ঈশ্বর সর্ব্বান্ত-র্যামী ও সকলের পরমারাধ্য,এ কারণ কেহ তাঁহার উদ্দেশে কোন নিভৃত স্থানে থাকিয়া, অথবা কেহ কোন দেবদেবীর সন্নিধানে যাইয়া, অনশন অবস্থায় একান্ত ভক্তিভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে ; ইহাকে হত্যা দেওয়া বলে। এ সময়ে যাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির স্রোতঃ প্রবল হইয়া উঠে, তখন সে বিচে-তন হইয়া পড়ে। এই বিচেতন অবস্থায় কেহ তাহার পীড়ার প্রকৃত ঔষধ জানিতে পারে,—কেহ বা নিজ হস্তেই ঔষধ পায়,—কেহ আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত হইবার সদুপায় লাভ করে,— আর কেহ বা জ্ঞাত হয় যে, তাহার এ দুঃখমোচন হইবার নহে। তৎকালে তাহারা আপনাদের মানসিক শক্তির বলে ইহাও জানিতে পারে যে, তাহাদের সম্মুখে কোন মুক্তাত্মা আসিয়া ঔষধ দেয় বা অপর বিষয় জ্ঞাপন করিয়া যায়। আমরা এ বিষয়েও জানিতে

পারিতেছি যে, মনুষ্যের মৃত্যুর পর যদি তাহার অস্তিত্ব একবারে ধ্বংস হইত, তাহা হইলে কোন মুক্তাত্মার দর্শন পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

মনুষ্য যাবৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া, বাহ্য-জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাবৎ সে কেবল বাহ্য-জ্ঞান উপার্জ্জন করে। যখন সে তাহার অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তর্জগতের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞানের অসীম পরিচয় দিয়া থাকে। সে এ অবস্থায় ইহলোকে থাকিয়া, পারলৌকিক অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। এই শিক্ষার প্রধান উপায় যোগ-সাধন। যোগের ক্রিয়াবল, যতই এই শরীরে আয়ত্ত হইয়া আইসে, ততই জীবের জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে যখন অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া আইসে, তখন তাহার বড়ই সুখের অবস্থা হয়। সাধারণ মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই যে সুখের জন্য লালায়িত, তাহাদের সে সুখ বাহ্য-বিষয়ের উপভোগে ধাবিত ; কিন্তু ঐ প্রকার লোকের সুখ পরমার্থ-বিষয়ক। তাহার সুখের ইচ্ছা, অন্তর্জগতের সহিত মিলিত হইয়া, এমন সৌরভ বিস্তার করে, যাহার তুলনা বহির্জগতের কোন বিষয়ের সহিত হয় না। এ অবস্থায় পারলৌকিক বিষয় ঘটিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে যতদূর জ্ঞান-লাভ করা যায়, রাশি রাশি পুস্তক পাঠ ও সুদীর্ঘ বহুতর বক্তৃতা শ্রবণ করিলেও, তাহার একাংশ উপলব্ধ হইয়া উঠে না। আমরা কোন বিষয়ের আদি ও অন্তের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে গিয়া, অবশেষে যে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি, ইহার কারণ এই যে, আমাদের জ্ঞান কেবল বাহ্য-বিষয় লইয়া ; সুতরাং অন্তরেন্দ্রিয়ের বিশেষ ক্ষমতার উপর যাহা নির্ভর করিতেছে, উহার বিহিত উত্তর দানে, আমরা অসমর্থ হইয়া পড়ি। অন্তর্জগৎ-ঘটিত বিষয়গুলি বুঝাইতে গেলে, যোগ-শাস্ত্রের অনেক বিষয়

আসিয়া পড়ে; এ কারণ এখানে প্রস্তাবিত বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই উচিত হইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় যোগ-তত্ত্ব-প্রকরণে দেওয়া হইল।

এ স্থলে এইটি বলা আবশ্যক হইতেছে যে, জীবের দেহ বিনাশের পরেও তাহার কর্ম্মের শেষ হয় না। জীব কর্ম্ম-ভূমি এই পৃথিবী অথবা অন্য কোন লোকে যাইয়া, নূতন নূতন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, এবং তথায় পূর্ব্বজন্মের কার্য্য-ফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই রূপে সে যত লোক পরিভ্রমণ করে, তথায় নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় ও তৎপূর্ব্ব-জন্মের কার্য্য-ফল ভোগ করে। যখন তাহার কার্য্যের শেষ হয়, তখনই তাহার আত্মা পরব্রহ্মে যাইয়া লয়প্রাপ্ত হয়; এইটি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। আর মনুষ্য উন্নতির পর যেমন উন্নতির দশা প্রাপ্ত হয়, তাহার অধোগতির দশায়, তেমনই হীনতর অবস্থা ঘটে। যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, তাহার ভাবী উন্নতির দশা লাভ করা যেমন নিশ্চিত; যে অধোগতির দিকে নিয়ত বিচরণ করে, তাহার অধোগতি সেই রূপ নিশ্চিত রহিয়াছে। এই যে অধোগতি, ইহার বিষয় একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। সকল জীবের কার্য্য এক রূপ নহে। তন্মধ্যে ভাল আর মন্দের ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা ভাল, তাহা পুণ্য-জনক। আর যাহা মন্দ, তাহা অধর্ম্ম বা অনিষ্টের কারণ। এই ভাল মন্দ লইয়া, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর অবসানে ভিন্নভাব ধারণ করে। এই ভিন্নভাব কি? সে মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মনুষ্য-দেহ ধারণ করে? কি অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের অন্তর্ভুক্ত হয়, অথবা কোন দেবভাবে পরিণত হয়? ইহাই আলোচ্য বিষয়।

এ সংসারের জীবশ্রেণীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সামান্য কীট-পতঙ্গ অপেক্ষা, পক্ষিগণের অঙ্গ যেমন বৃহৎ

ও বল-বীর্য্যে তেমনই ক্ষমতাবান। আবার পক্ষিগণ অপেক্ষা চতুষ্পদগণ, যেমন আকারে বৃহৎ তেমনই বল-বিক্রমের কার্য্যে সমধিক সমুন্নত; কিন্তু মনুষ্যের আকার, যদিও কতকগুলি চতুষ্পদ, দ্বিপদ ও সরীসৃপের তুলনায় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, তথাপি ইহাদের বুদ্ধি-বল, আকারগত বল অপেক্ষা অনেকাংশে বিশেষ কার্য্যসাধক। যদি জীবের আকার অনুসারে বুদ্ধির ন্যূনাধিক্য হইত, তাহা হইলে, মনুষ্য কখনই সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, মহিষ, গণ্ডার, গাভী ও বৃহৎ বৃহৎ অজাগর সর্প প্রভৃতি অপেক্ষা, বুদ্ধি-শক্তিতে শ্রেষ্ঠতার দিকে ধাবিত হইতে পারিত না। ইহাতেই বুঝাইয়া দিতেছে, যে শরীরে, যত বুদ্ধির বল অধিক, সেই, জীব-শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ পাইয়া থাকে। বুদ্ধি-বল, ও উহার কার্য্য লইয়াই জীবের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচয় দিয়া থাকে। সামান্য বুদ্ধি, অর্থাৎ সহজ-জ্ঞান, সকল জীবেই বিদ্যমান আছে; কিন্তু মনুষ্যের মনে ঐ সহজ-জ্ঞান ভিন্ন, বিবেক-বুদ্ধি থাকাতেই তাহার এতদূর গৌরবের বিষয় হইয়াছে। ঐ বিবেক-বুদ্ধির বল যে কত দূর বৃদ্ধি পাইতে পারে, যাহা বুঝিয়া উঠা ভার। মনুষ্য-জীবনের প্রথম সময় হইতে, শেষ পর্য্যন্ত যদি কেহ একাদি ক্রমে ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তথাপি উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। যত জ্ঞান-ভাণ্ডারের পথ উদ্‌ঘাটিত হয়, তত তাহার জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জ্ঞানের যেমন অন্ত নাই, বুদ্ধি-বলেরও তেমনই শেষ নাই। মনুষ্য বিবেকের বলে, যে কত দূর উচ্চ-দশায় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে, সহজ-জ্ঞানের ক্ষমতায় সে ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সহজ-জ্ঞান অপেক্ষা, বিবেক-বুদ্ধির কার্য্য যখন মনুষ্য-জীবনের প্রধান বিষয়, তখন যাহারা সহজ-জ্ঞানের কার্য্যে পারদর্শী না হইয়াই, মনুষ্য-দেহ ত্যাগ করিল, তখন

তাহাদের এখানকার অনেক কার্য্য করিতে যে অবশিষ্ট রহিল, এটি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই অসম্পূর্ণ অবস্থার কার্য্য, তাহারা কোথায় থাকিয়া শিক্ষা করিবে ? এইটি আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে।

হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে,অসম্পূর্ণ-বৃত্তি বা কামনার পরিসমাপ্তি না হইলে, তাহাকে পুনর্ব্বার এ জগতে আসিয়া, জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান সমাজে এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বিস্তর তর্কের প্রকোপ দেখা যায়। তন্মধ্যে যাঁহারা নব্য ভারতের এক রূপ নেতা, তাঁহাদের মত এই,—সংসারে উন্নতির স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া, স্বভাবের কার্য্য নহে। মনুষ্য যে যেমন অবস্থায় মৃত হয়, সে তাহার উন্নতির দশায় আসিয়া স্থান পায় ; তাহাকে আর অধোগতির দিকে যাইতে হয় না। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্র, এ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের এ সিদ্ধান্তটি কোন লৌকিক মতের উপর নির্ভর করে না,—বরং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের যথার্থ মতের প্রতিপোষক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, জীব পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল-ভোগ করিবার জন্য ও নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় করিয়া, তৎপরজন্মে, তাহার ফল-ভোগ করিবে ; এই উদ্দেশে সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, জীবের জন্মের সঙ্গে, তাহার পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল-ভোগ করা, যেমন প্রধান বিষয় ; তদ্রূপ নূতন জন্মে, নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় করাও, তেমনই তাহার একটি প্রধান কাজ। যে মনুষ্য, ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাল-কবলে প্রবেশ করিল, তাহার পক্ষে, ফল-ভোগের বিষয় কথঞ্চিৎ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয়ের কোন চিহ্নই দেখা দেয় না। এ অবস্থায় উন্নতির পর উন্নতি, এ বিধি না আসিয়া, অধোগতি, এইটিই দেখাইয়া দিতেছে।

উন্নতি ও অবনতি এ দুইটির কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে কার্য্যে উন্নতি হয়, সে কার্য্যে অবনতি হইতে পারে না, এবং যাহাতে অবনতির দশা ঘটে, তাহাতে উন্নতি আসিতে পারে না। উন্নত জীব উন্নতির ক্রম অবলম্বন করিয়া, ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। আর যে, অধোগতির পথে প্রবেশ করে,—নানাপ্রকার দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে কেমন করিয়া, উন্নতির ক্রম লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তাহাকে নিজ কার্য্য-দোষে ক্রমেই অধোগতির নিম্ন-তলে আসিয়া পড়িতে হয়। এই স্বাভাবিক ভাব গ্রহণ করা, যেমন ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত, তদ্বিপরীত ভাব, তেমনই অযুক্তিযুক্ত ও অনৈক্য-দূষিত। ইহাতেই বুঝা যায়, জীবের কার্য্য-ফল যখন তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের প্রধান কারণ, তখন এ নিয়মের অন্যথা কিছুতেই হইতে পারে না।

জীবের অকাল-মৃত্যু, তাহার পূর্ব্ব-জন্মের গুরুতর দুষ্কৃতির পরিচয় দিয়া দেয়। আর গর্ভ-যন্ত্রণা ও মৃত্যু-কষ্ট, তাহার আংশিক ফল-ভোগ মাত্র; কিন্তু নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় করিবার জন্য, নিশ্চয়ই তাহাকে পুনর্ব্বার, এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে। যখন মনুষ্য-জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না, তখন তাহার অকাল-মৃত্যুতে যে, এখানকার কোন কাজই করা হইল না, এইটি বুঝাইয়া দিতেছে। এই জন্যই হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সুব্যক্ত হইয়াছে, অসম্পূর্ণ বৃত্তি বা কামনার পরিসমাপ্তি না হইলে, জীব উন্নতির পথে না যাইয়া, পুনর্ব্বার অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই অধোগতি যে পুনর্ব্বার মানব দেহ ধারণ করা বুঝাইয়া দেয়, এমনও নহে। মনুষ্য-জন্ম বা তদপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীতেও জন্মগ্রহণ করা অসম্ভবপর নহে। যে আপনার উপযুক্ত কাজ সম্পন্ন না করিয়া, এ জন্ম হইতে অপসৃত

হইল, তাহার এমন কি কার্য্যফল জন্মিল, যাহাতে সে, উচ্চ-লোকে যাইয়া, সেখানকার কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে? উচ্চ-দিকে আরোহণ করিতে গেলে, প্রথমে অবশ্যই তাহাকে সর্ব্বনিম্ন-তলের প্রথম সোপান অবলম্বন করিতে হইবে। তৎপরে, পর পর ধাপে আরোহণ করিলে, ক্রমে উপরিভাগে যাইতে সমর্থ হয়। যাঁহারা উন্নতির পর উন্নতি, কেবল এই মতটি ধরিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনাদের উন্নতির পথে কণ্টক-বীজ রোপণ করেন। তাঁহারা এই মহতী আশার উপর নির্ভর করিয়া, হয়-ত আপনাদের চরিত্র-সংশোধনে তাদৃশ যত্নবান্ হয়েন না, না-হয়, তাদৃশ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে ভাবী উন্নতির পথ-প্রদর্শক ধর্ম্ম-সাধনে অনুরক্ত হয়েন না। তাঁহাদের এটি জানা আবশ্যক যে, এ সংসারে যেমন উন্নতির পথ আছে, অধোগতির আর একটি পথ রহিয়াছে। উন্নতির কার্য্য-ফল মনুষ্যকে যেমন উন্নতিতে আনিয়া দেয়, অধোগতির কার্য্য-ফল, তেমনই অধোগতিতে লইয়া যায়। উন্নতি ও অধোগতির পথ যেমন পরস্পর বিভিন্ন, তেমনই উহাদের কার্য্য-প্রণালী স্বতন্ত্র। উন্নতির পথে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, আর অধোগতির পথে পাপ বৃদ্ধি পায়। তবেই দেখ, উন্নতির পর উন্নতি, কেবল এ বিধিটি সকল ক্ষেত্রে ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ রক্ষা পায় কৈ?

মনুষ্যের পূর্ব্ব-জন্ম ছিল, এটি নিশ্চিত, ঐ পূর্ব্ব-জন্ম স্বীকার না করিলে, যেমন ইহ-জন্মের কার্য্য-ফলের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে; তদ্রূপ উন্নতি ও অবনতির পথ পৃথক্ পৃথক্ এবং উহাদের কার্য্য-ফল ভিন্ন প্রকার বলিয়া স্বীকার না করিলে, পরলোক ও জন্মান্তর পরিগ্রহ সম্বন্ধে বিষম ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। কার্য্যের ভাল-মন্দের উপর কর্ম্ম-ফল নির্ভর

করে। ঐ কর্ম্ম-ফল, জীব পর-জন্মে উপভোগ করে, এবং ঐ সঙ্গে নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় করিতে থাকে। এই যে সাধারণ-বিধি, ইহার সার্থকতা থাকে কি রূপে? যে, জন্ম-গ্রহণ করিয়াই, মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, তাহার নূতন কার্য্য সঞ্চয় করা, কিরূপে প্রকাশ পায়? তবেই দেখ, অসম্পূর্ণ-বৃত্তি বা কামনার পরিসমাপ্তি না হওয়া, বা নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় না করিলে, কেহই উচ্চ-দিকে যাইতে পারে না; সুতরাং তাহার উন্নতির দশা না ঘটিয়া, অবনতির দশা ঘটে, অর্থাৎ সে পুনর্ব্বার নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিবার জন্য, নিম্ন-দিকে যাইয়া স্থান পায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরম-হংস এ বিষয়ে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করা গেল।—

"কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে, কুম্ভকার পুনরায় তাহাতে হাঁড়ি প্রস্তুত করে; কিন্তু পোড়া হাঁড়ি ভাঙ্গিলে, কুম্ভকার আর তাহাকে গ্রহণ করে না। অজ্ঞান অবস্থায় মরণ হইলে, পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইয়া মরিলে, আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে না।" যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা প্রকার অপসিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। কিন্তু যাঁহারা ইহার প্রতি বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে অভ্রান্ত মতের সুপ্রকাশ দেখিতে পান; এ জন্য তাঁহাদের আত্মোন্নতির পথে কোন বাধা-বিপত্তিতে উন্নতির পথ-ভ্রষ্ট হইতে হয় না।

হিন্দুর জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু ঘটিত বিষয় লইয়া যে সকল অভ্রান্ত মত দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসমুদয়ে ঐ উন্নতি ও অবনতির বিষয় সুস্পষ্ট রূপে জানা যায়। মনুষ্য পূর্ব্ব-জন্মে সে কি ছিল, এবং বর্ত্তমান ও পর-জন্মে তাহার জীবনের গতি কি প্রকার হইবে, এ সকল বিষয় জানিতে পারে না বলিয়াই,

তাহার মনে, নানা প্রকার তর্ক ও ভ্রম-প্রমাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে আপনি আপনাকে না চিনে, সে কেমন করিয়া, আপনার গতি বুঝিতে পারে? সুতরাং অযথা পথে ঘূরিয়া বেড়ান, তাহার কার্য্য হইয়া উঠে। এ স্থলে তাহার অন্যথা ভাব দেখা যায় না। এ কারণ আমরা সাধারণকে অনুরোধ করি, যাঁহারা জ্যোতিষের কোন সংবাদ রাখেন না; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের জন্ম-পত্রিকা আছে, তাঁহারা যদি কোন পারদর্শী জ্যোতিষীর নিকট যাইয়া, আপনাপন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য চেষ্টা পান, তাহা হইলে, এই জন্ম-মৃত্যু ঘটিত বহুল জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আবার যাঁহাদের আদৌ কোন প্রকার জন্ম-পত্রিকা নাই, তাঁহাদেরও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। এমন অনেক জ্যোতিষী আছেন, যাঁহারা লোকের অঙ্গাদির অবয়ব ও চিহ্নাদি দেখিয়া, অথবা প্রশ্নমতে লগ্নস্ফুট করিয়া, তাঁহার জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। এই জ্ঞানে যিনি যত পারদর্শী, তিনি তাঁহার যে জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করেন, তাহা ধরিয়া গণনায়, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং আত্মীয় স্বজনের পর্য্যন্ত জন্ম-বৃত্তান্ত পরিষ্কার রূপে বলিয়া দিতে সমর্থ হয়েন। জ্যোতিষের এমনই বল যে, অনেক বদ্ধ নাস্তিককেও আস্তিকতার দিকে আনিয়া দেয়,—মনুষ্যের যথার্থ গন্তব্য-পথ পরিষ্কার রূপে জানাইয়া দেয় এবং জীবের পূর্ব্ব-জন্ম ইহ-জন্ম ও পরজন্মের বিষয়, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া, এ স্থলে বড়ই একটি শোচনীয় বিষয় ঘটিত ব্যাপার আমাদের মনে উদিত হইল; সুতরাং এ স্থলে তাহা প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

ছয় বৎসর কাল অতীত হইল, আমাদের একটি আত্মীয় ব্যক্তি

বায়ুরোগাক্রান্ত হয়েন। কেবল তাঁহারই আগ্রহাতিশয় জন্য, প্রথমে তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে যাইয়া উপস্থিত হয়েন। সেখানে চিকিৎসাদি হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পীড়ার কোন উপকার দর্শিল না। তৎপরে সেখান হইতে, তাঁহাকে চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনা হইল। সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে এখানকার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট লইয়া যাইয়া দেখান হয়। তিনি রোগীকে দেখিয়া ও রোগের অবস্থা শ্রবণ করিয়া, একটি তৈল ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা মতে তৈল ও ঔষধ আনা হইল। দুই দিন তৈল ও ঔষধ ব্যবহার করা হইলে, তৃতীয় দিন রোগী তৈল কি ঔষধ, ইহার কিছুই ব্যবহার করিতে সম্মত হইলেন না। ঔষধ ও তৈলের নাম করিলেই বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন, ইহাতে আমার কোন উপকার হয় না, বরং বিশেষ অপকার দর্শিতেছে। এই বলিয়া, তৈল ও ঔষধ ব্যবহারে একবারে বিরত হইলেন। আমরা তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে চেষ্টা পাইলাম। বিস্তর চেষ্টার পরে তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে সম্মত হইলেন। তাঁহার পীড়ার লক্ষণগুলি মিলাইয়া, যে ঔষধ উপযুক্ত বোধ করা গেল, তাহাই দেওয়া হইল। দুই চারি দিন সেবনের পর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন, ঔষধ সেবনে আমার উপকার হয় কৈ ? কেবলই অপকার দেখি। ঔষধ সেবনে আপনার কি অপকার হইতেছে ? এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে আমার ক্ষুধা ছিল না, এখন আমার ক্ষুধা দেখা দিয়াছে,—পূর্ব্বে নিদ্রা হইত না, এখন বেশ নিদ্রা হয়,—পূর্ব্বে মনে সুখ বোধ করিতাম না, এখন মন

প্রফুল্ল থাকে,—এ সব আমার অপকার ভিন্ন উপকার বোধ করি না,—আমায় আপনারা এমন একটি ঔষধ প্রদান করুন, যাহা সেবন করিলে, আমার সত্বর জীবন নাশ হয়,—তাহা না পাইলে আমি আর অন্য কোন ঔষধ সেবন করিতেছি না। তাঁহার মনের ভাব, এই প্রকার জানিয়া, তাঁহাকে বলা হইল, আপনি জীবনে কেন এত হতাশ হইয়াছেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার বিষয়াদি যখন দেশের লোকে আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন আমার জীবন-ধারণের উপায় কিছুই নাই; সুতরাং কিরূপে পুত্র-কন্যা, পরিবার-প্রতিপালন করিব? এ অবস্থায় আমার মরণই প্রার্থনীয়। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ কতই প্রলাপের ন্যায় বলিতেন; কিন্তু বাস্তবপক্ষে, তাঁহার কথানুসারে প্রকৃত কোন ঘটনা দেখা যাইত না। পাঠকগণ! জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ব্যক্তিকে পাগল না বলিয়া, কি বলা যাইতে পারে? এক জন জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত গণনা করিয়া, ইহাঁর বিষয় যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকল সংশয়-ছেদন হইয়া যাইবে।

এই ভাবে কিছু দিন কলিকাতায় থাকিবার কালে, তাঁহার মন ভিন্নরূপে দাঁড়াইল। তখন তিনি সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন, এখন আমার কোন পীড়া নাই, আমি বেশ আরাম হইয়াছি, এখন আমি নিজ বাটীতে যাইয়া, আপন বিষয়াদি অনায়াসে দেখা শুনা করিতে পারিব এবং আমার পুত্রকন্যাদিগকে দেখিতে পাইলে, আর কোন অসুখ থাকিবে না; সুতরাং আর আমি এখানে থাকিব না। এই সময়ে তিনি কখন কখন গোপনভাবে বাটী হইতে বাহির হইবার চেষ্টা পাইতেন। আমরা তাঁহার বাটী যাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া, তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশে পাঠাইলাম। ভাবিলাম সেখানে যাইলে, বোধ করি সুস্থির

হইতে পারিবেন ; কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিল। আত্ম-হত্যা করিয়া, দেহ-ত্যাগ করিবেন, ইহা সেখানকার একটি বলবৎ উপসর্গ হইয়া উঠিল। কলিকাতায় থাকিবার কালে, যদিও তাঁহাকে কোন কোন দিন ঔষধ সেবন করান যাইত ; কিন্তু তিনি তথায় যাইয়া আর কোন ঔষধই সেবন করিতেন না।

যখন রোগীর এই রূপ শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ পাইল, তখন অনন্যোপায় দেখিয়া, তাঁহার ঠিকুজী খানি এখানে আনা হইল। বহুবাজারের শ্রীমহানন্দ ও শ্রীশ্রীরাম আচার্য্য এই দুই জন জ্যোতিষীকে উহা দেখান হইল, এবং জন্ম-কুণ্ডলী-সংক্রান্ত বিষয়-গুলি লিখাইয়া দিয়া, বলা হইল যে, ইহাঁর বর্ত্তমান পীড়া কি ? এবং ভাবী শুভাশুভ যাহা জানিতে পারিবেন, সবিস্তর লিখিয়া দিবেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিলেন, তিন দিনের কম্ এ গণনা হইয়া উঠিবে না। আমরাও ইহাতে সম্মত হইলাম। ইত্যবসরে, অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম, কটন ষ্ট্রীটে কাশীর এক জন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ আসিয়াছেন। বড় বাজারের একটি পরিচিত হিন্দু-স্থানীকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলাম। জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, তাঁহার নাম পণ্ডিত দেবদত্ত। জনৈক ধনাঢ্য হিন্দুস্থানী তাঁহার প্রয়োজন বশতঃ, তাঁহাকে কাশী হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

আমরা যখন দেবদত্ত পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা দুইটার কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। তাঁহাকে ঠিকুজী দেখাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, প্রাতে ভিন্ন আমি ঠিকুজী কি কোষ্ঠী কাহার দেখি না। ঠিকুজী দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আগামী কল্য প্রাতে আসিবেন। আর যদি তাহা না পারেন, তবে যাহা জানিবার অভিলাষ থাকে, প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে এখন সকলই বলিয়া দিব।

পণ্ডিতজীর এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে এই প্রশ্ন করা হইল, আমার একটি আত্মীয় ব্যক্তির বায়ু-রোগ হইয়াছে; এজন্য তাঁহার ভাবী ফলাফল জানিতে ইচ্ছা করি?

তিনি আমার নিকট এই প্রশ্ন শুনিয়া, আমাকে বলিলেন, এক শত অঙ্কের মধ্যে যাহা আপনার মনে আইসে, এমন চারিটি সংখ্যা বলুন? তৎকালে আমার মনে যাহা আসিল, এমত চারিটি সংখ্যার উল্লেখ করিলাম।

তিনি ঐ চারিটি অঙ্কের গণনা করিয়া অতি শীঘ্রই একটি জন্ম-কুণ্ডলী প্রস্তুত করিলেন। জন্ম-কুণ্ডলী প্রস্তুতের পর, তিনি আমাকে বলিলেন, আপনার নিকট যখন তাঁহার ঠিকুজী রহিয়াছে, তখন দেখুন দেখি, আমি যাহা যাহা বলিতেছি, এ ভাবে ঐ জন্ম-কুণ্ডলীর গ্রহাদির সন্নিবেশ আছে কি না? আমরা দেখিলাম, তাঁহার একটি কথারও গরমিল হইল না। তখন প্রকাশ্যভাবে বলিলাম, আপনার কথা অনুসারে ইহার সকল গুলির সহিত ঠিকুজীর ঐক্য দেখিতেছি।

তখন তিনি বলিলেন, আপনি যে বায়ু-রোগের বিষয় প্রশ্নের উল্লেখ করিলেন, আমি ত উহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এ ব্যক্তির বিষয়, যাহা দেখিতেছি,বলি শুনুন,—প্রায় ছয় মাস কাল গত হইল, ইহাঁর একটি কর্ম্মচারীর সহিত, অতি সামান্য বিষয় লইয়া বচসা হয়। ঐ সূত্র হইতে,তাঁহার মস্তিষ্ক অতিশয় গরম হইয়া উঠে। অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার আহারাদির প্রতি সন্দেহ জন্মিল,—যেন বোধ করেন, অন্ন ব্যঞ্জনে বিষ দিয়া,তাঁহাকে সংহার করিবার চেষ্টায় আছে। ক্রমে গ্রামের লোক সকলের প্রতি অবিশ্বাস দাঁড়াইল, পরে বাটীর পরিজনদিগের প্রতিও ঐ প্রকার ভাব দেখা দিল। শেষে এই স্থির করিলেন, যদি আমি এখানে থাকি, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণবধ করিবে। এই প্রকার ভাবনায় বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার বাটী হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে কোন

আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া থাকেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়া, সেখানকার সকলের উপর অবিশ্বাস জন্মিল। পরে এই কালকাতা আইসেন, এখানেও ঐ রূপ ঘটিল। অধিকন্তু কিছু দিন এখানে থাকিবার পরে, পুনর্ব্বার বাটীতে যাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা পান। এখন তিনি বাটীতে আছেন, কিন্তু বড়ই বিপদ দেখিতেছি। দুষ্ট-গ্রহের চরম সীমায় আসিয়া পড়িয়াছেন। প্রতীকারের কোন উপায় দেখি না,—আত্ম-হত্যা ইহাঁর নিশ্চিত কুফল দেখিতেছি। এ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আত্ম-হত্যায় চেষ্টা পান, কিন্তু বাটীর পরিবারদিগের চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছেন। আহা! বড়ই শোচনীয় দশা দেখিতেছি, আত্ম-হত্যায় প্রাণত্যাগের বেশি বিলম্ব নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি বলুন দেখি, আমি তাঁহার যে পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বর্ণন করিলাম,ইহা কতদূর সত্য?

আমি তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতেই অবাক হইতে হইল। তাঁহার কথার প্রত্যেক বিষয়গুলি এমনই সত্য, যেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহার অবিকল পরিচয় দিলেন। তৎপরে প্রকাশ্যভাবে বলিলাম, মহাশয়ের একটি কথায়ও অনৈক্য দেখিতে পাইতেছি না,—আমি এরূপ গণনা জীবনে কখন দেখি নাই। জ্যোতিষের গণনায় যে, এত দূর জানিতে পারা যায়, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না,—এই নূতন দেখিলাম। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই, যখন ইহার অন্তর্ভূত প্রত্যেক বিষয়গুলি, আপনার কথানুযায়ী সত্য বলিয়া জানিতেছি, তখন তাঁহার আত্ম-হত্যাটি যে নিশ্চয় ঘটিবে, তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারি না। বিশেষতঃ তাহার সূচনা কয়েকবার দেখা দিয়াছিল; এই জন্যই এ সম্বন্ধে আরও বিশ্বাস করিতে হয়। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় এই হইতেছে যে, ইহার যদি কোন প্রতীকারের উপায় থাকে, তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলে, সবিশেষ উপকৃত হই।

*তিনি আমার এই সকল কথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ সবিশেষ মনঃ-*সংযোগ দিয়া, তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, বুধ গ্রহ, ইহাঁর নিতান্তই বিরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে,—এখন আবার ইহার অন্তর্দশা পাই-য়াছে। বুধের ক্রিয়া-কলাপ, সকলই বাল্য-ভাবে প্রকাশ পায়। বয়স্থ ব্যক্তি যদি ঐ ভাব প্রকাশ করে, তবে তাহাকে কে না বদ্ধ পাগল বলিয়া বিবেচনা করিবে? দেখুন, আপনারাও ইহাঁকে তাহাই বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা যাহাই হউক, ইহাঁর এক্ষণে এমন কোন শুভ-গ্রহের বল দেখি না, যাহাতে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। পীড়ায় পাগল, আরাম হয়, কিন্তু গ্রহাদির ফেরে পড়িয়া, পাগল হইলে, কদাচ কেহ অব্যা-হতি পায় না। তবে যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনাকে একটি সৎপরামর্শ বলিয়া দিতেছি,—আর কোন মতে বিলম্ব করিবেন না। ইহাতে যদিও প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা দেখি না, কিন্তু মানবের দেহ-শুদ্ধি ও কল্যাণের জন্য শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা করিতে পারেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই,—দৈবের বল অভাবনীয়। এ কারণ এ স্থলে নব-গ্রহ হোম ভিন্ন অন্য উপায় আর দেখি না।

এই কথা বলার পরেই তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, দেখুন, এ ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য। ইহাঁর অব্যাহতির সুলক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। তাহার কারণ এই, কোন দৈব কার্য্য করিতে গেলে, একটি প্রশস্ত দিনে উহা করা উচিত। এ সব কার্য্য শুক্লপক্ষেই সম্পন্ন করিতে হয়, এটি কৃষ্ণ পক্ষ। এ পক্ষে ইহার উপযুক্ত দিন কৈ? কিন্তু তাহা বলিয়া প্রশস্ত দিনের জন্য অপেক্ষা করা যাইতে পারে না। আমি চন্দ্রের বলাবল ধরিয়া, এই যে দিনটি স্থির করিয়া দিলাম, ঐ দিনে, এটি সম্পন্ন করাইবেন, ইহার অন্যথা না হয়।

আমি তাঁহারই কথানুসারে বলিলাম, যদি এ পক্ষে প্রশস্ত দিন না মিলে, তবে এই কৃষ্ণ-পক্ষ গত হইলে, শুক্ল পক্ষের একটি দিন স্থির করিলে ত ভাল হয় ? বিশেষতঃ এ কার্য্যে কুশল একটি লোকের চেষ্টা করিতেও কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব ঘটিতে পারে।

তিনি আমার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, সে দিন পাইতে বিস্তর বিলম্ব রহিয়াছে ; অথচ যদি এই পক্ষের মধ্যে ইহা সমাধা না হয়, তাহাতে আমার মনে বিস্তর সংশয় রহিয়াছে। অতএব এই পক্ষেই উহা সমাধা করাইবেন। আমি জানিতেছি. তাঁহার ইষ্ট-দেবতা (গুরু ঠাকুর) জীবিত আছেন, তিনি এ সকল দৈব-কার্য্যে কুশল। তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, কোন দোষ দর্শিতে পারিবে না। আপনি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না। যাহাতে এই ক্রিয়াটি সত্বর হইয়া উঠে, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টায় থাকিবেন।

এই সকল কথোপকথনের পরে, উক্ত পণ্ডিতজীর সহিত ঐ আত্মীয় ব্যক্তির পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি বিষয়-ঘটিত বিষয় লইয়া, বিস্তর কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি তাহার প্রত্যেক বিষয়গুলির এমনই সদুত্তর দিয়াছিলেন, যাহা অদ্যাপি চিরস্মরণীয় রূপে আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে। এ স্থলে কেবল বাহুল্যভয়ে, উহা প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

আমি তাঁহার আন্তরিক ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়া, এ বিষয়ে অন্য কোন কথা উত্থাপন করিলাম না ; কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন ঐ ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে কি না ?

পণ্ডিতজী বলিলেন, তাঁহার স্বদেশে যখন দেহ-ত্যাগ অবধারিত রহিয়াছে, তখন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া, এ অবস্থায় কিছুই উপকার দেখি না,—বরং তাহাতে আরও বিপদের সম্ভাবনা আছে।

তাঁহার বাটীর পরিবারবর্গ যেরূপ সতর্কতার সহিত, তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, উহারই গুণে, এত দিন জীবিত রহিয়াছেন; কিন্তু নিয়তির দিন কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

পরিশেষে, যখন আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, আসিবার উপক্রম করিতেছি; এমন সময়ে তিনি নিজেই বলিলেন, আপনি অন্যের কথা লইয়া এতক্ষণ কাটাইলেন; কিন্তু নিজের বিষয় জানিবার জন্য আমাকে একটি কথাও বলিলেন না?

আমি উত্তর করিলাম,—আমি যাঁহাদের নিকট আপনার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি, তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম যে, প্রশ্ন-গণনায়, আপনি এক জনের নিকট একটি প্রশ্ন শ্রবণ করিলে, সে দিন আর তাঁহার নিকট দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনিতে চাহেন না; সুতরাং নিজের কোন কথাই মহাশয়কে জানাইতে পারি নাই।

আমার এই কথা শুনিয়া, পণ্ডিতজী কহিলেন, আপনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই বটে; কিন্তু আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, ঐ প্রশ্নেই আমি আপনার সংস্রব ও সম্বন্ধ রহিয়াছে জানিতে পারিয়াছি; এ কারণ আমি আপনার ও আপনার পুত্র-কন্যা পরিবারাদির বিষয় বলিয়া দিতে পারি।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমার সহিত এ ব্যক্তির কি সম্বন্ধ আছে? এই কথা বলিবামাত্র, তিনি পরস্পরের যথা-যোগ্য সম্বন্ধটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—আপনার সহিত এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, আপনাকে এই প্রশ্নের অন্তর্গত বলিয়াছি। এখন যাহা জানিতে চান, তাহা বলিয়া দিতে পারি।

আমি তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়াও নিজের বিষয় জানিবার জন্য কিছুই ব্যক্ত করিলাম বটে; কিন্তু তিনি আমার বিষয় নিজেই অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, তাহার একটি বিষয়েও অনৈক্য ঘটিল না। অধিকন্তু দুই

একটি বিষয়ে, তিনি আমার উপকারার্থে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইয়া বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল।

এক্ষণে বলা আবশ্যক, আমি ইতি পূর্ব্বে বহুবাজারের যে দুই জন জ্যোতিষীর নিকট উক্ত আত্মীয় ব্যক্তির ভাবীফল গণনার জন্য ভার দিয়াছিলাম, তাঁহাদের ঐ গণনা এই দিনে পাইবার কথা ছিল। আমি বড়বাজার হইতে আবাসে আসিয়া শুনিলাম, শ্রীরাম আচার্য্যের গণনা পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জ্ঞাত হইলাম যে, "তাঁহার বর্ত্তমান দশার সময়টি বিশেষ কষ্টদায়ক।" তদ্ভিন্ন তাহাতে বিশেষ কিছুই লিখিত ছিল না। মহানন্দের গণনা সে দিন না পাওয়াতে, তৎপর দিন প্রাতে তাঁহার নিকট গেলাম। যাইয়া দেখি, তিনি তাঁহার গণনা লিখিয়া শেষ করিয়াছেন, তথাপি আর একবার গণনার মিল করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ ব্যক্তির গণনায়, তাঁহার ভাবীফল কিরূপ জানিতে পারিলেন? তদুত্তরে তিনি কহিলেন"বর্ত্তমানে তাঁহার মৃত্যু-সংশয় এ রূপ দশা দেখিতেছি"। মৃত্যু নিশ্চিত ঘটিবে কি না? আর যদি মৃত্যু-যোগ ঠিক জানিয়া থাকেন, তবে কিরূপে ও কোন্ সময়ের মধ্যে ঘটিবার সম্ভাবনা? আমি তাঁহাকে এই সকল প্রশ্ন করিলাম বটে, কিন্তু সে সকলের বিস্তারিত বা নিশ্চিত বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না। তৎপরে আমি তৎপূর্ব্ব দিনে পণ্ডিত দেবদত্তের নিকট যাইয়া, প্রশ্নমতে জিজ্ঞাসা করাতে, যে সকল বিষয় অবগত হইয়াছিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় দিলাম। মহানন্দ, অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত পণ্ডিতজীর এ রূপ গণনার বিষয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তৎপরে কহিলেন, আপনি যখন এরূপ পারদর্শী জ্যোতিষীর দেখা পাইয়াছেন, তখন আমাদের এ গণনা যৎসামান্য বলিতে হইবে। এক্ষণে আপনার

নিকট উক্ত পণ্ডিতজীর গণনা শুনিয়া, আমার মনে এমনই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে যে, তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনি যদি আমাকে একবার তাঁহার নিকট লইয়া যান, তাহা হইলে বিশেষ উপকার বোধ করি। আমি মহানন্দের কথায় সম্মত হইয়া, ঐ দিন মধ্যাহ্নের পর, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, উক্ত পণ্ডিতজীর নিকট গমন করিলাম। পরে মহানন্দের কথা অনুসারে অপর এক জনের বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলাম। যাঁহার বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, তিনি ঐ পীড়িত ব্যক্তির একটি আত্মীয়া ছিলেন।

পণ্ডিতজী প্রথমে পূর্ব্বদিনের ন্যায় গণনা করিয়া, যখন তাঁহার জন্ম-লগ্ন স্থির করিয়া জন্ম-কুণ্ডলীতে গ্রহাদির সন্নিবেশ করিলেন, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, যে ব্যক্তির বিষয় জানিবার জন্য এখন আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহাঁর ঠিকুজী যদি আপনার নিকট থাকে, তাহা মিলাইয়া লইতে পারেন। তখন আমি ঐ ঠিকুজীখানি মহানন্দের হাতে দিলাম। পণ্ডিতজী একে একে গ্রহাদির সন্নিবেশগুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর আমরা দুই জনে উহা মিলাইতে লাগিলাম। যখন সকল গুলির মিল হইল, তখন মহানন্দ আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, এ যে বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই সময়ে পণ্ডিতজী পুনর্ব্বার আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আপনি গত কল্য যে ব্যক্তির গণনার বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি দেখিতেছি যে, ঐ ব্যক্তির সহিত ইহাঁর এইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে,—এ আরও ভাল হইয়াছে, এখন আমি ইহাতেও জানিতে পারিতেছি যে, ঐ ব্যক্তির অপঘাত মৃত্যু কিছুতেই খণ্ডন হইতেছে না। এই কথা বলার পর ঐ পীড়িত ব্যক্তির গণনাসম্বন্ধে লইয়া মহানন্দ ও উক্ত পণ্ডিতজীর সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। পরিশেষে পণ্ডিতজী

যখন শাস্ত্র-বচনগুলির উল্লেখ করিয়া, উহাদের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিলেন, তখন মহানন্দ সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাহার অনেকগুলি বচন ও ব্যাখ্যা লিখিয়া লইলেন। আমি মহানন্দের মুখে শুনিয়াছি, তিনি ঐ বচনগুলি দ্বারা গণনা বিষয়ে অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ের পরিণাম ফল কি ঘটিল; তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

পরিশেষে বড়ই শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমি যে ব্যক্তির গণনা জানিবার জন্য পণ্ডিত দেবদত্ত প্রভৃতির নিকট গিয়াছিলাম; তাঁহার পরিণাম ফল বড়ই শোচনীয়। উক্ত পণ্ডিতজীর নির্দ্দিষ্ট দিনে, নবগ্রহ হোম সম্পন্ন করা হইল; কিন্তু কৃষ্ণা দশমীর রাত্রে, উক্ত ব্যক্তি, আপনার সমস্ত পরিবার-বর্গের মধ্যগত থাকিয়াও শয্যা হইতে এমনই গুপ্তভাবে উঠিয়া-ছিলেন, যাহার বিন্দু বিসর্গ কেহই জানিতে পারেন নাই। এই অবসরে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করেন।* তিনি তাঁহার মাতার একটিমাত্র পুত্র ছিলেন। শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতা পরলোকগত হয়েন। এখন কতকগুলি নাবালক পুত্র-কন্যা রাখিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার যে প্রকার বিষয়-বিভব ছিল, এক জন মধ্যবিত গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্টই বলিতে হইবে। তিনি কালের কবলে পড়িয়া, এমনই ভ্রমান্ধ হইলেন যে, আত্ম-হত্যা না করিয়া, কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। এখন তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল, কিন্তু পরিবার-বর্গকে, যারপরনাই শোক-দুঃখে ভাসাইয়া গেলেন। পণ্ডিত দেবদত্ত এ সম্বন্ধের গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বাপর ধরিয়া দেখুন, একটিও অনৈক্য হয় নাই। কৃষ্ণ পক্ষের

*১২৯২ সালের ১৭ই চৈত্র সোমবার রাত্রি দুই প্রহরের সময়।

মধ্যেই যে, তাঁহার দেহ-ত্যাগ হইবে, এটি তিনি বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই নবগ্রহ হোমটি যাহাতে উহারই মধ্যে সম্পন্ন হয়, এ কথা বারবার বলিয়াছিলেন। আর জীবের কর্ম্ম-ফল ভোগের অবসানে যে, সকলকেই মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়, এবং তাহাদের ভাবী শুভাশুভ যাহা প্রত্যেকের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা কিছুতেই খণ্ডন হইবার নহে; ইহা পণ্ডিতজীর গণনায় সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে কারণে আত্ম-হত্যা সংঘটন হইল, তদ্বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা যে অভ্রান্ত, তাহা তিনি বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা উচিত, উন্নতি ও অবনতি যখন মনুষ্যের কার্য্য-ফলের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন প্রত্যেকের কর্ম্ম এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহারা উন্নতির ক্রমকে লাভ করিতে পারে। উন্নতি বিনা জীবের সদ্গতির উপায়ান্তর নাই। যেখানে উন্নতির ক্রম দেখা না দিবে, সেখানে অবনতি তাহার নিশ্চিত কুফল জানাইয়া দেয়। অবনতির ক্রমে যাইলে, জীব অশেষবিধ দুঃখ-দুর্গতির যন্ত্রণা ভোগ করে; সুতরাং উন্নতি ও অবনতি যে স্বতন্ত্র বিষয়, এখন ইহা কে না স্বীকার করিবেন? জীব কিসে উন্নতির ক্রম লাভ করিতে পারে, এক্ষণে যোগ-শাস্ত্র-মূলক বিষয়গুলি লইয়া, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। যোগানুষ্ঠান বিনা কেহই ধর্ম্মের চরম সীমায় যাইয়া, বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা আপনাদের প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে সমুৎসুক, যোগ-শাস্ত্র তাঁহাদের প্রধান অবলম্বনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যোগ তত্ত্ব।

১। উপক্রমণিকা।

সমগ্র যোগ-শাস্ত্র অতিশয় বিস্তৃত বিষয়। ভারতের আর্য্য যোগী-ঋষিগণ এ সকলের প্রণেতা। যোগ-শাস্ত্রে বহুবিধ যোগানুষ্ঠানের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অধ্যাত্ম-যোগই ধর্ম্ম-পথের প্রধান সহায়। এই জন্য ইহার কর্ম্ম-যোগ, ধর্ম্ম-যোগ (জ্ঞান-যোগ), মোক্ষ-যোগ এবং ভক্তি-যোগ, এই চারিটি প্রধান বিভাগের বিষয় লইয়া, যথাক্রমে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে যোগ সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়, নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

যখন মন কোন ক্রিয়াসাধনে মিলিত হয়, তখন উহাকে কর্ম্ম-যোগ বলে। যখন উহা ক্রিয়াদির সঙ্গে ধর্ম্ম-পথ লাভ করিবার জন্য ধাবিত হয়, তখন উহার নাম ধর্ম্ম-যোগ। আর কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সাধনে যখন ঐ মন ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হয়, তখন উহা মোক্ষ-যোগে যাইয়া স্থান পায়। যোগের অন্তঃসার ভক্তি, এবং ঐ ভক্তি যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই সাধকের শুভযোগ আনিয়া দেয়, উহাকেই ভক্তি-যোগ বলে।

যিনি ধর্ম্ম-গিরিতে আরোহণ করিতে সমুৎসুক, প্রথমে তাঁহাকে কর্ম্ম-যোগের বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। তৎপরে ধর্ম্ম-যোগ এবং পরিশেষে তাহার মোক্ষ-যোগ আসিয়া দেখা দেয়। এই ত্রিবিধ যোগের মধ্যে যদিও মোক্ষ-যোগ জীবের সর্ব্বোচ্চ অধিকার জানাইয়া দিতেছে ; কিন্তু প্রথমে কর্ম্ম ও ধর্ম্ম-যোগ শিক্ষা বিনা, কেহই ঐ সর্ব্বোন্নত শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন না। আর ভক্তি বিনা যখন সাধনে যোগ দেওয়া কেবলই বিড়ম্বনা-মাত্র, তখন ভক্তি-যোগকেই যোগের সর্ব্বপ্রধান বলিতে হয়।

প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে, তাহার ফল-লাভ করা, যেমন স্বভাব-সিদ্ধ গুণ, ধর্ম্মের সঙ্গে, অন্তরের বিশুদ্ধতা লাভ করা তেমনই উহার স্বধর্ম্ম। আর মোক্ষের সঙ্গে, ঈশ্বরে আত্মার লয়-প্রাপ্তি হওয়া, এই চিরসম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ম্ম-যোগের কার্য্যকলাপে পারদর্শী হয়, সে ধর্ম্ম-যোগের মূল-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে। তখন ক্রমে সে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে থাকে। পরে যখন ঐ জ্ঞানে তাহার অন্তশ্চক্ষুকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়, তখনই সে মোক্ষপদ লাভ করিবার অধিকারী হইয়া উঠে। মনুষ্য, জন্ম-গ্রহণ করিয়া, যেমন কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, তেমনই সে নূতন নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় করিবার জন্যও এখানে আসিয়াছে। এই জন্য তাহাকে প্রথমে কর্ম্ম-যোগে লিপ্ত হইতে হয়। তাহার কর্ম্ম এমনই হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহাকে ধর্ম্মের সরল পথ ধরিতে বাধা না দেয়, এবং ঐ ধর্ম্ম এমনই বিশুদ্ধ হওয়া চাই, যাহাতে ভক্তির বল ক্রমেই বাড়িতে থাকে ও ঐ বলে সে মোক্ষ-পথে যাইতে কোন বাধা না পায়।

যোগ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই,—সদ্‌গুরু লাভ করা যোগার্থীর একটি প্রধান বিষয় এবং তৎসঙ্গে শাস্ত্রানুশীলন থাকিলে, মনের দৃঢ়তা জন্মাইয়া দেয়। ধর্ম্ম-গুরুর উপদেশ বলে, মনুষ্যের মন সর্ব্বপ্রকার অধীনতাশূন্য হইয়া আইসে, এবং তাহার যথার্থ গন্তব্য স্থান দেখাইয়া দেয়। এই জন্য গুরু, ধর্ম্মার্ণবের কর্ণধার হইয়াছেন। স্বর্ণ-রৌপ্যাদির মূল্য নিরূপণার্থে যেমন কোষ্ঠী-পাথর ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের প্রকৃত-তত্ত্ব মিলাইয়া লইবার জন্য শাস্ত্র-গ্রন্থ ; এ কারণ শাস্ত্রকে কোষ্ঠী-পাথর বলে। জ্ঞান-গুরুর কৃপা-বল ভিন্ন কেহই ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মনুষ্য ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইয়া, সাধনে যত প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পায়, শাস্ত্রালোচনায় তৎসমুদয় স্পষ্টরূপে জানা যায়। তুমি

ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া, কত দূর অগ্রসর হইয়াছ,—তোমার কতটুকু ধর্ম্ম-বল বাড়িয়াছে,—এখন তুমি কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছ এবং তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-ফল কিরূপে পরিণত হইবে; ইত্যাদি বিষয়ের স্বরূপভাব প্রত্যয়ের জন্য শাস্ত্রালোচনা আবশ্যক। যিনি শাস্ত্রকে ধর্ম্ম-পথের প্রধান সহায় বিবেচনা করিয়া, কেবল শাস্ত্রানুশীলনে অনুরক্ত থাকেন, শত সহস্র বৎসর অতীত হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব প্রস্ফুটিত হইবার নহে। জীবন্ত ধর্ম্ম-ভাব, সদ্‌গুরুর মুখে অবস্থিত। তাঁহারই আধ্যাত্মিক-বলে, উহা অন্যের হৃদয়ে যাইয়া স্থান পায়। যতক্ষণ না সদ্‌গুরু মিলিবে,—যতক্ষণ না তাঁহার কৃপা তোমাতে আসিয়া দেখা দিবে, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার মনের অন্ধকার দূর হইবে না। যিনি বহুবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, অথচ ধর্ম্মের প্রকৃত পথে উপনীত হইতে পারেন নাই, আর যিনি কোন শাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, ধর্ম্মের প্রকৃত-তত্ত্বও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এরূপ অবস্থায় শাস্ত্র-জ্ঞানী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে উক্ত নিরক্ষর ব্যক্তির কিছুই ভেদাভেদ থাকে না। বাহ্য-বিষয়ের কার্য্যে আমরা জ্ঞানের দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়া থাকি, কিন্তু যতক্ষণ না মনুষ্য বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ভাবের অধিকারী হইতে পারে, ততক্ষণ তাহার জ্ঞানের কোন সার্থকতা হয় না। ধর্ম্ম, তোমার যেমন হিতকারী আমারও পক্ষে তেমনই, এবং সমস্ত জগতের পক্ষে তদ্রূপ। অতএব তুমি ধর্ম্মবেত্তা না হইয়া যদি কেবল শাস্ত্রবেত্তা বলিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা পাইবার চেষ্টা কর, তাহাতে তোমার বাহ্য-জ্ঞানের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। তোমার কার্য্য-ফল যতক্ষণ না তোমার অধীত শাস্ত্র-বচনের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিবে, ততক্ষণ তোমার শাস্ত্রাধ্যয়নের অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফল কিছুই উপলব্ধ হইবে না।

শাস্ত্রে বহুবিধ সন্নীতি ও সারগর্ভ সদনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা আছে,—শাস্ত্রে প্রত্যেক নীতি ও সদনুষ্ঠানের কার্য্য-ফল বর্ণিত আছে; কিন্তু সেই সকল নীতি ও অনুষ্ঠানের মত ধরিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা না করিলে, কেহই ঐ শাস্ত্রোক্ত মতের মর্ম্মাবধারণ করিতে পারে না। প্রকৃত শাস্ত্রের বিধি যেমন অভ্রান্ত, সদ্‌গুরুর উপদেশ বল তেমনই দুর্লভ বিষয়। জ্ঞান-গুরুর কৃপা-বলে, যখন মনুষ্যের মানসান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন শাস্ত্র-জ্ঞানীর জ্ঞানাভিমান ও মূর্খের মানসিক অবসন্নতা, এ দুইটির কোন ইতর বিশেষ দেখা যায় না। যিনি যতই কেন জ্ঞানাপন্ন হউন না, আর যিনি নিতান্ত অজ্ঞানভাবাপন্ন থাকুন, গুরু-মুখের অমৃত-বারি সিঞ্চন বিনা, যখন কাহারও হৃদয়ের পঙ্কিলভাব পরিষ্কালিত হয় না, তখন গুরূপদেশ এবং শাস্ত্র যে কোষ্ঠী-পাথর, এ কথা নিসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা গুরুর গুরুত্ব বিবেচনা না করিয়া, কেবল শাস্ত্রানুশীলন-কেই ধর্ম্ম-পথের প্রকৃষ্ট-পথ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের আশা ভরসার স্থল বহুদূরে রহিয়া যায়। শাস্ত্র-জ্ঞান থাকে ভালই, কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপাবল লাভ করা, ধর্ম্মার্থীর প্রধান বিষয়। বহুল শাস্ত্র-জ্ঞান সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু নিরক্ষর জনও যদি এক জন সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হয়, সে কেবল তাঁহারই সাহায্যে আপনার অন্তরকে বিকশিত করিয়া লইতে পারে। ইহাতেই বুঝাইয়া দিতেছে যে, শাস্ত্র-জ্ঞান, ধর্ম্ম-পথের প্রবেশ-দ্বার নহে,—সদ্‌গুরুর কৃপাবল, এ পথের প্রধান সম্বল। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি নিবদ্ধ আছে, এ কথা সত্য হইলেও, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবার ক্ষমতা ঐ শাস্ত্রের নাই,—এ ক্ষমতা কেবল সদ্‌গুরুর মুখ-সাপেক্ষ করে।

সকল প্রস্তরে যেমন কোষ্ঠী-পাথরের কার্য্য সমাধা হইয়া উঠে না, তদ্রূপ সকল শাস্ত্রে ধর্ম্ম-কার্য্যের ফলাফল পরীক্ষা করা যায় না। কালে শাস্ত্র যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, মনুষ্যের আচার ব্যবহারে তেমনই বহুবিধ বিসদৃশ ভাব আসিয়া দেখা দিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম-ভাব যেমন বিশুদ্ধতার পরিচয় দিয়া থাকে, ইহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রও সেইরূপ বিশুদ্ধতার সম্পূর্ণ অনুমোদন করে। তন্মধ্যে কতকগুলি শাস্ত্রে যে কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারও বিশেষ কারণ আছে। কাল কাহাকেই একভাবে থাকিতে দেয় না,—পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন করা, কালের স্বভাব-সিদ্ধ ভাব। সত্যকাল হইতে এই কলি-কাল পর্য্যন্ত যে মহাকাল চলিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে কত শত প্রবল ঝটিকা, ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—সমস্ত দেশকে এক প্রকার উৎসন্ন করিয়া দিয়াছে। এই ঘোর দুরবস্থার সময়ে, সময়োচিত কত নূতন শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, সে সকল, মূল-ধর্ম্ম বিনাশের জন্য নহে,—কেবল লোক-স্থিতি-রক্ষার জন্যই হইয়াছিল। তাৎকালিক সমাজে, অধিকাংশের মানসিক-ভাব যে ভাবে ভাসমান হইয়াছিল, বহুদর্শী পণ্ডিতগণ তৎকালোচিত ধর্ম্ম-সাধনের উপায় স্বরূপ নূতন নূতন শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালে এই রূপে হিন্দু-সমাজে নানা মুনির নানা প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সত্য কালের ঋষি-বাক্য সকল যেমন অভ্রান্ত-মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। আতুর ব্যক্তি যেমন সমাজ-প্রচলিত নিত্য-নৈমিত্তিক সকল ব্যবস্থা ধরিয়া চলিতে পারে না, তদ্রূপ যখন দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নৈসর্গিক অত্যাচার আসিয়া বিধিমতে দেশকে উৎপীড়িত করিতে থাকে, তখন দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহার ভঙ্গ হইয়া যায়,এবং তৎসঙ্গে বহুবিধ দোষ আসিয়া,দেশকে

আক্রমণ করে। এ রূপ বিপদের অবস্থায় দেশের শান্তি স্থাপনের জন্য যদি কোন অবৈধ বিধির সৃষ্টি হয়, তাহা ধরিয়া মূল-ধর্ম্মে কখনই দোষারোপ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের মূলে অনুসন্ধান না করিয়া, কেবল পর পর অনৈক্য ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বিষম ভ্রমে পড়িতে হয়। যথার্থ বিশুদ্ধ-ভাব গ্রহণ করিতে গেলে অবিশুদ্ধ ভাগকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হয়। যাঁহারা স্বুবর্ণের বিশুদ্ধীকরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সবিশেষ পরিচয় অবগত আছেন।

হিন্দুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ভাব যে কেবল নব শাস্ত্র প্রচারে প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাও নহে। সদ্‌গুরুর অভাবও ইহার একটি অন্যতর কারণ। শিষ্য-সেবকের সংখ্যা যত বেশির ভাগ, গুরুকুলের সংখ্যা এরূপ নহে। কালের কবলে পড়িয়া, ক্রমে গুরুর সংখ্যা হ্রাস পাইল,—শিষ্য সেবকের মনে অধর্ম্ম আসিয়া নিজ-রাজত্ব স্থাপন করিল; সুতরাং এরূপ অবস্থায় যথার্থ হিন্দু-ধর্ম্ম কেন না প্রচ্ছন্ন-ভাব ধারণ করিবে? এই ঘোর বিপদের মধ্যে আবার স্থানে স্থানে গুরু-বংশের এক একটি অবতার আসিয়া দেখা দিয়াছেন। হিন্দু-কুলে যে কিছু ধর্ম্ম-ভাব অবশিষ্ট ছিল, ঐ সকল মহাপুরুষদের গুণে, উহা একবারে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন হিন্দুর যে প্রকার দশা উপস্থিত হইয়াছে, কেবল কৌলিক গুরুর মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে, সকল ক্ষেত্রে কার্য্যসিদ্ধির উপায় হইয়া উঠে না। যেখানে উহার একান্ত অভাব হইয়াছে, সেখানে ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য ভিন্ন ধর্ম্ম-সাধন করিবার উপায়ান্তর নাই। যাহাদের ভাগ্য অতিশয় সুপ্রসন্ন, এরূপ কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন, হিন্দু-সমাজের আর সকলকেই সদ্‌গুরুর অভাবে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে।

হিন্দু-ধর্ম্ম যেমন পবিত্রতার পরিচয় দিয়া থাকে, এখন দেশে তেমনই ম্লেচ্ছ-ভাব আসিয়া অপবিত্রতার বীজ বপন করিতেছে। এই অপবিত্রতা দোষ হিন্দুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-লাভের আর একটি প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে অবিশুদ্ধ বীজের সম্মিলন হইলে, যে মহান্ অনর্থ উৎপাদন করে, তাহা অনেকেই অনেক স্থানে দেখিতে পাইতেছেন. এরূপ হইলেও যে, স্থান বিশেষে বিদ্যুতের ন্যায় বিমল-প্রভার সঞ্চার দেখা দিয়াছে, ইহাই বিশেষ পরিতোষের বিষয়। ইহার পরিণাম-ফল ক্রমে যে, কত দূরে যাইয়া মিলিত হইবে, তাহা নিরূপণ করা, এক্ষণে বড়ই দুষ্কর বিষয়; কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় যে, পবিত্র ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রাখিয়া যোগ-মার্গে পদার্পণ করিলে, তাহাতে নিশ্চয়ই কার্য্য-সিদ্ধির উপায় সহজে আসিয়া দেখা দিবে।

একাগ্রতা যোগের প্রধান বিষয়। মনে ঐ একাগ্রতাকে আনিবার জন্য যোগ-শাস্ত্রে বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; তন্মধ্যে নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থান, আসন ও উপবেশন ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য যোগ-সাধনের প্রকৃষ্ট অঙ্গ। সাহেবদের গির্জ্জার ন্যায় প্রশস্ত আয়তনে বেঞ্চি ও চেয়ারে বসিয়া যোগানুষ্ঠান হয় না, উহা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। যেখানে বাহ্যাড়ম্বর প্রবল, সেখানে আসল বিষয় দূরে যাইয়া পড়ে। যোগের স্থান ও বসিবার ভাব বিভিন্ন। অতএব যদি মনুষ্যকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যোগ-পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ হয়, তবে যোগ-শাস্ত্রের অনুরূপ নিয়ম ধরিয়া চলিতে হইবে। এক্ষণে ঐ যোগের বিষয় যথাক্রমে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

২। কর্ম্ম-যোগ।

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

সকল কার্য্যের মূলে চেষ্টা প্রধান বল। কার্য্যে চেষ্টা থাকিলেই তাহা সুসিদ্ধ হয়। কেবল মনে মনে কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে, কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। কোন একটি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে গেলে, তাহাতে যে ক্লেশ, পরিশ্রম, অনুষ্ঠান ও যে যে উপকরণ আবশ্যক হয়, তৎসমুদয়ের একীকরণকে কার্য্য-সিদ্ধির উপায় বা চেষ্টা বলে। যিনি যে কার্য্য করিতে মানস করেন, অগ্রে তাঁহাকে তাহার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। যখন দেখেন, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, তখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে এইটি স্মরণ রাখা উচিত, যিনি ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার সেই কার্য্য-সাধন বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কোন কার্য্য-নির্ব্বাহে সফলকাম হইতে পারে না। হয় ত এমনও হইতে পারে যে, আয়োজন সকল যথাবিধ আহরণ করা হইয়াছে; কিন্তু যিনি ঐ কার্য্য করিবেন, তাঁহার অনভিজ্ঞতা বশতঃ সে কার্য্য যেরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইয়া, ভিন্নরূপে হইয়া উঠিল। ইহাতে জানাইয়া দিতেছে যে, যিনি যে কার্য্য করিতে মানস করেন, অগ্রে তাঁহার সেই কার্য্য বিষয়ক জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক, তাহা প্রস্তুত করিতে, যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সকল বস্তুর আয়োজন করা তেমনই বিধেয়। দ্রব্যের বিভিন্নতা দোষ জন্মিলে, কোন বস্তুর অভিলাষানুরূপ প্রস্তুত করণে প্রতি-বন্ধক আসিয়া পড়ে। কার্য্যের মূলে উপকরণের আয়োজন

ও শিক্ষা-জ্ঞান অপেক্ষা করে। কার্য্যের সঙ্গে পূর্ব্বানুষ্ঠানের যেমন নিকট সম্বন্ধ, অনুষ্ঠানের সঙ্গে উপকরণের সেই রূপ নৈকট্য রহিয়াছে। এই জন্য বলা যাইতেছে যে, যাঁহারা যোগ-মার্গে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, অগ্রে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বানুষ্ঠানের বিধিগুলি শিক্ষা করিতে হইবে, এবং ঐ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে যে উপকরণ সামগ্রী আবশ্যক, সে সকল আহরণ করা বিধেয়।

প্রকৃতি সকল তত্ত্বের আদি গুরু। মনুষ্য যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করে, তাহার মূলে প্রকৃতির আদি তত্ত্ব বিরাজমান রহিয়াছে। প্রকৃতির ভাব ও প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়া, জ্ঞানিগণ তৎসদৃশ বস্তু সংযোগে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা ঐ সকল দ্রব্যের কার্য্য ও গুণ দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়ে। যিনি প্রকৃতির ভাবগতি, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিকট অলৌকিক কোন তত্ত্বই ছাপা থাকিতে পারে না। মনুষ্য-কৃত যে সকল কল-কৌশল, এ সকলই প্রকৃতি-গুরুর স্বরূপ ভাবের আদর্শ মাত্র। তাহার নিজের এমন কিছু ক্ষমতা নাই, যাহা সে প্রকৃতিগুরুর সাহায্য না লইয়া উদ্ভাবন করিতে পারে; সুতরাং আমরা প্রকৃতির স্বরূপ ভাবের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, যে যে বিষয়ের উন্নতি-সাধনে চেষ্টা পাই, তাহাতেই আমাদের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিকাশ পায়। আমরা প্রকৃতির ভাবগতি দেখিয়া, যেরূপ বাহ্য-জগতের উন্নতি-সাধন করিতেছি; তদ্রূপ ঐ প্রকৃতির এমন সব কার্য্য আছে, যাহা দেখিয়া শিক্ষা করিলে, যোগ-মার্গে পদার্পণ করিয়া, অন্তর্জ্জগতের নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারি। প্রকৃতি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র প্রকাশ্যরূপে তাহার নিজভাব সকলকে দেখাইয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার স্বরূপ ভাব সাধারণের অন্তরে প্রতি-ভাত হইয়া উঠে না কেন? ইহার কারণ এই,—যিনি শ্রমসহিষ্ণু,

যাঁহার বুদ্ধি সুতীক্ষ্, জ্ঞানোপার্জ্জনের ভাব অসাধারণ এবং যাঁহার অন্তরে প্রয়োজন বোধ স্থান পাইয়াছে, তিনি যেমন প্রকৃতির সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারেন, প্রয়োজন-জ্ঞানে উদাসীন, জড়বুদ্ধি, অলস ব্যক্তি, কখনই ইহাতে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে মনুষ্যের শক্তি নাই। প্রকৃতি যাহা আপন কার্য্যে দেখাইয়া দেয়, তাহারই ভাব গ্রহণ করিয়া, মনুষ্যের জ্ঞান-বৃদ্ধি পায়, তখন সে তৎসদৃশ নূতনবিধ দ্রব্য বা কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং প্রকৃতিকে সকল কার্য্যের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার কেন না করিব ?

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক, ইহাতেও জানা যাইতেছে যে, যোগিগণ যে সকল মহৎতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, অন্তর্জগতের অভাবনীয় বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন,তাঁহাদের ঐ জ্ঞান ঐ প্রকৃতি-তত্ত্বের স্বরূপ ভাব ভিন্ন, অন্য কিছুই নহে। তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, এই শরীরই ব্রহ্ম-মন্দির এবং এই শরীরের দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; আর প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত গুরু। এই জন্য যোগিগণ স্বভাবের ক্রিয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, যে যে বিষয়ে, যে যে অসাধারণ কার্য্য বা ক্ষমতা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সে সকলের অনুরূপ ফল-লাভের প্রত্যাশা করিয়া, কেবল অভ্যাসের বলে, আপনাদের শরীরকে ঐ ভাবে পরিণত করেন। যখন শরীর প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া উঠিল, তখন উহার কার্য্য-ফলও প্রকৃতির ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যোগিগণ প্রকৃতির স্বরূপ ভাব গ্রহণ করিয়া, আপনাদের অভ্যাসের গুণে, যে সকল মহৎতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল তত্ত্ব যে গ্রন্থে আছে, উহাকেই যোগ-শাস্ত্র বলে। যোগের ক্রিয়া ও উহার

কার্য্য-ফল, সহজ-বুদ্ধির অতীত বিষয়। যাঁহারা প্রকৃতি-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছেন, প্রকৃতির ভাব-গতি,—প্রকৃতির কার্য্য এবং উহার কার্য্য-ফল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; তাঁহারাই যোগীর যোগ-বল ও উহার কার্য্য-ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন।

একবার যোগ-তত্ত্বে প্রবেশ কর, দেখিবে, যোগিগণ প্রকৃতির স্বরূপ-ভাব গ্রহণ করিয়া, কেবল অভ্যাসের গুণে, এই অনিত্য-দেহ লইয়া, কত সুমহৎ-তত্ত্বের বীজ বপন করিয়াছেন, যাহা যোগ শব্দের লক্ষণ লইয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যাইবে।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্তের বৃত্তি সকলকে রুদ্ধ করার নাম যোগ। এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দ্বারা, যোগ শব্দের অন্তর্ভূত সকল বিষয় পরিষ্কার রূপে জানিতে পারা যায় না; এ কারণ যোগিগণ স্বাভাবিক কোন্ বস্তুর কার্য্যকারণ ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, যোগ শব্দের লক্ষণ স্থির করিয়া গিয়াছেন, অগ্রে তাহার বিষয় প্রকাশ করাই উচিত হইতেছে।

"যথার্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তোহুতাশনম্।
আবিঃকরোতি নৈকঃসন্ দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ॥"

সূর্য্যকান্তমণির ক্রিয়াগত ভাব লইয়া, যোগিগণ ঐ যোগ-শব্দের লক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্তমণি, অর্থাৎ যাহাকে আতস পাথর বলে, ঐ পাথর বা কাচের নিজের এমন কোন দাহিকা শক্তি নাই, যাহা কোন বস্তুকে দগ্ধ করে; কিন্তু যখন উহা সূর্য্য-রশ্মির সহিত সম্মিলিত হয়, তখন উহার একটি অসাধারণ দাহিকা-শক্তি আসিয়া দেখা দেয়। উহা সূর্য্যের অভিমুখে নীচ উচুভাবে ধরিবার চেষ্টা পাও এবং উহার নিম্নে

কোন দাহ্য-বস্তু স্থাপন কর, যতক্ষণ উহার ভিতর দিয়া, সূর্য্যের বিস্তৃত-কিরণ পতিত হইবে, ততক্ষণ উহার দাহিকাশক্তি প্রকাশ পায় না। যখন উহা ধরিবার কৌশলে, তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যের বিস্তৃত রশ্মিকে ক্রমসঙ্কোচ-প্রণালীতে অতি সূক্ষ্মরূপে আনিতে পারিবে,—তখন অণুমাত্র রশ্মি সংযোগে নিম্নস্থ বস্তুকে অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারিবে। যোগিগণ সূর্য্যকান্তমণির এই সূক্ষ্মত্ব সম্বন্ধে বহ্নির আবির্ভাব দেখিয়া, এই সিদ্ধান্ত স্থির করেন যে, মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই বাহ্য-বস্তুর প্রতি ধাবিত হইয়া, বিস্তৃত ভাব ধারণ করে; এজন্য তাহার প্রকৃত-কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। যতক্ষণ ঐ মনের বিস্তৃত-ভাব ঘনীভূত হইয়া, সূক্ষ্মত্বে পরিণত না হয়, ততক্ষণ উহার ক্রিয়া-বলের আধিক্য প্রকাশ পাইবে না। এইটি স্থির করিয়া, তাঁহারা বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাদির চেষ্টা রহিত করিবার উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এই জন্য এই ক্রিয়াগত কার্য্যকে যোগ-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যোগের প্রধান কাজ মনকে স্থির করা। যতক্ষণ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর হয়, ততক্ষণ মনের একাগ্রতা জন্মে না। দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিণী বুদ্ধি-বৃত্তিকে সূক্ষ্মত্বে আনিতে গেলে, উহার বিস্তৃত-ভাবের সমতা করা চাই। যখন মনের সমুদয় বল ঘনীভূত হইয়া, অতি সূক্ষ্মত্বে পরিণত হয়, তখনই সেই মনের ক্রিয়া-বলের আধিক্য সুপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। সহস্রমুখীবুদ্ধিকে একমুখী করিতে পারিলে, তাহার যে ক্রিয়াধিক্য হয়, এটি আমরা অনেক কাজে দেখিতে পাই; কিন্তু বিশেষ রূপে ইহার কার্য্যকারণের বিষয় অনুধাবন করিতে না পারাতে, মন প্রকৃত-তত্ত্বে আসিয়া স্থান পায় না। যে সময়ে, আমরা নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকি, মন একবার এক বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অপর বিষয়ে যাইয়া মিলিত হইতেছে, তখন

তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এই অবস্থায় হয় ত আর একটি নূতন বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পূর্ব্ব-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, নূতন বিষয়ের জন্য ভাবিতে থাকিলাম। যখন মন এইরূপ অস্থিরভাবে কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করে, তখন যদি আমাদের এমন একটি বিষয় আসিয়া পড়ে, যাহার ভাল মন্দ বিচার করিয়া, তাহার সদুত্তর বা সুব্যবস্থা করিতে হয়; এমন স্থলে আমরা কি করি? হয় বলা হয়, এ বিষয়টির জন্য অবসরে চিন্তা করিয়া দেখিব; না হয়, অন্যান্য কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, একমনে তাহারই বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে থাকি। যখন একমনে একটি বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হই, তখনই তাহার ভাল মন্দের বিষয় আসিয়া. আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। তখন তাহার সদুত্তর দান ও সুব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমরা লাভ করি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে সদুত্তর ও সুব্যবস্থা, যাহা আমাদের মনে স্থান পায় নাই, এখন তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইল? এই বিষয় ধরিয়া চিন্তা কর, দেখিতে পাইবে যে, পূর্ব্বে আমরা নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, এজন্য আমাদের মন বিস্তৃত ভাবে ছিল, যখনই ঐ বিস্তৃত ভাবকে একাগ্রতা দ্বারা ঘনীভূত করিয়া, সূক্ষ্মত্বে আনিতে পারিলাম, তখনই ঐ মনের বিশেষ ক্ষমতার বল প্রকাশ পাইল। সংসারের কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ কর, দেখিবে, যেখানে যথার্থ একাগ্রতা সম্মিলিত হইয়াছে, সেখানে একটি মাত্র বাহ্য-জ্ঞান বিকাশ পায়। যে, যেরূপ কার্য্যে রত থাকিয়া একাগ্র হয়, তাহার মন তখন অন্য দিকে ধাবিত না হইয়া, কেবল উহাতেই প্রবেশ করে, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্বে দেখা দেয়; সুতরাং কর্ত্তব্য-জ্ঞান সহজে মনে আসিয়া স্থান পায়। এ স্থলে তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। যখন কুম্ভকার ঘটাদি নির্ম্মাণের উপযোগী মৃত্তিকা লইয়া, কুলাল-যন্ত্রের প্রতি

দৃঢ় দৃষ্টি সংযোগে, কোন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে,—যখন স্বর্ণকার কোন অলঙ্কারের নক্সার কারিকুরি করিতে থাকে,—যখন চিত্রকর কোন স্বভাবজাত দ্রব্যের অনুকরণ লইয়া, চিত্র-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে,—যখন কোন যন্ত্রনির্ম্মাতা কোন যন্ত্র-সংযোজন বা তাহার সংস্কার কার্য্যে রত থাকে,—যখন কোন বাদক রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গাহকের সঙ্গে যথাবিধ তাল-মান, লয়-যুক্ত বাদ্য বাজাইতে থাকে,—তখন উক্ত কুম্ভকার প্রভৃতির মনের একাগ্রতা পরিস্ফুট হয়। এরূপ স্থলে যোগিগণের যোগ সাধনের অনুরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাহারা অযোগী হইয়াও যোগীর ন্যায় আপনাপন কার্য্যে প্রকাশ পায়। যোগিগণ যখন যোগ-সাধন করেন, তখন তাঁহারা বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়া পড়েন, অর্থাৎ বাহিরের চতুর্দ্দিকে যে সকল কার্য্য বা দৃশ্য আছে, তাহাতে তাঁহাদের মন ধাবিত হয় না। তদ্রূপ কুম্ভকার প্রভৃতি যখন আপনাদের কার্য্যে মনঃসংযোগ করে, তখন তাহাদের নিকট কেহ উপস্থিত হইলে, তাহাকে দেখিতে পায় না এবং সে সময়ে কেহ কোন কথা বলিলেও শুনিতে পায় না; অথচ তাহারা তখন আপনাপন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। মনের একাগ্রতার কাজ যে অসাধারণ ব্যাপার, এইটিই এ সকলেতে বুঝাইয়া দিতেছে।

যোগ-সম্বন্ধে বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান বা উহার ক্রিয়ার রোধ করার কাজ স্বতন্ত্র। ইহাতে অঙ্গাদির চেষ্টা একবারে রহিত হইয়া আইসে। প্রথম প্রথম যোগকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, যদিও একটি মাত্র বাহ্য-জ্ঞানের বিকাশ থাকে; কিন্তু যখন উহাতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া যায়, তখন বাহ্য-জ্ঞানের কোন শক্তিরই প্রকাশ দেখা যায় না।

কোন কার্য্যে রত হইতে গেলে, অগ্রে যেমন তাহার পূর্ব্বানু-

ষ্ঠান আবশ্যক হয়, তদ্রূপ যোগ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, যোগের পূর্ব্বানুষ্ঠানের প্রতি মন রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। শরীর ও মনের অবস্থা সকলের সমান নহে, কিন্তু যোগ-শিক্ষা শারীরিক ও মানসিক ভাবের উপর অনেকটা নির্ভর করে। যাহার যেমন শারীরিক ও মানসিক ভাব, যোগ-সিদ্ধির বিষয়ে, তিনি তদনুরূপ ফল-লাভ করিয়া থাকেন। কেহ সত্বর, কেহ কিছু বিলম্বে, কেহ তদপেক্ষা আরও বিলম্বে, আর কেহ অতি সুদীর্ঘকালে যোগ-সিদ্ধি লাভ করেন। ফলতঃ কাহাকেই একবারে ইহার ফলে বঞ্চিত হইতে হয় না ; এ কারণ অগ্রে সাধকের শারীরিক ও মানসিক বিষয়ের পরিচয় দেওয়াই উচিত হইতেছে। তৎপরে সাধনের উপযোগী স্থান, পরিধান বসন, বসিবার আসন এবং এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে। যাঁহারা ইহার সবিশেষ জ্ঞান-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে যোগ-শাস্ত্রের অনুশীলন ও কোন কার্য্য-কুশল গুরুর সাহায্য লাভ করা আবশ্যক।

প্রথমে শারীরিক ও মানসিক ভাবের বিষয় প্রকাশ করা যাইতেছে।—

১। যাঁহাদের শরীরে বল প্রচুর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুদৃঢ়, বিশেষ অধ্যবসায় গুণ থাকে, যাঁহারা সৎকর্ম্মশীল, অতিশয় নম্র-প্রকৃতি, দয়া-দাক্ষিণ্য ও উৎসাহ গুণে বিখ্যাত, সকলেরই শুভকামনায় রত, যোগ-শাস্ত্রে যাঁহাদের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, এবং যাঁহাদের শরীরে কোন ব্যাধি নাই, মনে কোন রূপ বিকার নাই, চিত্ত বিশুদ্ধভাবে পূর্ণ, যাঁহারা যৌবন দশায় উপনীত। আর যাঁহারা এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, কোন প্রকার বাধা, বিপত্তি, ভয় ও বিঘ্ন জন্মিলেও আপনাদের অবলম্বিত কার্য্য পরিত্যাগ করেন না ; এরূপ লোকের মধ্যে যাঁহারা কোন শ্রেষ্ঠ

কুলে কিম্বা কোন সিদ্ধ-পুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অতি সত্বর, অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন, এবং ঈদৃশ লোকের সাহায্যে সমাজের বিশেষ কল্যাণ-সাধন হয়।

২। যাঁহারা বীর্য্যবান, তেজীয়ান, অথচ ক্ষমাশীল, স্থিরবুদ্ধি ও অচঞ্চল-স্বভাব, যাঁহাদের মন উন্নত, সুস্থ ও পবিত্র, দেহ নীরোগ, যাঁহারা শাস্ত্রাভ্যাস ও শাস্ত্র-চর্চ্চায় অনুক্ষণ রত এবং শাস্ত্রে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে; এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ ছয় বৎসরের মধ্যে কোন একটি সিদ্ধির অবস্থা লাভ করিতে পারেন।

৩। যাঁহারা পৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করে নাই, শরীরে বলাধিক্য এবং মনে উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণ আছে, বুদ্ধি-বৃত্তির ভাব মধ্যম প্রকার,অর্থাৎ অতিশয় তীক্ষ্ণ ও নহে এবং মৃদুও নহে,—বেশ পরিষ্কারও নহে এবং মলিনও নহে। যাঁহাদের সংসারাসক্তি অধিক নহে। আর যাঁহারা যোগ-কার্য্যের মধ্যম স্থানকে অধিকার করিতে পারিয়াছেন; তাদৃশ ব্যক্তিগণ আট বৎসর পরিশ্রম করিলে, যোগের এক অবস্থা আয়ত্ত করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন।

৪। যাঁহারা বৃদ্ধ ও সর্ব্বদাই ব্যাধিগ্রস্ত, যৌবনে দুর্ব্বল ছিলেন। যাঁহারা ক্লেশ ও শ্রম-সহিষ্ণু নহেন, সর্ব্বদাই গৃহবাসী ও স্নেহ-মমতাদির বশবর্ত্তী, মনে উৎসাহ ও শারীরিক বল যৎসামান্য; ঈদৃশ ব্যক্তিগণ দ্বাদশ বৎসরেও যোগের কোন একটি অবস্থায় সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

সংসারাশ্রমী ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া, যে রূপ নিয়মে যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়া, ভবিষ্যতে তাহাতে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন; যোগ-শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তৎসমুদয় নিম্নে বিবৃত হইল।

সংসারাশ্রমী ব্যক্তি প্রথমে বিদ্যা-শিক্ষা করিবেন, তৎপরে ক্রোধকে পরাজয় করিয়া সত্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং গুরু-সেবা ও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির কার্য্যে রত থাকিবেন। গুরু-সেবা ও পিতা-মাতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিলে, যোগ-শিক্ষায় বিশেষ উপকার দর্শে। ভক্তি-শ্রদ্ধা মনের প্রধান গুণ। যত দিন না মনে ভক্তি-শ্রদ্ধার আধিক্য হইবে, ততদিন যোগের ক্রিয়া-বল প্রকাশ পায় না; সুতরাং সংসারের গুরুজনের প্রতি যাহাতে ঐ সকল বৃত্তির কাজ বিশেষ রূপে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার চেষ্টা পাওয়া, সকলেরই কর্ত্তব্য হইতেছে। এই সময়ে গৃহাশ্রমে থাকিয়া, কোন কার্য্য-কুশল যোগীর নিকট যাইয়া যোগ-শিক্ষা করিতে হইবে। আর যোগ-সাধক যম-নিয়মাদি গুণ সকল যাহাতে আয়ত্ত হইয়া আইসে, এমত চেষ্টা পাওয়া উচিত। এই কালে সংসারের মমতা ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কিছু দিন পরে, কোন উপদ্রব শূন্য, দুর্ভিক্ষ-বর্জ্জিত, ফল-মূলাদি সংযুক্ত প্রদেশে গমন করিয়া, নদী-সন্নিকটবর্ত্তী অথবা অরণ্য মধ্যে একটি পবিত্র স্থান মনোনীত করিতে হইবে। ঐ স্থানে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ও মনের সন্তোষজনক একটি মধ্যমাকার মঠ, অর্থাৎ কুটীর প্রস্তুত করিবে। ঐ কুটীরের চতুর্দ্দিক প্রাচীর বা বেড়া দ্বারা বেষ্টিত করিতে হইবে এবং যাহাতে উহা ছিদ্র শূন্য হয়, তদ্রূপ প্রস্তুত করিবে। গোময় ও মৃত্তিকা সংযোগে উহা যাহাতে সুপরিষ্কৃত থাকে, তাহার চেষ্টা পাইতে হইবে। কোন পর্ব্বত-গুহা বা এই রূপ গুপ্ত স্থানে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করিলে, সিদ্ধি-লাভে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ও শিশির, এই কয় ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে, শরীরে বহুবিধ রোগ জন্মে। এ কারণ যাঁহারা যোগে প্রথম প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে শরৎ ও বসন্ত ঋতু এই দুইটি

প্রশস্ত কাল। যোগাভ্যাস কালে, নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও অঙ্গে শুভ্র ভস্ম বিলেপন করিতে হইবে। তৎপরে বিনম্র ও শুদ্ধ-চিত্তে কুশাসন বা মৃগ-চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া, তদুপরি সিদ্ধাসন কিম্বা পদ্মাসনে বসিবে। পরিশেষে গুরুদেব ও ইষ্ট-দেবতাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরাভিমুখী হইয়া, সমগ্রীব-শির-কায়, অর্থাৎ গ্রীবা, মস্তক ও দেহ-যষ্টি ঠিক সমান ভাবে রাখিতে হইবে,—শরীর কোন দিকে যেন বক্র না হয়। এই সময়ে অধর ও ওষ্ঠ যেন সংযুক্ত থাকে। আর দৃষ্টি-শক্তি মনের সহিত নাসাগ্রে স্থাপন করিবে। প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণাদি শিক্ষার জন্য, এইরূপ নিয়মে বসিতে হয়। আসন সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই,—

"স্থিরসুখাসনম্"

আসনকে জয় করা যোগীর প্রথম কার্য্য। যখন অভ্যাসের বলে, শরীর কম্পিত না হয়, কোন দিকে হেলিয়া না পড়ে, শরীরের কোন স্থানে বেদনা ও মনের উদ্বেগ না জন্মে; তাহাকেই স্থির ও সুখজনক আসন বলে। যখন এইরূপে আসন অভ্যস্ত হইয়া আইসে, তখন যোগার্থীকে আসনে বসার আর কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

প্রাণায়াম ও উহার কার্য্যাদি শরীরে কিরূপে আয়ত্ত করিতে হয়, তদ্বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। প্রথমে আসনকে জয় করা যোগার্থীর প্রধান কাজ। ঐ আসন শাস্ত্র-বিহিত যত্নের দ্বারা অভ্যাস করিতে পারিলে, শরীর উদ্বেগ-শূন্য হইয়া উঠে। চিরাভ্যস্ত আসনে বসিয়া যোগ অভ্যাস করিলে, কোন ফল দর্শে না। এজন্য ঐ পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া, যোগ-শাস্ত্রের অনুরূপ আসনে বসা যত দিন না আয়ত্ত হয়, ততদিন প্রাণায়াম-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। যোগাভ্যাস-সিদ্ধ হইলে, শরীরে

একটি শক্তি ও সহিষ্ণুতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তখন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা অবাধে সহ্য করা যায়। যখন শরীরের এরূপ ভাব জন্মে, তখন হইতে প্রাণায়াম শিক্ষায় যত্নবান হওয়া উচিত।

এক্ষণে ঐ প্রাণায়াম কি? তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। আমরা নাসিকার দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করি, ঐ বায়ুকে প্রাণ-বায়ু বলে। যোগ-শাস্ত্রে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। আমরা নাসিকা দ্বারা বাহিরের যে বায়ু গ্রহণ করি, উহাকে পূরক এবং অভ্যন্তরের যে বায়ু বাহিরে পরিত্যাগ করি, তাহাকে রেচক বলে। আর পূরক ও রেচকের কাজ না করিয়া, যখন আমরা শরীরের প্রবিষ্ট বায়ুকে স্তম্ভন করিয়া রাখি, তখন উহাকে কুম্ভক কহা যায়। এই ত্রিবিধ কার্য্য যোগ-শাস্ত্রে প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদির স্বাভাবিক ক্রিয়াগত কার্য্যকে প্রাণায়াম বলে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক শক্তি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, উহাকে যোগ-শাস্ত্রানুসারে আপনার অধীন করা ও স্থান বিশেষে ধারণ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণ-বায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুল পর্য্যন্ত যাওয়াই তাহার স্বাভাবিক ভাব। গমন কালে ঐ বায়ু ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময়ে ২০, সবেগে চলিলে, অর্থাৎ দৌড়িয়া যাইলে ২৪, নিদ্রা-কালে ৩০, স্ত্রী-সংসর্গ-কালে ৩৬, এবং ব্যায়াম কালে, অপেক্ষাকৃত অধিক দূরে যায়।

নিশ্বাস-বায়ু দেহ হইতে পরিত্যাগ কালে, স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া না যায়, এবং ঐ বায়ু এমনই ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবে যে, নাসিকার সম্মুখে হস্ততলে ছাতু বা সুপিঞ্জিত তুলা রাখিয়া দিলে, উহা যেন উড়িয়া না যায়। এই নিয়মে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে যে সময় লাগিবে, বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিতেও যেন ঐ সময় লাগে এবং ঐ বায়ু শরীরের মধ্যে

ততক্ষণ ধারণ করিয়া, পুনর্ব্বার যেন ঐ ভাবে পরিত্যাগ করা হয়। এই তিন প্রকার কার্য্য যখন শরীরে নিয়মিতরূপে আয়ত্ত হইয়া আইসে, তখনই প্রাণায়ামের কার্য্য পরিষ্কার রূপে শিক্ষা করা হয়। ইহার অন্যথা হইলে আয়ুঃক্ষয় ও বিবিধ রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া উঠে।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক, ইহারা যত মৃদু ভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া কার্য্য করিবে, ততই উহা ভবিষ্যৎ যোগ-সিদ্ধির উপকারী হয়; অর্থাৎ খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস-বায়ু পরিত্যাগ করিতে গেলে, যে দীর্ঘ সময় লাগে, প্রশ্বাস কালে ঐরূপ ধীরে ধীরে বাহিরের বায়ু শরীরে গ্রহণ করিতে যেন ঠিক ঐ সময় লাগে এবং ঠিক ততক্ষণ শরীরের মধ্যে যেন ধারণ করা হয়। যদিও এই তিনটির কার্য্য পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু প্রতিকার্য্যে যেন সময়ের ন্যূনাধিক্য না জন্মে। ধীরে ধীরে প্রত্যেকের কার্য্য করিতে গেলে, যাহাতে সমদীর্ঘকাল প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রাণায়ামাদি কার্য্যের সঙ্গে ব্যায়ামের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ব্যায়াম-শিক্ষার গুণে, শরীরের জড়তা যেমন দূরীভূত হইয়া যায়, আসন ও প্রাণায়ামাদি কার্য্য-কুশলতায় তেমনই শরীরে একটি বল আসিয়া দেখা দেয়। যে শক্তিতে মনুষ্য এই সুদীর্ঘপথে চলিতে সমর্থ হয়, যোগ-শাস্ত্রে উহাকে যোগ-শিল্প বলে। ফলতঃ অভ্যাস ও নিয়মের গুণে যখন এই শিল্প মনুষ্যের আয়ত্ত হয়, তখন যোগ-সাধনের কতকগুলি উপায়কে ব্যায়ামের একটি কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা ভোজবাজী দেখাইয়া থাকে, তাহারা যদিও যোগ-সাধনের কোন সংস্রবে মিলিত হয় না; কিন্তু কুম্ভকের কার্য্যে কুশলতা লাভ করিতে না পারিলে, বাঁশবাজীওয়ালারা দড়ির উপর দিয়া

গমনাগমন ও উহার উপরে 　　　সজোরে ..... খাইতে এবং শূন্যে ভানুমতীর উপবেশন ইত্যাদি কার্য্যে কখনই পারদর্শী হইতে পারিত না। একখানি চাদরের চারি কোণ সজোরে চারি জনে ধরিয়া থাকে, অথচ এক ব্যক্তি উহার উপরে অনায়াসে বিচরণ করে। খড়ম পায় দিয়া, কোন কোন যোগীর নদী পারাবারের কথা যে স্থান বিশেষে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল কুম্ভক শিক্ষার কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা শরীরের অভ্যন্তরে অধিক ক্ষণ বায়ু-রোধ করিবার কৌশলটি বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়াছে, তাহারাই সাধারণকে এইরূপ নানাবিধ অদ্ভুত কার্য্য দেখাইতে পারে। এই কুম্ভক শিক্ষার বিবিধ উপায় যোগ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে, সেগুলি এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

কুম্ভক, বিশিষ্ট রূপে আয়ত্ত হইলে শরীর যে কেবল লঘু হয়, এমনও নহে। এ অবস্থায় দীর্ঘকাল অনাহারজনিত ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট আসিয়া, দেহের কোন অপকার ঘটাইতে পারে না। যে প্রাণী যত শীঘ্র শীঘ্র নিঃশ্বাস-বায়ু পরিত্যাগ করে, তাহার জীবন-কাল তত সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে এবং শরীর নিস্তেজ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং শরীর-পোষণের জন্য প্রতিদিন উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভেক, কচ্ছপ ও সর্পগণ শীতকালে গর্ত্তমধ্যে আশ্রয় লয়,— একাদি ক্রমে কয়েক মাস ধরিয়া অনাহারে থাকে; তথাপি তাহারা অনায়াসে জীবন ধারণ করে। যোগিগণ ইহা দেখিয়া এইটি অবধারণ করিয়াছিলেন যে, নির্ব্বাত-স্থানে থাকা ও শরীরের অভ্যন্তরে আকৃষ্ট বায়ুকে অধিকক্ষণ রোধ করিবার শক্তি অভ্যাসগত হইলে, শরীরে এমন একটি শক্তি জন্মে, যাহাতে দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও কোন কষ্ট অনুভূত হয় না;

অধিকন্তু পরমায়ুও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই জন্য তাঁহারা নির্ব্বাত-স্থান, অর্থাৎ পর্ব্বত-গুহা কিম্বা তৎসদৃশ কুটীরকে যোগ-সাধনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যেখানে বায়ু চলাচলের কার্য্য যৎসামান্য, তথায় বাহিরের শৈত্য ও উষ্ণতার প্রকোপের ভাগ বেশি প্রকাশ পায় না; সুতরাং শরীরের উত্তাপ সমভাবে থাকে। এজন্য তথায় যাহারা বাস করে, তাহারা সহজেই কুম্ভকের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত জন্তুগণের কুম্ভকের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা জন্মে বলিয়াই তাহারা জড়-ভাবাপন্ন হইয়া অনাহারে অনায়াসে থাকিতে পারে। এক কুম্ভকের গুণে যখন উহাদের এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তখন যাঁহারা পূরক, কুম্ভক ও রেচক, অর্থাৎ প্রাণায়াম-কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের যে ক্ষমতা আরও অত্যদ্ভুত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

যোগিগণ এক কুম্ভক শিক্ষা করিতে গিয়া, উহার ভিতরে কত সুমহৎ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয়কে ধর্ম্ম-জগতের প্রবেশ-দ্বার বলিলে, কোন মতেই অত্যুক্তি হইতে পারে না। কেবল কুম্ভক শিক্ষা করিলে, কেহই প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা হঠযোগ বা ভেল্কী খেলা প্রভৃতি নিকৃষ্ট-যোগ অভ্যাস করিয়া, সাধারণ লোককে মোহিত করিতে চেষ্টা পায়, তাহাদের পক্ষে, এই কুম্ভক কেবল প্রধান অবলম্বনীয়। কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্ববেত্তারা প্রাণায়ামকেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যেহেতু প্রাণায়ামে সিদ্ধ না হইলে, কাহারও অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিবার সম্যক্ অধিকার জন্মে না।

যোগ-মার্গে প্রবেশ করিতে গেলে, প্রথমে বসিবার আসন ও প্রাণায়াম শিক্ষা করা যেমন আবশ্যক; তদ্রূপ আর কতকগুলি

বিষয় আছে, যাহা বিহিতরূপে শিক্ষা ও প্রতিপালন না করিলে, যোগ-সাধনে সম্যক্ ফল-লাভ করা যায় না। ইহাদের কোন কোনটি যোগ-সাধনের প্রধান উপায়, আর কোন কোনটি পরম্পরা সম্বন্ধে উপকারক হয়। নিম্নে সেগুলি প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। অহিংসানুষ্ঠান,—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" কেবল প্রাণী-বধ পরিত্যাগ করিলে, অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। তুমি যদি সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে পরহিংসায় সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিতে পার, তবেই তোমার অহিংসানুষ্ঠান প্রকৃত রূপে সম্পন্ন করা হয়। নর-হত্যা হইতে বিরত থাকিয়া, অপর প্রাণীকে যাতনা দিলেও এ ব্রত পালন করা হয় না। কেহ গো-হত্যা করেন না, কিন্তু ছাগ-মেষাদির বংশ নাশ করেন,—কেহ পশু-বধ করেন না, কিন্তু পক্ষী-বধ করেন,—কেহ পক্ষী-বধ না করিয়া, কেবল মৎস্য বধ করেন। এরূপ কার্য্যেও অহিংসার যথার্থ কাজ প্রকাশ পায় না। যিনি সকল প্রাণীতে আত্মবৎ দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ আমাকে কেহ যাতনা দিলে, আমি যেমন কষ্ট বোধ করি; তদ্রূপ অন্যকে কষ্ট দিলে, সেও তদনুরূপ যাতনা অনুভব করে। যিনি এরূপ অহিংসভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁহার এ জগতে কোন শত্রুভাব থাকে না। তিনি যদি সিংহ-ব্যাঘ্র ও সর্পাদিসঙ্কুল গহন-বনে বাস করেন, সেখানে তাহারাও তাঁহার কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না। আমরা যাহাদিগকে হিংস্রজন্তু জ্ঞান করি এবং উহাদের প্রতি যদি হিংসা করিতে মনে মনে বাসনা রাখি, তাহা হইলে, আমাদের মুখ-মণ্ডলে ঐ হিংসার আবির্ভাব দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত জন্তুগণ আমাদিগকে হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যদি আমরা আপনাদের হিংসা-প্রবৃত্তিকে একবারে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদের মুখমণ্ডল একটি অপূর্ব্ব শোভায়

শোভিত হয়; তাহা দেখিলে আর আমাদের কোন জীব-জন্তু হইতে আক্রমণের ভাবনা থাকে না,—সমস্ত-জগৎ মিত্রভাবে পরিণত হয়। স্বভাবের এই বিচিত্র ভাব আছে বলিয়াই, ঋষি ও যোগিগণ নিবিড় অরণ্য মধ্যে একাকী থাকিয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদের তপস্যা-ব্রতপালনে সমর্থ হইয়া থাকেন।

অনেকে শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক ও রসনার তৃপ্তিসাধনের জন্য মৎস্য-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ মনে করেন না। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এ বিষয়ে আর একটি মত প্রকাশ করেন, যাহা এস্থলে বলাও উচিত হইতেছে। তাঁহাদের মত এই,—নিজকৃত হিংসা দূষ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্যে আমাদের আহারাদি প্রস্তুত জন্য যে জীব-হিংসা করে, তাহা আমাদের কৃত পাপের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কিন্তু এটি বিষম ভুল। তোমাদের আশ্রিত ও প্রতিপালিত অথবা তোমরা যাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হও, ইহাদের মধ্যে যে কেহ তোমাদের আহারাদি প্রস্তুত জন্য জীব-হিংসা করে, এটি যেমন অপরের দ্বারা কৃত বলিয়া বোধ কর; কিন্তু তোমরা যদি ঐ সকল দ্রব্য খাইতে ভাল না বাসিতে, অথবা ঐ কার্য্যে তোমাদের যদি অনুমোদন ও সাহায্য না থাকিত, তাহা হইলে, তাহারা কখনই জীব-হত্যায় প্রবৃত্ত হইত না। অতএব তোমাদের আশ্রিত, প্রতিপালিত যে লোকের দ্বারা কেন ঐ জীব-হিংসা করা হউক না, তাহাতে অহিংসার ভাব কৈ প্রকাশ পায়? প্রকারান্তরে জীব-হত্যার যে দোষ, তাহা তোমাদের প্রতি বর্ত্তে কি না বিবেচনা করিয়া দেখ।

ভারতবর্ষ যে প্রকার বহুবিধ পুষ্টিকর শস্য ও ফল-মূল পরিপূর্ণ দেশ, এখানে আমিষ বিনা কেবল উদ্ভিজ্জে অনায়াসে জীবনোপায় সম্পন্ন হইয়া উঠে। আর উদ্ভিজ্জ-ভক্ষণে যেমন শারীরিক বল-বীর্য্যের আধিক্য হয়, এবং সৎপ্রবৃত্তির

বিকাশ হইতে থাকে, আমিষ ভক্ষণে তেমনই বিস্তর বাধা-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হওয়া, মনুষ্য-জীবনের প্রধান কাজ বিবেচনা কর, তবে এক আহারের দোষে, ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়া, বড়ই শোচনীয় বিষয়। যাঁহারা খাদ্য-বিচার না করিয়া, হিংসার অনুকূল পথে চলেন তাঁহারা ধর্ম্ম-পথের বিস্তর দূরে যাইয়া পড়েন। অতএব যাহা　　　　বিষবৎ পরিত্যাগ করা ধর্ম্মার্থীর প্রধান কাজ।

২। সত্যানুষ্ঠান,—সত্য, আদি ও অনাদি কালের একমাত্র সাক্ষী,—সত্য, ধর্ম্মের স্বরূপ ভাব,—সত্য, ধর্ম্ম-প্রকাশক,—সত্য, প্রকৃতি-রূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে,—আর ঐ সত্যই সকলের আদি কারণ। যিনি সত্যের যথার্থ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নিকট এই সত্য সুপ্রকাশিত হয়। যিনি আপদে, বিপদ ও সম্পদে সকল অবস্থাতে সত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন,—যেমন দেখা, যেমন শুনা ও যেমন বুঝা ঠিক তদনুরূপ ধরিয়া চলাই যথার্থ সত্যানুষ্ঠানের কাজ। সত্যের সঙ্গে সারল্যের এবং অসত্যের সঙ্গে ছলনা, কুটিলতা ও দুরভিসন্ধির নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। যথার্থ সত্য, নিজের যেমন হিতকারী, সমস্ত জগতের তেমনই প্রধান অবলম্বনীয়। সত্যহারা লোকের দুঃখ দুর্গতির আর অবধি থাকে না। যিনি স্বার্থের জন্য, কি আত্মীয় স্বজন, কি বন্ধুবর্গের অনুরোধে, সত্যে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের সকল　　লুক্কায়িত থাকে। ঈশ্বর মনুষ্যকে বাক্-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে, সত্য কি মিথ্যা যাহা তাহার অভিরুচি হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারে। যত দিন না মনুষ্য সত্যানুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তত দিন তাহার বাক্-শুদ্ধি হয় না এবং সত্য-ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে অধিকার জন্মে না।

৩। অচৌর্য্যানুষ্ঠান,—লোভ সকল অনর্থের মূল। লোভকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, মনের উদারতা জন্মে না। চৌর্য্যাদি যে এত নীচ কাজ, লোভ তাহারই মূল। যিনি বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের প্রেম-ডোরে আপনাকে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, জগতে এমন কোন বহু মুল্য বস্তু নাই, যাহা দেখিয়া, তাঁহার মনে লোভ জন্মিতে পারে। যাহারা বিষয়ে আসক্ত, বিষয় দেখিলেই, তাহাদের মন সেই দিকে ধাবিত হয়। যাহার ঐ বৃত্তি অতিশয় প্রবল, সে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া, পর-দ্রব্য অপহরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা, ধর্ম্মার্থে একটি প্রধান কাজ। যিনি স্পৃহা-শূন্য, তিনি অগ্রে লোভ রিপুকে পরাজয় করিয়া লয়েন, তাঁহার নিকট পর-দ্রব্য যে লোষ্ট্রবৎ বোধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

৪। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান,—শরীর ও মন সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট না থাকিলে, কেহই যোগ-কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না। যে যে কারণে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়, তন্মধ্যে বীর্য্য-ক্ষয় তাহার একটি প্রধান কারণ। যাঁহার কণামাত্রও বীর্য্য কোন রূপে বিকৃত ও বিচলিত হয় না,—ভ্রমেও কামোদয় হয় না এবং স্বপ্নেও বীর্য্যস্খলন হয় না, তাঁহারই বীর্য্য-নিরোধের কার্য্য যথার্থ রূপে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। যিনি পূর্ণ-যৌবনা রূপ-লাবণ্যবতী প্রমদাগণের অযাচিত প্রলোভনরূপ মৃদু-মধুর হাস্য-জাল,—নয়ন-দ্বয়ের তীব্র-লক্ষ্য এবং ভ্রূ-ভঙ্গী রূপ সুতীক্ষ্ণ-বাণে আহত না হইয়া, অবিচলিত-চিত্তে ধর্ম্মাচরণে আসক্ত থাকেন, তিনিই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনের উপযুক্ত পাত্র। বীর্য্যের আর একটি নাম চরম-ধাতু। যিনি আজীবন, এই ধাতু অব্যাহত রাখিয়া, সম্পূর্ণ সংযমী হইতে পারেন, তাঁহারই যোগ-বল অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

৫। অপরিগ্রহানুষ্ঠান,—বাহ্য-বস্তু সকল যেমন আমাদের

ভোগের উপকরণ, তদ্রূপ আবার এই শরীর, মনের উপভোগের উপকরণ বিশেষ। আমরা বাহ্য-বস্তুর ভোগ, শরীরের দ্বারা করিয়া থাকি ; এ কারণ বাহ্য-বস্তুকে শরীরের উপকরণ বলে। কিন্তু আমাদের মন, ঐ ভোগ শরীরের দ্বারা করিয়া থাকে, এজন্য শরীরকেও মনের উপভোগের উপকরণ বলা যাইতে পারে। যখন মন বাহ্য-বস্তুর উপভোগ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে অভ্যাসের বলে দৈহিক উপভোগও পরিত্যাগ করে, তখনই অপরিগ্রহানুষ্ঠানের ব্রত পালন করা হয়। যখন বাহ্য ও দৈহিক উভয়বিধ উপভোগ পরিত্যক্ত হয়, তখন মনে আত্মানুসন্ধানের ভাব আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ আমি কে ? আমি কোথায় ছিলাম ? কোথা হইতে আসিলাম ? আমার কার্য্য কি ? আমি কোথায় যাইব ? ইত্যাকার বিবিধ প্রকার প্রশ্ন আসিয়া মনে স্থান পায়। চিত্ত-শুদ্ধির এই একটি প্রকাশ্য লক্ষণ। যতক্ষণ মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধি না জন্মে, ততক্ষণ মন কেবল বিষয়াদির উপর ঘুরিয়া বেড়ায় এবং শরীরের দ্বারা উহাদের উপভোগের চেষ্টা পায় ; তখন মন প্রকৃত-তত্ত্বে আসিয়া স্থান পায় না। যখন মন সকল ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া,বা উহাতে বিরত হইয়া কেবল আত্মানু-সন্ধানে রত হয়, তখনই উহা হৃদ্‌পদ্মে আসিয়া, স্থিরভাব ধারণ করে। এখন হইতে ঐ মনের বল দিন দিন এমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাহার ক্রিয়াবল দেখিলে, অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ জগতে অসাধারণ ব্যাপারের কার্য্য কিছুই নাই ; তাহা কেবল প্রকৃতির সূক্ষ্ম বা প্রকৃত ভাব প্রকাশক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা সহজ বুদ্ধির অতীত বিষয়, তাহাকেই লোকে অসাধারণ বিষয় বা কার্য্য বলিয়া থাকে। দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিণী বুদ্ধি-বৃত্তিকে সূক্ষ্মত্বে আনিতে পারিলে, তাহার ক্রিয়াফল যে অসাধারণ রূপে প্রকাশ পায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ কারণ তখন ঐ মনের এমন একটি শক্তি জন্মে, যাহাতে মানুষ আপনার জন্মের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত, জীবনের অতীত বিষয় এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে। যখন মনের এই বিশেষ ক্ষমতাটি জন্মে, তখনই জানিবে যে, অপরিগ্রহানুষ্ঠানের প্রকৃত কাজ সিদ্ধ হইল।

যোগ-শাস্ত্রে অহিংসাদি পাঁচটি অনুষ্ঠানকে যম নামক যোগাঙ্গ বলে। যম শব্দে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিবৃত্ত বা দমন করা বুঝায়। যখন কোন যোগার্থীর বসিবার আসন আয়ত্ত হইয়া আইসে, প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইয়া উঠে এবং যমানুষ্ঠান সকল, কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম নামক যোগাঙ্গ আসিয়া স্থান পায়। এক্ষণে ঐ নিয়ম নামক যোগাঙ্গের বিষয় বলা যাইতেছে।

নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ। বাহ্য-শৌচ যেমন অন্তঃশুদ্ধির কারণ, অন্তঃশুদ্ধি তেমনই বাহ্য-শুদ্ধির প্রকাশক। মল-মূত্র পরিত্যাগের পর অঙ্গাদি ধৌত করা, আহারান্তে মুখ ও হস্তাদি প্রক্ষালন করা এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান, স্নানের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন, ও উপবেশনের অগ্রে পদ-দ্বয় ধৌত করা, বাহ্য-শুদ্ধির কার্য্য। আর দুষ্প্রবৃত্তি-সমূহকে একবারে দমন করিয়া, সৎপ্রবৃত্তি-সমূহকে উত্তেজিত করা, অন্তঃশুদ্ধির প্রধান কাজ। যখন শরীরে বাহ্য-শৌচ অভ্যস্ত হইয়া আইসে, তখন নিজের শরীরের প্রতি এক প্রকার তুচ্ছ-জ্ঞান বা ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়,—নিজের শরীরের প্রতি কোন প্রকার আস্থা ও আদর থাকে না এবং পর-সঙ্গেচ্ছা পরিত্যাগ পায়। সুতরাং অনাকুলিত-চিত্তে বাধা-বিপত্তি-শূন্য হইয়া, একমনে যোগ-কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়। ক্রমে মন যখন বিশুদ্ধ-সত্ব হইয়া উঠে, তখন তাঁহার একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও আত্ম-দর্শন-ক্ষমতা জন্মে,—চিত্তে অভূতপূর্ব্ব সুখ ও সচ্চিদানন্দের

প্রকাশ দেখিতে পান। সে চিত্তের যখন এ প্রকার অবস্থা জন্মে, তখন বাহিরের কোন প্রকার দুঃখ-শোক আসিয়া, তাহাকে কাতর করিতে পারে না। তিনি সদাই তৃপ্তিসুখের অধিকারী হয়েন।

শ্রদ্ধা-ভক্তি,—ভক্তজনের প্রধান গুণ। আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি যেমন প্রীতিকর ও আশুফলপ্রদ, বাহ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি তেমনই অশেষবিধ অনিষ্টোৎপাদক। যে ব্যক্তি বাহ্য শ্রদ্ধা-ভক্তির আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হয়, তাহার ন্যায় কাপুরুষ জন-সামাজে আর দেখা যায় না। যে শ্রদ্ধা-ভক্তি মনুষ্যের প্রধান গুণ, তাহাতে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত নহে। শ্রদ্ধা-ভক্তি-শূন্য ধূর্ত্ত ব্যক্তি সমাজের প্রধান শত্রু। সে সাধারণ ব্যক্তির নিকট পরম সাধু এবং ধর্ম্মাত্মার নিকট ছদ্ম-বেশে তাঁহার প্রিয়-পাত্র হইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু সে এটি একবার অনুধাবন করিয়া দেখে না যে, কয় দিন তাহার অন্তরের এ ভাব অপ্রকাশিত থাকিতে পারে? যখন সত্য তাহার অন্তরের ভাবকে দেখাইয়া দেয়, তখনই অসত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির কাজ, মনুষ্যের বিশেষ গৌরবের বিষয়। যাঁহার মনে ইহার বীজ একবার অঙ্কুরিত হইয়াছে, সহস্র বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলেও, তাহা অবাধে বর্দ্ধিত হইয়া অমৃত-ফল প্রসব করিতে বিরত হয় না। শ্রদ্ধা-ভক্তি সাধকের প্রধান বল,—শ্রদ্ধা-ভক্তিই ঈশ্বরকে লাভ করিয়া দিবার একমাত্র সম্বল। ভক্তি বিনা জীবের মুক্তি ঘটিয়া উঠে না এবং শ্রদ্ধা বিনা ভক্তির আধিক্য প্রকাশ পায় না। যেখানে ভক্তি-শ্রদ্ধা দুই একত্র সম্মিলিত হয়, সেই খানেই ইহাদের ক্রিয়াফল বিশেষরূপে সুপ্রকাশিত হয়। মরু-ভূমির যেমন অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি থাকে না, শ্রদ্ধাহীন ভক্তি-বিহীন অন্তর, তেমনই বিশুষ্ক ও বিদগ্ধভাবে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে কখনই ব্রহ্ম-বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। ভক্তি শ্রদ্ধার

গুণে, ভক্ত-জনের যে হৃদয় প্রেমাশ্রু-নির্ঝরে সদাই সরস ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই পবিত্র-পুণ্য-ক্ষেত্রই পরম পিতার অধিষ্ঠানের প্রশস্ত আয়তন।

অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধার গুণে, মনুষ্য যে অভাবনীয় ফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়, এ সংসারে তাহাদের পরমারাধ্য পিতা-মাতা ও গুরুজনগণ ইহার প্রধান কারণ। মনুষ্য যখন নিতান্ত শিশু ছিল, তখন সে তাহার পিতা-মাতার স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে প্রথমে শিক্ষা করে, তৎপরে শিক্ষা-গুরু ও ধর্ম্ম-গুরুর প্রতি ঐ দুইটি বৃত্তি যাইয়া অধিকতর উজ্জ্বল হয়। যতক্ষণ না উহাদের প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠান হয়, ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। যখন উহা কার্য্যে পরিণত ও নিতান্ত বিশুদ্ধভাবে উপনীত হয়, তখন যিনি সকলের পিতার পিতা, মাতার মাতা ও গুরুর গুরু, তাঁহার প্রতি উহা না যাইয়া আর থাকিতে পারে না। এই সময়েই মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধার কাজ সফল হয়। এখন মানুষের কি সৌভাগ্যের দশা! এখন তাহার সুখ-শান্তির অন্ত নাই। এখন মানুষ নিয়তই উদ্বেগ শূন্য হইয়া, পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। চিরসন্তোষ তাহার প্রধান বল, আর অতুলানন্দ তাহার প্রধান বিষয়।

প্রত্যাহার,—বাহ্য-বিষয়ে ব্যাসক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার আয়ত্ত করা, অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহাদের প্রতি ধাবিত হয়, অথবা আসক্ত হইতে যায়, তখন তাহাদের ক্রিয়াভঙ্গ করিয়া দিয়া, ফিরাইয়া লওয়া বা মনকে সংযত করাকে প্রত্যাহার বলে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যাহাতে আপনার আয়ত্ত হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া যোগের একটি প্রধান বিষয়। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়চাপল্য থাকে, ততক্ষণ

যোগ-মার্গে প্রবেশ করা যায় না। মনকে স্থির করা, যখন যোগের একটি প্রধান কাজ, তখন ঐ মনের বিস্তৃত-ভাব যাহাতে সমতা পাইয়া সূক্ষ্মত্বে আইসে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিশেষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও বিশেষ অভ্যাসের বলে, ক্রমে মন এই ভাবে পরিণত হইয়া আইসে। দুই দিন অথবা দুই মাস ধরিয়া অভ্যাস করিলে, কাহারও এ বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। একাদিক্রমে নিয়ত যোগের অন্যান্য নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে থাকিলে, ক্রমে মনের ঐ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন চক্ষের উপভোগ্য বিষয়, রূপ ও বর্ণ, তাহার সম্মুখে বিদ্যমান থাকিলেও তৎপ্রতি দৃষ্টি যায় না এবং কর্ণের উপভোগ্য বিষয় শব্দ আসিয়া শ্রবণ-জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় না; এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের যে যে উপভোগ্য বিষয় আছে, সে সকল বর্ত্তমান থাকিলেও মন সে সকলে আর আকৃষ্ট হয় না,—তোমার মন তোমারই একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলে; তখনই জানিবে যে, তোমার প্রত্যাহার অনুষ্ঠান সিদ্ধ করা হইল। প্রত্যাহার সিদ্ধ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। যখন কোন যোগীর ইহা সিদ্ধ হইয়া উঠে, তখন ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সুসিদ্ধি বিষয়ে, তাহার বেশি প্রয়াস পাইতে হয় না,—উহারা আপনা হইতে সহজেই আসিয়া দেখা দেয়।

ধারণা, ধ্যান, সমাধি,—যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যানুষ্ঠান ও অভ্যাস দ্বারা মন আপনার আয়ত্ত হয়,তখন ঐ মনকে স্থানবিশেষে আবদ্ধ করার নাম ধারণা। কেহ নাসাগ্র, কেহ ভ্রূ-মধ্য-স্থানে, কেহ হৃৎপদ্মে, কেহ নাড়ী-চক্রে প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে অথবা কেহ জড় কিম্বা কোন সমুজ্জ্বল সুন্দর মূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য-বস্তুতে মন ধারণা করে। এই ধারণা এরূপ প্রযত্ন সহকারে করিতে হয়, যেন উহা আর কোন রূপে অন্যত্র না যাইতে পারে। মনকে স্থির করিতে গেলে, এই ধারণার বল এমনই প্রবল হওয়া

চাই যে, যাহার মনে এই ধারণা গুণ জন্মিয়াছে, তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সে আপনার মনকে কোন এক স্থান বিশেষে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যখন ঐ মন দৃঢ়রূপে আপনার দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিতে থাকে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর কোন ভিন্ন স্থানে যাইতে পারে না, তখনই জানিবে যে, সে আপনি আপনার মনকে বাঁধিবার কাজ করিয়া লইয়াছে। এই ধারণা যখন প্রগাঢ় হইয়া আইসে, অর্থাৎ একাদিক্রমে বহুক্ষণ মনের ঐ একাগ্রতা জন্মাইয়া দেয়, তখন তাহাকে ধ্যান বলে। আবার এই ধ্যানের পরিপক্কতার সঙ্গে সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাধির সঙ্গে ধ্যানের এই ইতর বিশেষ, ধ্যান কালে অহং জ্ঞান, অর্থাৎ আমি এ বোধ যদিও থাকে; কিন্তু সমাধি কালে অহং জ্ঞান একবারে লোপ পায়। তখন কেবল ধ্যেয় বস্তুকেই প্রকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ মন ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার মন আছে কি নাই বলিয়া বুঝা যায় না। এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সমবেত ক্রিয়াগত ভাব যোগ-শাস্ত্রে **সংযম** বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই সংযম যখন সিদ্ধ হইয়া আইসে, তখন জ্ঞানালোক প্রতিভাস্বিত হইয়া যোগীর যোগ-বল বৃদ্ধি পায়। কত চেষ্টা, কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কত অভ্যাসের গুণে যে বল লাভ করা যায়, তাহার ক্ষমতা যে অসাধারণ ও অভাবনীয়, এ সকল কেবল পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে; এই জন্য ইহাদিগকে কর্ম্ম-যোগ বলা হয়, এই কর্ম্ম-যোগ ধর্ম্ম-যোগের মূল ভিত্তি। যাহার কর্ম্ম-যোগ জয় করা হয়, তাহার নিকট ধর্ম্ম-যোগের সকল তত্ত্বই অবাধে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক্ষণে ঐ ধর্ম্ম-যোগ কি? তাহার বিষয় প্রকাশ করা যাইতেছে।

৩। ধর্ম্ম-যোগ।

ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছা ও তাঁহার প্রীতি-কামনার উদ্দেশে কার্য্যানুষ্ঠান করা, মনুষ্যের একটি স্বভাবসিদ্ধ ভাব। এই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া মনুষ্য, যে, যেরূপ কার্য্য করিতে রত থাকে, তাহা তাহাদের ধর্ম্মভাব বলিয়া উক্ত হয়। মনুষ্য মাত্রেই কোন না কোন রূপ ধর্ম্ম-ভাব অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করে; কিন্তু সকলের ধর্ম্ম-ভাব একরূপ নহে। এ কারণ দেশ, কাল, পাত্র বিশেষে ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমি যে কার্য্য, ধর্ম্মোদ্দেশে করিয়া থাকি, হয় ত তুমি তাহার বিরোধী এবং তুমি যাহা ধর্ম্মোদ্দেশে কর, তাহা দেখিয়াও আমার মনে নানা প্রকার সংশয় আসিতে পারে। তবেই দেখ, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বত্র একরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

সকল দেশের ও সকল জাতির ধর্ম্ম-ভাব লইয়া বিচার করা, আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যন্তরীণ নিগূঢ় ভাব সকল লইয়া বিচার করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দু-ধর্ম্ম, একটি নূতন ধর্ম্ম নহে। যে হিন্দু-ধর্ম্ম ধর্ম্মোন্নতির মূল অধিকার লাভ করিয়া, ধর্ম্ম-জগতে বিশুদ্ধতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, সেই হিন্দু-ধর্ম্ম সাকার ও নিরাকার ভেদে দুইটি প্রধান উপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। যদিও এই দুই সম্প্রদায়ের মতামত অনেকটা বিভিন্ন; কিন্তু কেহই ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, চলিতে ইচ্ছা করে না। ধর্ম্মের সঙ্গে ঈশ্বরের যে যোগাযোগ, তাহার কিছুই ব্যতিক্রম

হয় না। যে বালক অকারাদি স্বর ও ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখিতে শিক্ষা করে, তাহাকে প্রথমে অবশ্যই হস্তের জড়তা দূর করিবার জন্য হাঁড়ি, কলসী, টাকা, আধুলি প্রভৃতি হিজিবিজি লিখিতে হইবেই হইবে। যখন ঐ হস্তের জড়তা নিবারিত হইয়া আইসে, তখন তাহাকে দাগা বুলাইতে হয়। দাগার লিখিত বর্ণগুলির উপর লিখিতে লিখিতে, যখন বর্ণ সকলের আকারগত ভাব, মমে কতকটা আয়ত্ত হইয়া আইসে, তখন কেবল আদর্শ-লিপি সম্মুখে রাখিয়া, তাহা দেখিয়া লিখিতে থাকে। কিছু দিন পরে, ঐ আদর্শ-লিপির সাহায্য বিনাও সে অনায়াসে লিখিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব জ্ঞাত হওয়া, ঠিক ঐ শিশুর লিখিতে শিখার অনুরূপ বিষয়। কেহই এক-বারে তাঁহার মহৎ তত্ত্ব ও প্রকৃত ভাব মনে অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না।

মনুষ্য অভ্যাসের দাস। সে কিছু দিন ধরিয়া যাহা দেখে, যাহা শুনে, সেই ভাব তাহার মনে যাইয়া অঙ্কিত হয়। যখন উহাদের অবিদ্যমানে, কেবল মানসিক শক্তির বলে ঐ দেখা শুনার অবিকল ভাব, সে আরত্ত করিয়া লইতে পারে, তখন তাহার সম্মুখে ঐ আকার বিশিষ্ট দ্রব্য ও প্রতিঘাতাদি সমুত্থিত শব্দ থাকা না থাকা দুই সমান। মনের এই সাধারণ ক্ষমতার বিষয় ধরিয়া, একবার স্থির-চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখ, যদিও সাকারবাদীরা প্রথমে কোন রূপাদি বিশিষ্ট দ্রব্য আপনাদের সম্মুখে রাখিয়া, তাহাকে ঈশ্বর বোধে দর্শন ও মন্ত্রাদি উচ্চারণ করতঃ ভক্তিভাবে তদ্গত চিত্তে তাহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মন ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হয় কি না? কোন রূপাদির প্রতি এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ দর্শনের গুণে, অথবা ওঙ্কারাদি ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিবার কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে, সহজেই মনের ঐকাগ্রতা

জন্মাইয়া দেয়। ক্রমে ঐ একাগ্রতা সমাধির ন্যায় কার্য্য-সাধক হইয়া উঠে; সুতরাং তখন তাহার বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়া, অন্তর্জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তখন সে সাকার উপাসক হইয়াও নিরাকারবাদীদের সমতুল্য হইয়া পড়ে। ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহাতে আকারের আরোপ করা অসঙ্গত; এটি সত্য হইলেও, যখন ধ্যান-ধারণার বেগ প্রবল হইয়া উঠে, তখন সাকারের ভাব, তাহাদের মনে কৈ স্থান পায়? এ কারণ বলা যাইতে পারে, সাকারবাদী-রাও বিধর্ম্মাক্রান্ত নহে এবং নিরাকারবাদীরাও স্বয়ংসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা নহেন। যিনি ধর্ম্মের পথ ধরিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ধর্ম্ম-ভাবে উন্নত হয়েন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা এবং তাঁহারই ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ কার্য্যসাধক হইয়া উঠে।

তুমি যদি সাকারবাদী হও, তোমার কার্য্যানুষ্ঠানের পরিণাম ফলে, তুমি যেখানে যাইয়া উপস্থিত হইবে, আমি নিরাকারবাদী হইয়াও সেই স্থানে যাইয়া মিশিব। অতএব তোমায় আমায় কি প্রভেদ রহিল? তুমি যাহাতে একাগ্র হইতে পার, তাহারই জন্য একটা না একটা কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা পাও, আমিও কোন না কোন উপায় ধরিয়া, তদ্বিষয়ে রত থাকি। ঈশ্বরকে লাভ করার কার্য্যে, যখন ঐ একাগ্রতা উভয়েরই মূল বিষয়, তখন তোমার কার্য্য ও আমার উপায়, এ দুয়ের যদি ঐক্য না হয়, তাহাতে পরস্পর বাক্‌বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে এ বিষয়ে কেবল এইটি দেখা আবশ্যক, ঐ একাগ্রতার বল কিসে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পারে। ঈশ্বরকে লাভ করা, কোন মতামতের উপর তত নির্ভর করে না, যত আমাদের মানসিক কার্য্যানুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন, তিনি যদি দুইটা কথার লভ্যের বিষয় হইতেন, তবে মনের একাগ্রতা সাধন জন্য, কেন এত

প্রয়াস পাইতে হয়? যে নিয়ম-প্রণালী ও সাধনের গুণে, মনে একাগ্রতা জন্মে,—যাহাতে বাহ্য-বস্তুর ভাব অন্তরকে একবারে স্পর্শ করিতে না পারে,—কেবল ঈশ্বরে মতি, ঈশ্বরে গতি, ঈশ্বরে রতি, মনের এই ভাব যত বাড়াইয়া লইতে পার, তাহাকেই সাধনা বা পূজা বলিয়া স্বীকার কর।

ধর্ম্ম-ভাব সকলেরই অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। কেবল ক্ষমতা, ধারণা ও বিশ্বাসের উপর, ইহার ক্রিয়ার ইতর বিশেষ দেখা যায়। জীবের অন্ন যেমন ক্ষুধা নিবারণের প্রধান সামগ্রী, অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম-ভাবের অবলম্বন তেমনই ঈশ্বর। কেহ তাঁহাকে নিরাকারে ধ্যান করিতেছে, কেহ প্রতিমা বা কোন জড় পদার্থে, তাঁহার স্বরূপ ভাব কল্পনা করিয়া লইতেছে। ধর্ম্ম-সাধন যখন জীবের প্রধান কর্ম্ম, তখন সকলকেই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম-ভাব গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়। ধর্ম্ম যদি জগতের প্রধান অবলম্বন না হইত, তবে কেন সভ্য অসভ্য সকল প্রকার মনুষ্যে তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়? ধর্ম্ম সকলেরই নিয়ন্তা হইয়া, সমস্ত জগৎ শাসন করিতেছে,—সৎপ্রবৃত্তির সুফল ও অসৎ প্রবৃত্তির কুফল, ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছে। যাহার যেমন ক্ষমতার বল বাড়িতেছে, ধর্ম্মও তেমনই তাহার সম্মুখে আসিয়া, নিজ মনোহর মূর্ত্তি দেখাইতেছে। এই রূপে ক্রমে ঘোর পাপিষ্ঠ জনও ধর্ম্ম-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকের যেমন প্রধান বল, অধার্ম্মিকের তেমনই শিক্ষার স্থল। যে ন্যায়বান পিতা, দন্তহীন শিশুর জন্য মাতৃ-স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দেন, ঐ শিশু যখন দন্ত-যুক্ত হয়, তখন তিনি তাহার রক্ষার জন্য অন্ন-দানে বঞ্চিত করেন না। ঈশ্বরের করুণার যে অন্ত নাই, এটি যেমন কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুসারে, যে, যেরূপ ধর্ম্ম-বিভাগের

উপযুক্ত, তাহার মনে ঐ ভাব প্রদান করেন। কাহাকেই একবারে ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করেন না। যাহার যেমন ক্ষমতার বল বাড়ে, সে তেমনই তাহার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া লয়। আমরা যাহাকে ঘোর পাপিষ্ঠ মনে করি, তাহারও মনে কোন না কোন মহৎ ধর্ম্মভাব সন্নিবিষ্ট থাকিতে পারে। একবারে ধর্ম্ম-বর্জ্জিত লোক সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্ঞান উদ্দীপিত না হইলে, কখনই মনুষ্য ধর্ম্মের প্রকৃত-পথ ধরিতে পারে না। এই জন্য যোগ-শাস্ত্রে ধর্ম্ম-যোগ এ শব্দটি ব্যবহৃত না হইয়া, জ্ঞান-যোগ নামে অভিহিত হয়; ফলতঃ প্রকৃত জ্ঞানও যাহা, ধর্ম্মও তাহা। জ্ঞান বিনা ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না এবং ধর্ম্ম বিনা জ্ঞান প্রতিভান্বিত হয় না। জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে পরস্পরের এই নিকট সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে,—একটির অভাবে অপরটির সত্তা অনুভব করা যায় না; সুতরাং নামের ইতর বিশেষে তত উপকার দর্শে না, যত ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা আবশ্যক হইতেছে।

যিনি জ্ঞান-মার্গে দণ্ডায়মান হইয়া, অথবা ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিয়া, মনুষ্য-জন্মের যথার্থ কাজ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিকাশ পায়। তুমি জ্ঞানবান হইয়া, যদি তাহা কাজে প্রকাশ না করিলে, তবে তোমার ধর্ম্মের গৌরব কিসে বৃদ্ধি পাইবে? অতএব বুঝিয়া দেখ, তোমার কার্য্যই ধর্ম্ম এবং জ্ঞান উক্ত কার্য্যের নেতা। তুমি ধর্ম্ম-সাধন কর? এ কথা বলিলে, ইহা কি প্রকাশ পায় না যে, তুমি তোমার ধর্ম্ম-জ্ঞান অনুসারে কার্য্য কর? যাঁহারা কার্য্যের ভাবী ফলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই ধর্ম্ম-যোগের উপযুক্ত পাত্র হইয়া উঠেন। ধর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, কার্য্যে উৎকর্ষ, সাধকের শুভ-যোগ আনিয়া দেয়; আর কার্য্যে অপকর্ষ,

তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠে। অতএব ধর্ম্ম-সাধন করিতে গেলে, ধর্ম্মের প্রকৃত পথ ধরা যেমন উচিত, ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাজে রত থাকা তেমনই আবশ্যক।

যে ব্রহ্ম-জ্ঞান সকলেরই অন্তরে বিরাজ করিতেছে, সেই পরব্রহ্মের উপাসনা ও তাঁহাকে অন্তরে ধারণা করিবার জন্য, পূর্ব্বতন যোগিগণ যোগ-শাস্ত্রে যে সকল অত্যুপাদেয় উপায় অবধারণ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ প্রকাশ করা যাইতেছে।

যোগ-শাস্ত্রে, যোগকে একটি বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া ধরা হইয়াছে। কোন বৃক্ষের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, যেমন প্রথমে তাহার বীজ, পরে অঙ্কুর বা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, তৎপরে পুষ্প এবং পরিশেষে ফল, এই সকল বিষয় মনে আসিয়া উদয় হয়, তদ্রূপ এ স্থলেও যম-নিয়মাদি কার্য্যের দ্বারা, তাহার বীজ জন্মে,—আসন ও প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা, তাহার অঙ্কুর বা বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; আর প্রত্যাহারাদি কার্য্যের দ্বারা, তাহা পুষ্পিত, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা, তাহা ফলবান হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একটি কার্য্য করিতে গেলে, অগ্রে তাহার উপকরণগুলি আহরণ করিতে হয়। যে, ঐ কার্য্য করিবে, তাহার তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এক্ষণেও দেখা যাইতেছে, যোগ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে, প্রথমে পূর্ব্বোক্ত স্থান, আসন, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি উপকরণ ও যোগাঙ্গ সম্বলিত কার্য্য-জ্ঞান বিনা, কেহই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাতে বুঝাইয়া দিতেছে যে, ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে, প্রথমে মনুষ্যকে কতকগুলি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়। যখন ঐ কার্য্যগুলি সহজ, অর্থাৎ অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে, তখনই সে

ধর্ম্মযোগে আসিয়া পড়ে। ধর্ম্ম বলিয়া এমন কোন বস্তু বা বিষয় নাই, যাহার পরিষ্কার অর্থ এক কথায় বুঝান যায়। সামান্যতঃ বুঝিতে গেলে, এই বুঝিতে হয়, যাহা সৎ-প্রবৃত্তির উদ্দীপক, যাহার ক্রিয়ানুষ্ঠানে অন্তরের বল বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বর-জ্ঞান, ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার আধিক্য হয়, ইত্যাকার কার্য্য; সংক্ষেপতঃ যাহা মনুষ্যকে প্রতিপালন বা পরিপোষণ করে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। এই যে ধর্ম্ম, ইহার সকল গুলিই কার্য্যের উপর নির্ভর করে। কার্য্যে কুশলতা লাভ করা, যোগের প্রধান বিষয় এবং এই কুশলতা লাভ করাই তাহার শেষ পুরস্কার।

সাধারণ কার্য্য ও যোগের কার্য্য এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। সাধারণ কার্য্যগুলি তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদির সংযোগে প্রস্তুত হইবার পর আর তাহার কার্য্যের অবশিষ্ট থাকে না; কিন্তু ধর্ম্মার্থে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহার ক্রিয়ার শেষ নাই। মনুষ্য যত দিন এ জগতে থাকে, তাহার সমস্ত জীবন ক্ষয় হইলেও তাহার কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়া উঠে না। মৃত্যুর পর সে লোকান্তরে যাইয়াও ঐ কার্য্য করিতে থাকে। যত দিন না কার্য্যের ক্ষয় হইবে, ততদিন তাহাকে কার্য্যে রত থাকিতে হইবে। যোগ-কার্য্যে পারদর্শী হইয়া, উহাতে সিদ্ধি লাভ করা সাধারণ ব্যাপার নহে। যিনি যত কার্য্য-কুশল হয়েন, তিনি ততই আপনার কার্য্যে তৎপর ও অনুরক্ত হইয়া পড়েন। বৈষয়িক কার্য্য-নির্ব্বাহের পরে, যেমন কর্ম্মকর্ত্তাকে আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না; কিন্তু ধর্ম্মার্থে যোগ-কার্য্য সেরূপ নহে। ইহাতে যতই আসক্ত থাকিবে, ততই ইহার ক্রিয়াবল বৃদ্ধি পাইবে। যতই ক্রিয়াবল বৃদ্ধি পাইবে, ততই ঈশ্বরে ভক্তি-শ্রদ্ধা, ধ্যান-ধারণার আধিক্য ও আত্ম-সংযম হইবে। যখন যোগ-বলে জীব সংযমে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে, তখনই তাহার আত্মার বল সমধিক

বাড়িয়া যায়। যত আত্মার বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই পর-মাত্মার সহিত তাহার সহবাসের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। যখন পরমাত্মার সহবাসজনিত সুখ সে অনুভব করিতে থাকে, তখন তাহার আত্মার স্বপ্রকাশভাব স্ফূর্ত্তি পায়। এইরূপে আত্মা যত পরমাত্মার সহবাসে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে, ততই সে পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানে পুষ্ট হইতে থাকে। এই পুষ্টতা লাভ করা, অল্প দিনের কার্য্যে সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না; এ কারণ নিত্যই যোগীকে যোগারম্ভ করিতে হয়। সংসারী ব্যক্তি যেমন প্রতি দিন সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, সংসারের অভাব মোচন করে, যোগিগণ তেমনই নিত্যই আপনাদের যোগাসনে বসিয়া, যোগের কার্য্য-বিধি অনুসারে কার্য্য করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হয়েন। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর বা উন্নত হওয়া যোগীর প্রধান কাজ।

যোগাসনে বসিয়া মনকে স্থির করাই, যোগাঙ্গের প্রধান বিষয়। যিনি যোগাঙ্গ ধরিয়া মনকে স্থির করিতে পারেন, তাঁহারই যোগ-ফল দিন দিন বাড়িয়া যায়। ধনুক ও বন্দুক লইয়া যাহারা লক্ষ্য স্থির করিতে শিক্ষা করে, প্রথমে তাহাদিগকে স্থূল বিষয়ের প্রতি, পরে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং পরিশেষে যতই লক্ষ্য স্থির হইয়া আইসে, তখন অতি সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতিও তাহাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। যতক্ষণ না সূক্ষ্ম বিষয়ে যাইয়া লক্ষ্য স্থির হয়, ততক্ষণ স্থূল-বিষয় লইয়া শিক্ষা করিতে হইবে। কেহই একবারে স্থূলকে অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মত্বে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে না। স্থূল-লক্ষ্য স্থির করা যেমন স্বল্পায়াসসাধ্য, তদপেক্ষা পরপর যত ক্ষুদ্র লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, ক্রমে ততই ঐ অভ্যাসের বল বাড়িয়া যায়। পরিশেষে সূক্ষ্ম-লক্ষ্য স্থির হইয়া উঠে। এই সূক্ষ্ম-লক্ষ্য স্থির করিতে প্রচুর অভ্যাসের বল আবশ্যক। এইরূপ মনকে স্থির করিতে গেলে, যোগাভ্যাসের

বল বাড়াইতে হয়; এজন্য যোগিগণ প্রথমে সাকার উপাসকদের স্থূল পথ অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ কোন শালগ্রাম শিলা কিম্বা কল্পিত কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি, অথবা কোন চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট জড়-পদার্থ, আপনাদের সম্মুখে রাখিয়া, দৃঢ়-দৃষ্টি-শক্তি সংযোগের বলে, মনকে স্থির করিতে অভ্যাস করেন। যখন ঐ মন একান্ত স্থির হইয়া আইসে, তখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পরব্রহ্মে যাইতে সমর্থ হয়। স্থূলদর্শী লোকদের পক্ষে, ঈশ্বরেতে মন সমাধান করিবার, এইটি প্রকৃষ্ট উপায়। যাঁহারা হেলে ধরিতে পারেন না, কেউটিয়া ধরিতে চান, তাঁহাদের নিকট সকল তত্ত্বই হার মানিয়া থাকে। সাকারবাদীর নাম শুনিলে, যাঁহারা ঘৃণায় মর্ম্ম-ব্যথা পান,—আপনাদিগকে পতিত বোধ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম-ভাবের সহিত ইহার মিল ত দেখা যায় না।

যে সকল যোগী যোগের চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রণব-মন্ত্রের জপ ও উহার অর্থ-ধ্যানকে ঈশ্বরের একমাত্র উপাসনা মনে করেন। তাঁহারা যোগাসনে বসিয়া, কেবল ঐ মন্ত্র জপ ও উহার অর্থ অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হয়েন। এই জপ ও অনুধ্যানে তাঁহাদের সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রণব জপ ও উহার অর্থ লইয়া কিরূপে অনুধ্যান করিতে হয়; তদ্বিষয়ে পশ্চিম প্রদেশবাসী যোগীবর তুলসীদাস নিজে আপনাকে উল্লেখ করিয়া, যে সুমধুর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিবেশিত ভাব যেমন সদ্ভাবে পরিপূর্ণ, তেমনই হৃদয়গ্রাহী; এজন্য এস্থলে তাহা প্রকটীকৃত হইল।—

"তুল্‌সী অ্যাসা ধেয়ান্ ধর, য্যাসা বিয়ান্‌কা গাই।
মুমে তৃণ চাণা টুটে, চেৎ রাখয়ে বাছাই॥"

"নবপ্রসূতা গাভী যেমন মুখে তৃণ চণকাদি ভক্ষণ করে, অথচ চিত্ত বৎসের প্রতি অর্পিত (রাখে কি না, তাহা বৎসের

নিকট গেলেই বুঝিতে পারিবেন।) যোগীরাও সেইরূপ, অন্যান্য কার্য্য করেন, অথচ সর্ব্বদা প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ধ্যান করেন। এই রূপ করিতে করিতে, তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে ঈশ্বরেতেই নিবিষ্ট বা একাগ্র হইয়া পড়ে, এবং পরিশেষে সমাধিও আসিয়া উপস্থিত হয়।"

যোগ নানা প্রকার, সুতরাং উহাদের মন্ত্র-বীজও পৃথক্ পৃথক্। সকল যোগের বিষয় বলা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে কেবল অধ্যাত্ম-যোগ লইয়া আলোচনা করাই, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যাত্ম-যোগে যোগিগণ ওঁকার লইয়া জপ ও উহার অর্থ-ধ্যান করেন, ইহার কারণ কি ?

প্রণব, এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, তাহার আদ্য অক্ষর ওঁ শব্দটি যেমন সহজেই মনে আসিয়া পড়ে ; তদ্রূপ ওঁ এই শব্দটি বলিলে, কেবল সেই একই ঈশ্বরকে বুঝাইয়া দেয়। ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্,—তিনি এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ, আর কেহই নাই। এক ওঁ শব্দে যেমন তাঁহার স্বরূপ ভাব প্রকাশ করে, এমন আর অন্য কোন শব্দে দেখা যায় না। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। তাঁহাতে এই তিনটি প্রধান গুণ যেমন বর্ত্তমান আছে, অথচ তিনি এক হইলেও তাঁহার এই তিনটি স্বরূপ ভাব সকলেরই মনে আসিয়া পড়ে, তদ্রূপ এই ওঁ শব্দটি একাক্ষরে গঠিত হইলেও, ইহার অন্তর্ভূত যে তিনটি পৃথক্ অক্ষর আছে, তাহা জানাইয়া দেয়। অ, উ, ম. এই তিনটি অক্ষর যোগে ওঁ শব্দটি গঠিত। ঈশ্বর যেমন ত্রিগুণাত্মক, অথচ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; তদ্রূপ এই ওঁ শব্দটি ত্র্যক্ষর হইয়াও পৃথক্ একভাব ধারণ করিয়াছে।

"অকারোবিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ,
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ।"

অকারে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা বুঝায়। ঈশ্বরের ব্রহ্মা শক্তি-বলে সৃষ্টি, বিষ্ণু শক্তি-বলে স্থিতি, এবং মহেশ্বর শক্তি-বলে প্রলয় বা নাশ কার্য্য সমাধা হয়। এই ত্রিবর্ণাত্মক বীজে ঈশ্বরের স্বরূপভাব এত দূর সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় বলিয়া, যোগিগণ ইহা লইয়া জপ ও ইহার অর্থ অনুধ্যানে মগ্ন হয়েন। কোন দীর্ঘ উচ্চারিত শব্দ বা বীজ যথাবিহিত রূপে উচ্চারণের সঙ্গে শরীরে পূরক, কুম্ভক ও রেচক আয়ত্ত হইয়া আইসে। এক ওঁকার শব্দ উচ্চারণ-গুণে তাহার কিছুই অভাব থাকে না। ওঁকারের অন্তর্গত এই সকল মহৎ তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট থাকাতে, ইহার এত দূর মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একটি প্রকাণ্ড পদার্থ। ভূলোক ও দ্যুলোক ইহার অন্তর্গত। যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাঁহার সমস্ত রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করা, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত বিষয়। এই পৃথিবী সূর্য্যের একটি গ্রহ মাত্র, ইহার আর কয়েকটি গ্রহ ও উপগ্রহ আছে। উহাদের প্রত্যেককেই এক একটি লোক বলে। প্রতি লোক অসংখ্য প্রাণীর বাসস্থান। সূর্য্য ও উহার গ্রহ-উপগ্রহ লইয়া যে লোক, তাহাকে সৌরজগৎ বলে। আমরা আকাশের চতুর্দ্দিকে যে সকল অগণ্য সমুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাই, আর যে সকল চক্ষুর অগোচর থাকে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য্য সদৃশ। ইহাদের আবার কত গ্রহ-উপগ্রহ আছে। এই সকল অসংখ্য লোক লইয়া, যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যিনি ইহার একমাত্র অধিপতি, তাঁহার রাজ্যের কি সীমা আছে? তিনি যেমন অসীম, তাঁহার রাজ্যও তেমনই অপরিসীমতার পরিচয় দিতেছে। যিনি অনন্তশক্তির বলে, সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া না জানিলে, কেমন করিয়া তাঁহার এ গুণ প্রকাশ পাইতে পারে? আমরা অতি ক্ষুদ্র

জীব, এই জন্যই, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদের বাসস্থান হইয়াছে; তথাপি ইহার প্রত্যেক বিষয়গুলি ধরিয়া যদি আলোচনা করিতে থাকি,তবে কতগুলি বিষয়ের তত্ত্ব আমরা নিশ্চিত অবধারণ করিতে পারি? আমাদের স্থূল-দেহ, স্থূল-জ্ঞান, তাই স্থূল-বিষয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াই,—যেখানে সুক্ষ্ম-তত্ত্ব, তাহার মধ্যে কৈ প্রবেশ করিতে পারি? আর অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, একবার নিজের নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির ক্ষমতার বিষয় ধরিয়া আলোচনা করিয়া দেখ, এ বিষয়ে তাহার প্রচুর সাক্ষ্য দেখিতে পাইবে। মনুষ্য মাত্রেই স্বীকার করে যে, ঈশ্বর আমাদের সকলেরই পিতা মাতা। পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ আছে,—যে সমস্ত জাতি আছে,—যে সমস্ত প্রাণী আছে ও আর আর যে সমস্ত পদার্থ আছে; তিনি সকলেতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এমন দেশ নাই, এমন জাতি নাই এবং এমন কোন মনুষ্যই নাই, যে দেশে বিশ্বাস আছে বা যে জাতি ও যে মনুষ্য বলে যে, ঈশ্বর কোন দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের কিম্বা কোন প্রাণী বিশেষের ঈশ্বর। যাহার অন্তরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সমস্ত জগতেরই পিতা-মাতা হইয়া, সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি যখন সমস্ত জগতের পিতা-মাতা, তখন তিনি কখনই সীমাবদ্ধরূপে থাকিতে পারেন না। যে ক্ষুদ্র তাহারই একটা না একটা সীমা নিরূপণ হইতে পারে, কিন্তু যিনি মহান্ তাঁহার সীমা কি রূপে নির্দ্ধারণ হইবে? যিনি অত্যুন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গে,—অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্র-গর্ভে,—দিগ্‌দিগন্ত-প্রধাবিত অনন্ত আকাশে,—অতি সূক্ষ্মতম দৃষ্টির অগোচর পরমাণুর সমষ্টি মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ভিন্ন আর কোন্ শব্দে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? তিনি যদি সর্ব্বব্যাপী হইলেন, তবে ত সকলেরই

অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি আমরা তাঁহাকে দূরে ভিন্ন, নিকটে কৈ দেখিতে পাই? যিনি সকলের অন্তরের অন্তর,—তিনি কেমন করিয়া দূরে থাকিতে পারেন? আমাদের মন যখন তাঁহাকে দেখিবার,—তাঁহার সত্তা অনুভব করিবার উপযুক্ত না হয়, তখনই তাঁহাকে দূরে মনে করি। যে যারে অতিশয় ভাল বাসে, তাঁর প্রতি যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না দেখান হয়, তবে সে কেমন করিয়া, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে? যে ঈশ্বর দয়া করিয়া, আমাদের হৃদয়ে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি ভিন্ন এত নিকট সম্বন্ধ, আর কাহারই সঙ্গে হইতে পারে না। তথাপি যদি আমরা তাঁহাকে দেখিয়াও না দেখি,—তাঁহার প্রতি প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা না করি, তবে কেমন করিয়া তাঁহাকে অন্তরে ধারণ করিতে পারি? তিনি নিকটে থাকিলেও দূরে থাকার ন্যায় কাজ হইয়া উঠে। আমরা এমনই বিমূঢ়! যাহারা আমাদের শরীর হইতে বিভিন্ন, মধ্যে অনন্ত আকাশ ব্যবধান থাকিয়া আরও স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে, সেই পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, তাহাদিগকেও আমরা অতিশয় নিকট ভাবিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রদর্শন করিতেছি; কিন্তু যিনি প্রতিক্ষণে আমাদের নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন,—তাঁহার ন্যায় নিকট-সম্বন্ধ এ জগতে আর কাহার সহিত নাই; অথচ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা কি সামান্য মোহের কার্য্য!

যিনি প্রতিক্ষণে আমাদের প্রত্যেকের শুভ-কামনা করিতে-ছেন,—নানা অভাব মোচন করিয়া দিতেছেন,—তাঁহার জ্ঞানের সীমা কোথায়? জগতের এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তিনি প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া রাখিয়াছেন? যিনি মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চার করিয়া, সদ্যোজাত

শিশুকে পোষণ করিতেছেন,—যিনি দন্ত দিয়া তাহার অন্ন বিধান করিতেছেন,—যিনি মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি দিয়া, প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতেছেন,—যিনি নিবিড় অরণ্য মধ্যে নানাবিধ ফল-মূল জন্মাইয়া, বহুবিধ জীবের আহার বিতরণ করিতেছেন,—যিনি নদ-নদী ও সমুদ্রে জল-জন্তুগণের ভক্ষ্য-বস্তুর আয়োজন করিয়া দিয়াছেন,—যিনি অনন্ত আকাশে বায়ুর স্থষ্টি করিয়া, প্রাণি-গণের প্রাণকে রক্ষা করিতেছেন,—যিনি বাষ্পাকারে পৃথিবীর নিম্ন ভূমির জল ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া, সর্ব্বত্র বৃষ্টিরূপে সিঞ্চন করিতেছেন,—যিনি জীব-সংহারক দূষ্য-বায়ু নিবারণের জন্য, সচল পৃথিবীকে প্রতি দিন সূর্য্যের অভিমুখে আনিয়া দিতেছেন,—যিনি নদ-নদীর মলিনতা দূর করিবার জন্য, উহাদিগকে নিম্নগামী রূপে স্থষ্টি করিয়াছেন,—যিনি ঐ সকল জলের পুনঃ সংস্কারের জন্য সমুদ্রের জলে, লবণ সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন,—যিনি প্রাণিগণের দেহে কতই কার্য্য-সাধক যন্ত্র-কৌশল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ; মানব, তাঁহার বিষয় লইয়া ভাবিতে থাকুক, দেখিবে, এই বিশ্ব-মাঝে এমন স্থান নাই, এমন পদার্থ নাই ও এমন প্রাণী নাই, যাহাতে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের বিকাশ না পাওয়া যায় ? আমরা সামান্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব, এ জন্য তাঁহার কার্য্যকারণের সকল তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; কিন্তু যাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই, এই ক্ষুদ্র-জ্ঞান কেমন করিয়া, তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে ? যাঁহার কণামাত্র জ্ঞান পাইয়া আমরা জ্ঞানবান, যিনি বিশ্বের জ্ঞানদাতা, তাঁহার জ্ঞানের নিরূপণ, আমরা কেমন করিয়া করিতে পারি ? আমাদের বুদ্ধি যদি সামান্য না হইত, তবে যিনি আমাদের অন্তরে অহর্নিশ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে কেন দেখিতে না পাই ?—তাঁহার সত্তা,—তাঁহার দয়া, কেন অনুভব করিতে না পারি ?

বীজ বপন করিলে, উহা যেমন অঙ্কুরিত হয়, ক্রমে বৃক্ষ রূপে পরিণত, পরে ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে। বীজের আকার দেখিয়া, কে মনে করিতে পারে যে, এই অশ্বত্থ-বট বৃক্ষ এত সূক্ষ্ম-বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া, এত বড় প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিবে? আমাদের জ্ঞান যদিও পরিমাণে যৎসামান্য, কিন্তু সেই আদি জ্ঞান-দাতা যখন অপরিসীম জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধি-পতি, তাঁহারই সেই জ্ঞান-বীজ যখন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, তখন সেই জ্ঞান-মূলে নিত্য অকৃত্রিম ভক্তি-বারি সিঞ্চন করিলে কি আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি না হইয়া থাকিতে পারে? যিনি আমাদের অন্তরে জ্ঞান-বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে তাহার ফল-লাভে বঞ্চিত রাখি-বেন, ইহা ত কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না? তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে স্বাধীনতা দিয়া, পুনর্ব্বার তাহার পথ কি রুদ্ধ করিতে পারেন? যে ঈশ্বরের উদার করুণা অনুধাবন করিতে না পারে, তাহারই নিকট এই নীচভাব আসিয়া দেখা দেয়। যিনি জ্ঞান-চক্ষে, প্রেম-বক্ষে তাঁহার অপার করুণার বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহার মনে কখনই এ ভাব আসিতে পারে না। যার মন পাপ-তাপে জর্জ্জরিত, নীচভাবে পরিপূর্ণ, সে ভিন্ন ঈশ্বরের অপার করুণা কে না উপভোগ করিতে পারে? যিনি করুণার সিন্ধু, জগতের বন্ধু, তিনি কেমন করিয়া ঔদাসীন্য থাকিতে পারেন? যে ঘোর পাপী, যাহার মন অবিশুদ্ধতা-জালে জড়ীভূত, তাহাকেও তিনি অজস্র-করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। তিনি যদি তাহাকে করুণা-দান না করিতেন, তবে সে কেমন করিয়া, পাপের বোঝা লইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত? তিনি সকলেরই নিয়ন্তা, তিনি রাজার রাজা, তিনি গুরুর গুরু; আর সকলেই তাঁহার সাধারণ প্রজা, তাঁহার সহিত

সকলেরই সমান সম্বন্ধ নিবদ্ধ রহিয়াছে ; তথাপি যে মনে করে, আমার সহিত, তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই,—সে অতি অভাজন! যিনি অখণ্ড সর্ব্বান্তর্ব্যাপী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ওতপ্রোতভাবে সুদৃঢ় নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কে দূরে যাইতে পারে ? তিনি যেমন সুদূরেও আছেন, তেমনই এমন সন্নিকটে রহিয়াছেন, যাহা তাঁহা অপেক্ষা আর কাহারও সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা হইতে পারে না। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কেহই কোথায় থাকিতে পারে না। যে মোহান্ধে পড়িয়া, তাঁহাকে দূরে মনে করে, তিনি তাহারও কাছছাড়া হয়েন না। আমাদের সামান্য জ্ঞানের ভাব একরূপ, আর সেই মহান্ পুরুষের কাজ স্বতন্ত্র। আমরা যাহাকে ভাল না বাসি, তাহার ত্রিসীমায় যাইতে,—তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে, একবারে বিরত হই ; কিন্তু সেই করুণাময়ের যে উদার ভাব, তিনি কাহারও নিকট হইতে দূরে গমন করেন না। সামান্য জ্ঞান ও মহৎ জ্ঞানের কার্য্য যদি একরূপ হইত, তবে জগতে, জগৎবন্ধু, করুণার সিন্ধু বলিয়া, তাঁহার কেন এত গুণ-গান করিবে? যাঁহার করুণার অন্ত নাই, জীব তাহার কণামাত্র লাভ করিতে পারিলে, তাহার সকল দুঃখ-যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হয়,—দেহীর দেহ-শুদ্ধি ও আত্মার নির্ম্মতা জন্মে,—জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং তৃপ্তি-সুখের অধিকারী করিয়া দেয়। হায়! জগতে এ করুণার তুলনা কোথায়!

এ সম্বন্ধে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস যে প্রকার উপদেশ দিতেন, নিম্নে তাহার সারাংশ গ্রহণ করা গেল।—

মলিন দর্পণে যেমন সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। তেমনই মায়ায় বিমুগ্ধ অপবিত্র হৃদয়ে পরমাত্মার জ্যোতিঃ অনুভব করা যায় না ; কিন্তু বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে, তাহার কোন বাধা জন্মে না।

মেঘ সূর্য্যকে আবরণ করিল, চারি দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, সেই মেঘ যখনই চলিয়া গেল, পুনর্ব্বার দিক সকল সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এইরূপ মনুষ্যের অন্তর যখন মলিনতা আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় পিতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু যখন জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইয়া, অন্তর বিশুদ্ধভাবে পরিণত হয়, তখন তাঁহার দর্শন পাইতে আর বিলম্ব ঘটে না। অতএব আত্মাকে বিশুদ্ধ করিতে না পারিলে, কিরূপে অন্তরে পরম পিতার দর্শন মিলিবে?

ময়লা জল-তরঙ্গে যেমন চন্দ্র-বিম্ব খণ্ড খণ্ড দেখায়, তদ্রূপ মায়ায় বদ্ধ সংসারী লোকের অন্তরে ঈশ্বরের আংশিক আভা মাত্র দেখা যায়।

স্প্রিংয়ের গদির উপর বসিলে, উহা যেমন কুঞ্চিত হয়, আবার উঠিলেই পূর্ব্বভাব দেখা দেয়; তদ্রূপ সংসারী মানব, যখন ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে থাকে, তখন তাহার ধর্ম্মভাব উত্তেজিত হয়; কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলে, আর সে ভাব থাকে না।

লৌহ যতক্ষণ হাপোরে থাকে, ততক্ষণ উহাকে লালবর্ণ দেখায়, হাপোর হইতে বাহির করিলেই ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ সংসারী ব্যক্তি যতক্ষণ ধর্ম্ম-মন্দিরে বা ধার্ম্মিকদিগের নিকটে থাকে, ততক্ষণ তাহার মন ধর্ম্ম-ভাবে পূর্ণ হয়; কিন্তু তথা হইতে চলিয়া গেলে, আর তার সে ভাব থাকে না।

জল ও দুগ্ধ দুই একত্র করিলে, যেমন উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যায়, তখন ঐ জল ও দুগ্ধকে পৃথক্ বলিয়া জানা যায় না, তদ্রূপ ধর্ম্ম-পিপাসু নবীন সাধক যদি সকল সাম্প্রদায়িক লোকের সহিত মিলিত থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই আপনার ধর্ম্ম-ভাব হারাইয়া বসে। তাহার পূর্ব্বের বিশ্বাস ও উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়, তখন সে তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

জল ও দুগ্ধ মিশ্রণের ক্রিয়া এক প্রকার, কিন্তু যদি ঐ দুগ্ধকে মাখনে পরিণত করা যায়, তখন উহা আর জলের সহিত পূর্ব্বভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় না। এইরূপ যে একবার আপন হৃদয়াকাশে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারে, তখন সে শত সহস্র বদ্ধ-জীবের মধ্যে থাকিলেও, তাহার বিশ্বাস ও উদ্যমের কিছুই হ্রাস হয় না।

চকমকির পাথর যদি শত-বর্ষ, কাদা-জলে পড়িয়া থাকে তথাপি যখনই উহাকে লৌহ দ্বারা আঘাত করা যায়, তখনই উহার মধ্য হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। এইরূপ অন্তঃসারবান্ বিশ্বাসী সাধক যদি নানা প্রকার অবিশুদ্ধ অবস্থায় পতিত হয়েন, তথাপি তাঁহার অন্তরের বিশুদ্ধভাব কখনই বিদূরিত হয় না।

যদিও সূর্য্য-কিরণ সকল স্থানে পতিত হয়, পরিষ্কার জল, দর্পণ ও অন্যবিধ স্বচ্ছ পদার্থে যেমন অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়, অপর স্থানে তদ্রূপ দেখা যায় না। এই রূপ ঈশ্বরের প্রকাশ যদিও সাধারণ হৃদয়ে বিশেষ প্রতিভাস্বিত হয় না; কিন্তু সাধু-দিগের নির্ম্মল অন্তরে অধিক পরিমাণে স্পষ্ট বিকাশ পাইয়া থাকে।

"এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লীলা-রসময় হরি নানা ভাবে, এখানে সদা লীলা করিতেছেন। মাতা যেমন সন্তানের হস্তে লাল চুসি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নানাবিধ পদার্থ দিয়া, আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। সন্তান চুসি ফেলিয়া দিয়া, মা মা বলিয়া চীৎকার করিলে, মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপস্থিত হন, আমরাও যদি পার্থিব মমতা বিহীন হইয়া, ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন করিতে পারি, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট উপস্থিত হন।"

"যেমন সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত চুম্বক প্রস্তর অকস্মাৎ জাহাজের সমুদয় লৌহ নির্ম্মিত পেরেক প্রভৃতিকে টানিয়া লইয়া জাহাজ

খানকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়; সেইরূপ জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে, অহঙ্কার স্বার্থপরতাপূর্ণ জীবনতরী মুহূর্ত্তের মধ্যে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া, ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।"

জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থন করিয়া, ভারতের মহর্ষিগণ যে জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞান উপার্জ্জন বিনা মনুষ্যের ক্ষুদ্র জ্ঞান বিকশিত হয় না। তুমি বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পার,—শিল্প-কার্য্যে সুদক্ষ ও ব্যবসায়ে পরিপক্ক এবং লোকলৌকিকতা, আহার-ব্যবহারে যদিও উচ্চ-শ্রেণী লাভ করিতে পার; কিন্তু যিনি তোমার প্রাণ-সখা,—যিনি তোমার চির-সম্বল, তাঁহাকে অন্তরে না পাওয়া, তোমার যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়া দিতেছে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখ না? তুমি বহুদিন ধরিয়া যে জ্ঞানরাশি উপার্জ্জন করিলে, তাহার সঙ্গে কি ঐ জ্ঞানের কোন সৌসাদৃশ্য আছে? তোমার যে জ্ঞান, উহাকে বাহ্য-জ্ঞান বলে; ইহাতে তোমার অন্তরের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কি রূপে হইবে? যত দিন না তুমি তোমার অন্তর্জ্ঞানের পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইবে,—যত দিন না তোমার অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে,—তুমি বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, ধনেতে, মানেতে, সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যে যত কেন উন্নত হও না, কখনই সে ধনের অধিকারী হইতে পারিবে না। তোমার যে বিদ্যা-বুদ্ধি,—তোমার যে শিল্প-জ্ঞান,—তোমার যে অবলম্বিত ব্যবসায়, ইহাতে তোমাকে ধনৈশ্বর্য্য-ভোগের অধিকারী করিয়া দিতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ না তোমার জ্ঞান অন্তরের মলিনতা দূর করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমে যাইয়া উপস্থিত হইবে, ততক্ষণ তোমার সে জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। তুমি অহর্নিশ সুধাভ্রমে যে হলাহল পান করিতেছ, তাহার অনুরূপ ফল, তোমাকে ভোগ

করিতে হইবেই হইবে। তুমি যে পথকে সুখের মূলাধার বোধ করিতেছ, তাহা তোমার সর্ব্বনাশের মূল-কারণ হইবে। তোমার যত দিন না বাসনা-বীজ বিদগ্ধ হইবে, তত দিন কেবল পার্থিব সুখ-দুঃখে মিলিত থাকিবে,—তোমার তখনই জ্ঞানের সার্থকতা দেখা যাইবে, যখনই তোমার অন্তরে অন্তর্জ্ঞানের সঞ্চার হইবে। সাধারণতঃ বাহ্য-বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা বাহ্য-জগতের জন্য। যিনি বাহ্য-বিষয়ের জ্ঞান হইতে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানে যাইয়া সম্মিলিত হয়েন, তাঁহারই জ্ঞান যথার্থ সার্থক হয়। বাহ্য-জ্ঞান অন্তর্জ্ঞানের পোষক, আর ঐ অন্তর্জ্ঞান ঈশ্বরের স্বরূপভাব দেখাইয়া, তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছার পথে চলিতে শিক্ষা প্রদান করে। হে মানব! তুমি এখানে থাকিবার কালে, যদিও আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা না পাও, তথাপি তুমি আপন বিদ্যা-বুদ্ধির বলে, ধনে, মানে, গৌরবে, নর-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিপুল যশঃ প্রতিপত্তি অনায়াসে লাভ করিতে পার; কিন্তু আসল বিষয়ে তোমাকে একবারে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। তোমার যাহা নিত্য-সুখ, তাহা তোমারই হাতে রহিয়াছে,—তোমার ইচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; তথাপি তুমি এ ধনে কেন বঞ্চিত হও? অগ্রে তোমার মোহকে ছাড়াইবার চেষ্টা পাও,—নিজপথ পরিষ্কার করিয়া লও,—তোমার দেহে প্রাণ থাকিতে, আপন কাজে অহরহঃ মনোনিবেশ কর, তবেই তোমার নিজ সম্বল, নিজ হস্তগত হইবে। তুমি অকপট-হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম-ডোরে আপন মনকে বাঁধিবার চেষ্টা পাও,—ভক্তি-শ্রদ্ধাকে তাহার সহচর করিয়া লও,—চেষ্টা ও যত্নের বলে, আপন কাজে রত থাক, তবেই তোমার কার্য্য-সিদ্ধির উপায় হইয়া উঠিবে। তুমি যদি প্রতারিত হইতে ইচ্ছা না কর এবং সংসারের মমতা পরিহার করিতে না পার,—বনে যাইয়া কুটীর নির্ম্মাণ কর,—ফল-মূল আহারের প্রতি নির্ভর কর,—

যোগাঙ্গ ধরিয়া চলিতে অভ্যাস কর,—দেখিবে, শান্তি-সুখের নিকেতন পাইতে বড় বিলম্ব রহিবে না।

আমরা কোন নিরাকার উপাসককে সাকার পূজক হইতে পরামর্শ দিতে বসি নাই এবং কোন সাকার উপাসককেও তাহা ছাড়িয়া নিরাকার উপাসকদের দলভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইতেছি না। আমাদের প্রধান ইচ্ছা এই, যিনি যেরূপ উপাসক শ্রেণীর মধ্যে থাকুন না কেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, উপাসকদের মধ্যে, যাহার যেমন অধিকার, যেমন ক্ষমতা এবং যেমন বিশ্বাস, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া, তিনি ধর্ম্ম-পথে চলিতে থাকুন,—তাহার কার্য্য-বিধি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করুন; তবেই ক্রমে ধর্ম্মের প্রকৃত-পথের পথিক হইতে পারিবেন। এস্থলে উক্ত পরমহংসের আর একটি উপদেশ কেমন সুন্দর!

"মত-পথ। যেমন এই কালী-বাটিতে* আসিতে হইলে, কেহ নৌকায়, কেহ গাড়িতে এবং কেহ হাঁটিয়া আসিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, পরিশেষে এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা যে ঈশ্বর-লাভ হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই এক।"

যদি ধর্ম্ম-জ্ঞান, কিছু দিনের ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিত, তাহা হইলে জগতে এত নীতি-শাস্ত্র, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক মত ও ইহার কার্য্যানুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হইত না। ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি দুষ্কর কার্য্য। সকল কার্য্যের সমাপ্তি, কোন না কোন সময়ের মধ্যে হইয়া উঠে, এটি যেমন নিশ্চিত, ধর্ম্ম-কার্য্য সেরূপ নহে। মনুষ্য আপনাপন ক্ষমতা, ধারণা, অধিকার ও বিশ্বাসের

*কলিকাতার উত্তর ভাগীরথী নদীর পূর্ব্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণি নবরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, উহাতে কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেন; সুতরাং এ স্থলে ঐ কালীবাড়ী বুঝিতে হইবে।

বলে, এ পথে প্রবেশ করে; সকলের ক্ষমতা, সকলের ধারণা, সকলের অধিকার ও সকলের বিশ্বাস এক রূপ নহে। কাহার কোন বিষয়ে যথার্থ হীনতা থাকিতে পারে,—কাহার কোন বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকিতে পারে,—কাহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অন্যায় বিশ্বাস থাকিতে পারে। যত দিন না এ সকল দোষের দূরীকরণ হইবে,—যত দিন না সকল বিষয় সাধুভাবে পরিণত হইবে,—যত দিন না নিজ নিজ আত্মার বল বৃদ্ধি পাইবে,—যত দিন না ইহার উপযুক্ত উপদেষ্টা মিলিবে; তত দিন, কি রূপে সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যাইবে? অনেক বৈষয়িক বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিলেও কোন না কোন রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া উঠে; কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিলে, কার্য্য-সিদ্ধি বিষয়ে বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে সম্পূর্ণজ্ঞানে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিলে ত কোন মতে কার্য্য হইবে না। অনেক বিষয়ে কৃত্রিমতা চলে; কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে বিসদৃশ ভাব বা অসম্পূর্ণতা আসল কাজের মূলে যাইতে বিস্তর বাধা দেয়। বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে যে নির্ম্মলজ্যোতির আবির্ভাব, তাহা কখনই অবিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে পারে না। প্রত্যেকেই পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারেন যে, আপনাপন অন্তর কত দূর পরিষ্কৃত হইয়াছে,—কত মলিনতা সঞ্চিত রহিয়াছে। যখন দেখিবে, অন্তর বিশুদ্ধ ভাবে,—বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াছে; তখনই জানিবে যে, বিশুদ্ধ-ধর্ম্মে অধিকার জন্মিয়াছে। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ মনের অন্ধকার,—মনের মলিনতা দূর করিয়া দেয়। তখন মানব হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ-কোষে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান অনুভব করিতে পারেন।

আত্মা দ্বারা আত্মাকে দর্শন করার কার্য্যকে, ঈশ্বরকে লাভ করা বলে। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে, আমরা সেই আলোকে

সূর্য্যকে দেখিয়া থাকি; তদ্রূপ আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে যে আত্মা আছে, তাহার স্বাভাবিক জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে, আমরা সেই জ্যোতিতে পরমাত্মার অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিতে সমর্থ হই। ইহাকেই পরাজ্ঞান বলে। যত দিন না মনুষ্যের অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন তাহার এ জ্ঞান জন্মে না।

যিনি যোগ-বলে আপনার অন্তর্বাহ্য বিশুদ্ধ ভাবে পরিণত করিতে পারেন,—যোগ-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া উহাতে 'পারদর্শী হয়েন, এ জগতে এমন কোন দুষ্কর কার্য্য নাই, যাহা তিনি সম্পন্ন করিতে না পারেন। এই জন্যই যোগানুষ্ঠানের এত দূর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। যোগী আর ভোগী, ইহাদের মধ্যে যে ভেদাভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? এক জনের আত্মা বিশুদ্ধতা গুণে, ঈশ্বরের প্রগাঢ় প্রেমে মগ্ন হইয়া, ঘন নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করে; আর এক জন মনোবিকারের কুহকে পড়িয়া, অধর্ম্মের অবিশুদ্ধতা-জালে জড়ীভূত হয় ও যারপরনাই অশান্তি ভোগ করে। ঈশ্বরকে লাভ করা, অন্তরের কাজ, অন্তর অবিশুদ্ধ থাকিলে, কিরূপে তাঁহার আবির্ভাব বুঝিতে পারিবে? অতএব যে কর্ম্মে মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ভাবের সঞ্চার হয়,—অন্তরের মলিনতা দূর করে,—ঈশ্বরের সুপ্রসন্ন মুখ-জ্যোতিঃ দেখিতে বাধা না দেয়, তাহাই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম। যিনি এই কাজে লিপ্ত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারই ধর্ম্ম-যোগ সুসিদ্ধ হয়।

হে নর! তুমি আপনাকে যতই কেন ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা কর না, তথাপি তুমি একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। তোমার শরীররূপ রাজ্যে মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ প্রজারূপে বাস করিতেছে। তুমি যত দিন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাক, তত দিন তোমার প্রজাগণ অশিক্ষিত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া বিধিমতে নিজ রাজ্যের

বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে চেষ্টা পায়,—তখন সে জন্য তোমাকেও অশেষ-বিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তুমি যদি সুবোধ হও,—আপনার গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা কর, তবেই তোমার প্রজাগণ তোমার চিরমঙ্গলাস্পদ শান্তি-সুখ দিতে সমর্থ হইবে। তুমি নিজের দোষে আপন রাজ্যে কেন রাজ্য-বিপ্লব ডাকিয়া আন? তুমি ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান হও,—জ্ঞান-চক্ষুকে প্রস্ফুটিত কর,—ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর,—তখন তোমার যে অসীম ক্ষমতার বল,—যাহা তোমাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তুমি এখন আপন রাজ্য-রক্ষা করিতে যেমন হতাশ হইতেছ,—নিজ বলের অভাব অনুভব করিতেছ,—তখন দেখিতে পাইবে, কোথা হইতে এক অভাবনীয় স্বতন্ত্র শক্তি তোমাতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। তুমি যদিও সামান্য জীব, কিন্তু বিশ্বরাজের আদরের ধন। তোমাতে পিতৃ-গুণ দেখিতে পাইলে, তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকে না! তোমার ক্ষমতা যে কত দূর প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা তুমি সহজ জ্ঞানে কিরূপে অনুধাবন করিতে পারিবে? যখন তোমার জ্ঞান উদ্দীপিত হইবে, তখন পরম মোক্ষ-যোগের ফল লাভ করিতেও সমর্থ হইবে। এক্ষণে ঐ মোক্ষ-যোগের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

৪। মোক্ষ-যোগ।

কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের যেমন যোগ, ধর্ম্মের সঙ্গে মোক্ষের তেমনই সংযোগ রহিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্ম-কার্য্য বিনা, কেহই মোক্ষ-যোগের অধিকারী হইয়া উঠে না। যে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া, ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিমান হয়,—ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া পড়ে,—যাহার মন ক্ষণেকের জন্য ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না,—কেবলই ঈশ্বর-জ্ঞান, ঈশ্বর-ধ্যান, যাহার সার কার্য্য হইয়া উঠে, তাহারই মোক্ষ-যোগ আসিয়া দেখা দেয়। সে এ কাজের চরম অবস্থায় যখন যাইয়া উপস্থিত হয়, তখনই মোক্ষ-পদ লাভ করে।

মনুষ্যের জীবন-কাল, এত সুদীর্ঘ নহে, যাহাতে সে এই অল্প সময়ের মধ্যে, মোক্ষ-যোগের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারে। সে এখানে থাকিয়া, আপনার যতদূর উন্নতি-সাধন করিয়া যায়, দেহান্তে উপযুক্ত লোকে যাইয়া, ঐ কার্য্যে রত হয়। তথায় যত উন্নতি লাভ করিতে থাকে, ক্রমে ততই উন্নত লোকে যাইয়া আপনার অন্তরকে পুষ্ট করিয়া লয়। ঐ পুষ্টতায় তাহার আত্মার সম্পূর্ণ জ্যোতিঃ ও শক্তি আসিয়া দেখা দেয়। তখন তাহার আত্মা, পরমাত্মার জ্যোতিতে যাইয়া মিশে। দুইটি দীপালোক সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, যেমন উভয়ে উভয়কে আপনার দিকে আকর্ষণ করে, যখন দুইটি একত্র হইয়া পড়ে, তখন আর উহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, তদ্রূপ আত্মা ও পরমাত্মার যে একত্র সম্মিলন, তাহাকেই জীবের মোক্ষ-পদ বলে। এখন জীবের কার্য্যের আর অবশিষ্ট থাকে না, সে পরমাত্মার স্বরূপে যাইয়া

কেবল নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করে। কত পার্থিব সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া, সে এখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার শেষ পুরস্কার। যখন জীব এই পুরস্কারের অধিকারী হয়, তখন তাহার জীবত্ব থাকে না,—ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণে রত থাকে।

আমরা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করি বা যাহার বিষয় ধরিয়া চিন্তা করিতে থাকি, তাহা আমাদের মস্তিষ্কের আবরক-ঝিল্লিতে অঙ্কিত বা অনুরঞ্জিত হয়, (বস্ত্র ছাপার ন্যায় দাগ পড়ে)। ঐ অঙ্কিত বা অনুরঞ্জিত হওয়াকে জীবের বাসনা বীজ বলে। কোন অবিদগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি, যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে, উহা বপন করিলেই বৃক্ষরূপে উদ্ভূত হইয়া, ফলোৎপাদন করে; বিদগ্ধ বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি তেমন অক্ষুণ্ণ থাকে না। সেই রূপ আমাদের বাসনা-বীজ অবিদগ্ধ থাকিলে, অবশ্যই আমাদিগকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া, তাহার ফল উৎপাদন করিতে হইবে; কিন্তু যদি ঐ বাসনা-বীজ বিদগ্ধ করিতে পারি, তবে আমাদের আর কার্য্যের প্রত্যাশা রহিল না, সুতরাং মোক্ষ-পদে অধিকার জন্মিল। যাঁহারা যোগাঙ্গের প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে যোগ-সাধন করিতে পারেন, তাঁহাদের বাসনা-বীজ দগ্ধ হইয়া যায়; এ কারণ তাঁহারা মোক্ষ-পদ পাইবার উপযোগী হইয়া উঠেন। এই মোক্ষ-পদ লাভ করাকে কৈবল্য বলে। কৈবল্য জীবের শেষ গতি। যে, এই পদ লাভ করে, তাহার ভববন্ধন একবারে ছেদ হইয়া যায়; সুতরাং তাহার পুনর্জন্ম গ্রহণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহাই জীবের শেষাবস্থা,—ইহাকে লাভ করাই জীবের প্রধান বিষয়।

মোক্ষ-বিষয়ে এই তর্ক আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে, মনুষ্য, এই শরীরে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া, মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হইতে পারে

কি না? এ সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যে প্রকার মতামত প্রকাশিত আছে, এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত বিষয় প্রকাশ করা যাইতেছে। মনুষ্য যাবৎ মনাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট স্থূল শরীর লইয়া এখানে জীবন ধারণ করে,তাবৎ সে রূপ-রসাদি প্রাকৃতিক-ভোগে রত থাকে; অর্থাৎ তাহার চক্ষু, বাহ্য-বিষয়ের বর্ণ ও রূপাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়,—কর্ণ, শব্দাদি শ্রবণ করে, ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ আপনাপন উপভোগ্য বিষয় লইয়া বিচরণ করে'। জীবের শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির এই রূপ যোগাযোগ সম্বন্ধ, তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। যখন মৃত্যু হয়, তখন যদিও মনুষ্য-শরীর নষ্ট হয়; কিন্তু তাহার আত্মা একরূপ দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। যেখানে দেহ বিদ্যমান থাকিবে, সেখানে তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মাধীন হইয়া চলিতে হইবে। মৃত্যুর পর মনুষ্য যে দেহধারণ করে, উহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, যেরূপই হউক, দেহ সত্ত্বে আত্মাকে প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিবার জন্য, কোন সুখদায়ক লোকে যাইয়া সুখভোগ করুক, অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক লোকে যাইয়া, কষ্টভোগ করুক, এ দুই অবস্থায়, তাহার একরূপ না একরূপ, দেহ থাকিবেই থাকিবে। মন ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা, সুখ-দুঃখের ভোগাভোগ হইয়া থাকে; সুতরাং যতক্ষণ জীবের সুখ-দুঃখের ভোগাভোগের পরিসমাপ্তি না হইবে, ততক্ষণ জীব মনাদি ইন্দ্রিয় হইতে বিরত হইয়া, নিষ্কাম-ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে না। যখন জীবের নিষ্কামভাব আসিয়া উপস্থিত হয়,তখন তাহার কোন দেহ-ধারণের আবশ্যকতা থাকে না; এ কারণ সুখ-দুঃখ পাইবার কোন কামনা, তাহার মনে স্থান পায় না। সাধারণ সুখ-দুঃখ নিষ্কাম যোগীর নিকট ভিন্নভাব,—তদবস্থায় দেখিলে, তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া বোধ হয়। যাহার বাসনা-বীজ অন্তরে নিহিত থাকে,

সেইই প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখভোগী হয়। যাহার বাসনা-বীজ যোগানুষ্ঠানের বলে, বিধ্বংস হইয়াছে, তাঁহার ভোগের কোন কারণ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দেহ মনের উপভোগের উপকরণ। যদি ঐ মনে উপভোগের বাসনা না থাকে, তবে কোন প্রকার দেহেরও প্রয়োজন হয় না; সুতরাং যাহার দেহ বর্ত্তমানে ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ পায়, অর্থাৎ বাসনা-বীজ বিদগ্ধ হয়, তাহার পক্ষে কি এখানে, কি ভিন্ন লোকে, যেখানে তাহার মনে এরূপ ভাব জন্মিবে, সেখানেই তাহার মোক্ষ-পদ লাভ হয়।

তৈলাধার, তৈল, বর্ত্তি ও অগ্নি ইহাদের পরস্পর সংযোগে যখন জ্বলিতে থাকে, তখন উহাকে প্রজ্বলিত দীপ কহে। এইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনাদি সংযোগে যে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি পায়, সাধারণতঃ তাহাকেই জীব বলে। দীপাধারের তৈল ও বর্ত্তি পুড়িয়া নিঃশেষিত হইলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; কিন্তু ঐ অগ্নি যে একবারে ধ্বংস পাইল, এমনও নহে। অগ্নির অস্তিত্ব কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই রক্ষা পায়, অর্থাৎ আদি পাঞ্চভৌতিক অগ্নি ধ্বংস হইবার নহে। তদ্রূপ জীব যোগ-বলে যখন আপনার বাসনা-বীজ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া, জীবত্বের ধ্বংস করিতে পারে, তখনই তাহার আত্মা পরমাত্মায় যাইয়া মিলিত হয়। আত্মার আদিভাব যখন পরমাত্মা, তখন সেই আত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত না হইয়া আর থাকিতে পারে না। ইহাকেই জীবের প্রকৃত মোক্ষ-পদ বলে।

এ বিষয়ে এতর্কও উপস্থিত হইতে পারে যে, এ সংসার ছাড়া, যখন অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক রহিয়াছে, তখন অপরাপর লোকে যাইয়া, তথাকার কার্য্য-সমাপ্ত না করিলে, কি প্রকারে মনুষ্য এইখানেই মোক্ষ-পদের উপযোগী হইবে? এ বিষয়ে আমাদের

শাস্ত্রকারেরা এই ভাবে ইহার উত্তর দিয়া থাকেন,—ঈশ্বর সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ,—তিনি সকলেরই নিয়ন্তা ও পুরস্কর্ত্তা,—তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ, তখন সকলেরই অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অচ্ছেদ্য-সূত্রে নিবদ্ধ রহি-য়াছে,—তিনি যখন সে সকলেরই অন্তরের ভাব জ্ঞাত হইতেছেন, তখন তাঁহার রাজ্য ছাড়া, কেহই অন্যত্র থাকিতে পারে না। যে আত্মা তাঁহার স্বরূপভাবে আসিয়া পরিণত হয়, তখন সে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব ধারণ করে,—তখন ঐ আত্মার সহিত পরমাত্মার কোন ভিন্নভাব থাকে না; সুতরাং এরূপ আত্মা কেনই বা মোক্ষ-পদ লাভ না করিবে? আত্মার বিশুদ্ধতাই যখন মোক্ষের কারণ, তখন জীব যে লোকে থাকিয়া, তাহার কার্য্য করিয়া লইতে পারে, তাহার পুরস্কার, সে এখানে থাকিয়া, কেনই বা প্রাপ্ত না হইবে? বিশুদ্ধ-সত্ব পরমাত্মা সকল আত্মার আদিভাব। ঐ আত্মা, জীবের মোহ বশতঃ যত দিন অস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, মলিনতা আবরণে আবৃত থাকে, তত দিন, সে স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হয় না। যখন যোগানুষ্ঠানের নিয়ম পালনে, সে বিশুদ্ধতার চরম সীমা লাভ করে, তখনই ঐ ব্রহ্মালোকে তাহার বাসনা-বীজ ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং সে পরব্রহ্মের সহিত যুক্ত না হইয়া, আর থাকিতে পারে না। যেরূপ স্বর্ণ অনল-তাপিত হইয়া, মল-ত্যাগ করিয়া, নিজ-রূপ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তিযুক্ত সাধকের আত্মা কর্ম্ম-বাসনাকে দগ্ধ করিয়া, পরমাত্মার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

ভোগ-বাসনা, দেহ ধারণের কারণ। যাহার ঐ বাসনা মনে নিরঙ্কুর হয়, তাহার উপভোগ্য কোন রূপ দেহ ধারণও হইতে পারে না। যে ক্ষমতায় জীব মোক্ষ-পদ লাভ করে, তাহার যখনই ঐ ক্ষমতা আসিয়া দেখা দেয়, তখনই সে উপযুক্ত

পুরস্কার লাভ করে। প্রতি কার্য্যের সঙ্গে এক একটি বিষয়ের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহাকে অতিক্রম করিয়া চলা, কাহারও ক্ষমতায়ত্ত নহে। এ সংসারের কার্য্যে, এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে মদ্যপায়ী, সে মদ্যপায়ীদের দলভুক্ত হইতে প্রয়াসী,—যে বেশ্যাসক্ত, সে তাহার তাদৃশ বন্ধুবান্ধবগণের সহযাত্রী হয়,—যে ধর্ম্মপরায়ণ, সে ধার্ম্মিকজনের সহবাসপ্রিয়; ইত্যাকার লোক সকলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, ইহাতেও প্রকাশ পাইবে, যে, যেরূপ সংসর্গের অনুরূপ, সে সেই স্থান অধিকার করিয়া লয়। এক ধর্ম্মীর লোক, ভিন্ন ধর্ম্মীর সংসর্গে থাকিতে কখনই অভিলাষী হয় না,—তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা সত্ত্বে, তাহাকে অনুরূপ সংসর্গের অনুবর্ত্তী হইতে হইবেই হইবে। এই রূপ, যে কার্য্যের, যেরূপ পরিণাম ফল নিশ্চিত রহিয়াছে, তাহার বৈপরীত্য ঘটিতে পারে না। এ স্থলে যে বিদগ্ধ বাসনাবীজ, মোক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার বিপরীত কার্য্য; অর্থাৎ তাহার পুনর্জন্ম গ্রহণ করা, ইহা কখনই হইতে পারে না।

কাহার মন কোন্ সময়েও কোন্ সূত্রে পরিবর্ত্তনের দিকে যাইবে, ইহা যদিও নিরূপণ করা যায় না; তথাপি স্থান বিশেষে সামান্য কারণেও কত লোকের মন পরিবর্ত্তিত হইবার বিষয় দেখা শুনা গিয়া থাকে। কোন নিদারুণ শোক-দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে, অথবা কোন বীভৎস বিষয় দর্শন করিলেও অনেকের মনে বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু সাধুদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। বিবেক-বুদ্ধি হইতেই তাঁহাদের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহাদের মনে বিনা কারণে বৈরাগ্যোদয় হয়, তাঁহারাই মহাত্মা, মহাপ্রাজ্ঞ ও যথার্থ অন্তঃসারবান। প্রকৃত বৈরাগ্য মহৎতত্ত্ব লাভের একমাত্র

উপায়। এই বৈরাগ্যের সঙ্গে যখন সাধকের অচলা ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া মহাপ্রেমভাবের সঞ্চার হয়, তখনই তাহার মোক্ষ-পদ লাভের অধিকার জন্মে।

মোক্ষ সম্বন্ধে হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এই সকল নিগূঢ়-তত্ত্ব আছে বলিয়াই, ইহার এতদূর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। মোক্ষ জীবের চরমাবস্থা। যে নিজের শেষ-গতি পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সে কেমন করিয়া, উহার সর্ব্বোচ্চ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে? ধর্ম্মার্থীর মোক্ষ-জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্ম্মের প্রকৃত-পথ ধরা হয় না এবং প্রকৃত পথ ধরা না হইলেও, প্রকৃত ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মে না। এ সংসারে ধর্ম্ম-ভাব নানা প্রকারে প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম, যেমন পরিশুদ্ধ ও অন্তরের প্রকৃত ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের মহৌষধ, এমন আর কোন ধর্ম্মেই দেখা যায় না। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের মূলে প্রবেশ করেন না, তাঁহারা কেমন করিয়া, হিন্দুর গৌরব ও হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিবেন? কেবল-হিন্দু-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া,কেহই হিন্দু-ধর্ম্মের সারতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না। যদি ধর্ম্ম-পালন করা কর্ত্তব্য হয়,—যদি ঈশ্বরকে লাভ করা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়; কেবল হিন্দু কেন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকেও অনুরোধ করি, তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, তাঁহাদিগকেও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অধিকারী করিয়া, যথার্থ মোক্ষ-পদের উপযুক্ত করিবে। ধর্ম্ম আমার যেমন হিতকারী, তোমার পক্ষেও তেমনই এবং তেমনই সমস্ত জগতের হিতকারী। ধর্ম্ম-হারা লোকের দুঃখ-দুর্গতির আর অবধি থাকে না। বাহ্য-জ্ঞানে মনুষ্যের সুখৈশ্বর্য্যের সঙ্গে কেবলই অনর্থ উৎপাদন করিয়া দেয়। সে যদি অন্তর্জ্ঞানে আপনাকে জ্ঞানবান করিতে পারে, তাহা যেমন তাহার অনন্ত সুখের হেতুভূত হয়, এমন আর

এ সংসারে কিছুই দেখা যায় না। মনুষ্যমাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত, কিন্তু সকলে যদি উহার প্রকৃত পথ ধরিতে পারে, তবে কি এ সংসারে অধর্ম্মের স্রোতঃ এত বাড়িতে পারে? যথার্থ ধর্ম্ম, মনের অন্ধকার নাশ করিয়া, জীবের যথার্থ গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। জীব যত দিন না আপনার কর্ত্তব্য ও গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা করিবে, ততদিন সে ভ্রম-প্রমাদে পড়িয়া, কেবল দুঃখভোগ করিবে। যে পথ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা করিলে, ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল ঈশ্বরে মন-সমাধান করিতে পারা যায়, তাহাই মোহ-বিনাশের মহৌষধ। ঐ মোহকে হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অবিদ্যা বলে। জীব যত দিন ঐ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া চলে, ততদিন তাহার গন্তব্য পথ স্থির হইয়া উঠে না। সমস্ত জগৎ ও আর যত লোক আছে,—ঐ সকল স্থলেও অবিদ্যার প্রকোপ বিদ্যমান আছে। যিনি যে লোকে থাকিয়া, ঐ অবিদ্যার পরাক্রম হইতে রক্ষা পাইয়া, আপনার আত্মার বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান বলবৎ হয়। যিনি ঐ জ্ঞানের চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হয়েন, তাঁহারই মোক্ষ-পদ লাভ হয়। ইহাই জীবের শেষ গতি এবং ইহাকে লাভ করাই জীবের প্রধান বিষয়।

মোক্ষ-যোগের প্রধান বিষয় ভক্তি। অন্তরে অচলা ভক্তির উদ্রেক না হইলে, কেহই মোক্ষ-পদ লাভের অধিকারী হয় না। এ কারণ এক্ষণে ভক্তি-যোগের বিষয় বলা আবশ্যক হইতেছে।

৫। ভক্তি-যোগ।

যোগ-মার্গে প্রবেশ কর, দেখিবে, সাধকের সৎসঙ্গ লাভ করা যেমন প্রার্থনীয় বিষয়, ভক্তি-মার্গে পদার্পণ করা, তেমনই ভক্তের প্রধান কাজ। একে সাধু-সঙ্গ লাভ হওয়াই দুর্লভ, যদি ভাগ্যক্রমে কোন সাধুর সমাগম হয়, হয় ত নিজ মনোমালিন্য বশতঃ তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিতে পারা যায় না; সুতরাং সকলের অদৃষ্টে সাধু-লাভ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। যদি কোন সাধুকে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার অন্তর্নিহিত সাধনসিদ্ধ ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান-লাভ করা, সহজ ব্যাপার নহে। তবেই দেখ, সাধু-সমাগম হইলেই যে, সৎসঙ্গ লাভ হইতে পারে, এমনও নহে; তথাপি সাধু-সমাগম কখনই ব্যর্থ হয় না। তাঁহার আগমন ও দর্শনে নিজ অধিকার অনুরূপ ফল-লাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, ভগবৎ কৃপা-বলে, তাঁহারই যথার্থ সাধু-সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে, ভগবৎ কৃপা-বল লাভ হয় না এবং ঐ সময় সাধুর সমাগমও হইয়া উঠে না। যখন যাহার ভাগ্যে সাধু-সমাগম হয়, তখন ঐ সাধু নিজ-ভাবে তাহাকেও অনুরঞ্জিত করিয়া লয়েন এবং উহাতেই তাহার হৃদয়-কপাট খুলিয়া যায়। ভগবান নিজে ভক্তাধীন। ভক্তিযুক্ত সাধুর ক্রিয়া-কলাপ, কেবল তাঁহার লীলা মাত্র। ভক্তগণের দ্বারাই জগতে তাঁহার এই মহিমা প্রচারিত হয়।

সাধনে ব্যাপৃত থাকলে ও উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলে, সাধকের ভাবী উন্নতির সূত্রপাত হয়। আর সাধু-সেবায় নিয়ত রত থাকিলে, মনের উদারতা গুণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পরার্থে নিজ বিষয়ের দান এবং আপনাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা, প্রকৃত ত্যাগ-স্বীকারের কাজ। জীবনে যত কেন বাধা আসিয়া পড়ুক না, অবসর পাইলেই সাধনে লিপ্ত হওয়া, এবং আপনার অবস্থা যত কেন হীন হউক না, সাধ্যানুসারে সাধু-সেবায় রত থাকা, নিষ্কাম ধর্ম্মার্থীর নিত্য-কার্য্যের প্রধান অঙ্গ।

যেখানে জ্ঞান, সেই খানেই মনের বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান-বলে আমরা বস্তুর স্বরূপভাব অবধারণ করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, বস্তুগত প্রকৃত-ভাব আমাদের আয়ত্ত হইবার নহে। এই জন্য, যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞানে প্রতিপন্ন হইতে পারে, এ কথা সত্য ; কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে গেলে, ভক্তি-মার্গ আশ্রয় বিনা উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর ভক্তাধীন। তিনি কেবল অকৃত্রিম ভক্তির গুণে, ভক্তের মানসাকাশে আসিয়া দর্শন দেন।

কেবল ভগবানের স্বরূপ ভাব মনে অনুধাবন করিতে পারিলেই জীবের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না। ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভক্তিই প্রশস্ত পথ। ভক্তি বিনা সাধনে যোগ দেওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্তি-বিহীন অন্তর সর্ব্বদাই বিষয়াস্বাদে বিব্রত হইয়া, উহাতেই মগ্ন হইয়া যায়,—এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়। যে শরীরে বলবতী ভক্তির স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, সেখানে বিষয়াসক্তি বলহীন হইয়া পড়ে ; সুতরাং ক্রমে প্রকৃত বৈরাগ্য আসিয়া স্থান পায়। জীবের জীবন ধারণোপযোগী পানাহার ভিন্ন, যে সুদীর্ঘ অবসর কাল থাকে, তাহাতে ভগবৎচিন্তা ও তদ্বিষয়ক কথোপকথন বিনা, ধর্ম্ম-ভাব প্রস্ফুটিত হয় না। মন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, যত অন্য বিষয়ের চিন্তায় ঘূরিয়া বেড়াইবে, ততই রজস্তমোগুণের আবেগ আসিয়া ঐ মনকে ভুলাইতে থাকিবে। যতই ঈশ্বরে প্রীতি-

ভক্তির আধিক্য হইবে, ততই তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হই-বার উপায় হইয়া উঠিবে ; সুতরাং ভক্তি-বীজ পুষ্ট না হইলে, সাধকের সাধনা বিশেষ কার্য্যকারকের হয় না।

ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব নিবেদন ও তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা, ভক্তির একটি প্রধান লক্ষণ। যে ব্যক্তি নিজে যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয় বলিয়া বোধ করে, ঈশ্বরে তৎসমস্ত নিবেদন করা, ভক্তির কার্য্য। তন্মধ্যে দেহীর আত্মা যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এমন আর কোন বস্তুই নাই। অতএব আত্মাকে ঈশ্বরে নিবেদন করা, ভক্তিমানের যেমন প্রধান কার্য্য, এমন আর অন্য কিছুই দেখা যায় না।

সাধকের প্রধান বল ভক্তি। ঐ ভক্তি যখন ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেমস্বরূপা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধি-লাভ করে। প্রকৃত ভক্তি যাঁহার হৃদয়ে একবার বদ্ধ-মূল হয়, তাঁহার অন্য কোন সাধনা আবশ্যক হয় না,—তাঁহার মুক্তি ঐ সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি প্রকৃত ভক্তিমান, তিনি সদাই আনন্দময়, ভোগ-বাসনা তাঁহার অন্তরে স্থান পায় না ; সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তির কেমই বা মুক্তি না হইবে ? বাহ্য-বিষয়ে চেষ্টা ও ক্রিয়াদি রহিত না হইলেই শোক-দুঃখ ও বিষয়-তৃষ্ণা-ঘটিত মানসিক ব্যাপার আসিয়া, মনকে আক্রমণ করে ; কিন্তু প্রকৃত ভক্তিমানের নিজগুণে, তিনি এ সকলে বিসর্জ্জন দিয়া, অন্তরে কেবলই পূর্ণানন্দ অনুভব করেন। তখন বৈরাগ্য তাঁহার প্রধান কার্য্যসাধক হইয়া উঠে।

বৈরাগ্য ভক্তির মূল,—ভবার্ণব পারাবারের সুগম যান। যে যানে আরোহণ করিলে, চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের চাপল্য রহিত হইয়া পড়ে,—কোথা হইতে মনে অযাচিত অচলা ভক্তির প্রস্রবণ আসিয়া দেখা দেয়। যাহা বিনা এই ভবসিন্ধু-পারের অন্য কোন উপায় নাই। যিনি যত্ন করিয়া, এই বীজ হৃদয়ে বপন করিতে

পারেন, তাঁহারই সাধনার গুণে ক্রমে উহা ভক্তি-গঙ্গা রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। যখন ভক্তি-তরঙ্গিণীর উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে থাকে,—তখন উহা মহাসমুদ্রে যাইয়া, না পড়িয়া আর থাকিতে পারে না। এখন হইতে ঐ গঙ্গা সামুদ্রিক ভাবে পরিণত হয়। জোয়ার ভাঁটা তখন ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তির ন্যূনাধিক্য অনুসারে ইহাদের ক্রিয়ার ইতর বিশেষ হইতে থাকে। যখন ভক্তির স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া পড়ে,—মন নীরস ভাব ধারণ করে, তখন যেন ভাঁটার নিম্নগামী টান আসিয়া হৃদয়কে বিশুষ্ক করিয়া দেয়। আবার অনুতাপ, অনুরাগ ও বিরহের নিদারুণ যন্ত্রণার জ্বালায় মন যখন আকুল হইয়া পড়ে,—অনর্গল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন হইতে থাকে, তখন উজান স্রোতঃ আসিয়া, জোয়ারের ন্যায় অন্তরকে পরিপূর্ণ ও শীতল করিয়া দেয়। দিবারাত্র জোয়ার ভাঁটার ক্রিয়া বলবৎ থাকাতে, নদ-নদীর জল-সংস্কারের যেমন একটি প্রধান উপায় রহিয়াছে, ভক্তের অবতার দয়া করিয়া তেমনই মনুষ্যের অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিচালন জন্য ভক্তি-বৃত্তিটি প্রদান করিয়াছেন। ঐ ভক্তি বিনা চিত্ত-শুদ্ধি ও ভক্ত-বৎসল ভগবানে যোগ দেওয়া যায় না।

ভক্ত-বৎসল ভগবানের স্বরূপ ভাব কেবলই প্রেমময়। ভক্তি ঐ প্রেমের উৎপাদক। সামান্য ভক্তি যখন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিগত হইয়া প্রেমাকারে পরিণত হয়, তখনই তাঁহাকে লাভ করিবার উপযোগী হইয়া উঠে। যখন ঐ প্রেম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য প্রবল হইয়া উঠে, তখন উহাকে মহাপ্রেমভাব বলে। ঐ মহা-প্রেমভাবের গুণে সাধক প্রেমময়কে লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা-তেই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রেমভাবের মূল কেবল একমাত্র ভক্তি, এবং ঐ ভক্তির আশ্রয় বিনা কাহারই এ ভাবে পরিণত হইবার উপায় হইয়া উঠে না।

সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তি-সাধন অতিশয় সহজ ও সুলভ। এ সাধনে বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-মান, আচার-বিচার, এ সকলের প্রয়োজন নাই। কেবল মনকে সংযত করিয়া ভগবৎ-ধ্যানে রত থাকিতে পারিলেই সফলকাম হওয়া যায়। প্রথমে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা, এ সাধনের প্রধান বিষয়। একবার ভক্তি-পটের সংক্রমণ হইলেই ভক্তের মনোমালিন্য দূর হইয়া যায়, তৎপরে ভগবানের মনোহর মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব' আসিয়া, তাহার মানস-পটে অঙ্কিত হয়। তখন তাহার দেখাশুনা, ভাবনা-চিন্তা, সকলই ঈশ্বরকে লইয়া কার্য্যে পরিণত হয়,—তিনি কখন তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি নিজ-হৃদয়াকাশে দর্শন পান,— কখন তাঁহার অমৃতময় বাক্য সকল আসিয়া, তাহার কর্ণকুহরের সন্তোষ বিধান করে,—কখনও বা তিনি অলৌকিক নব নব ভাবে বিভোর হইয়া, হৃদয়-মন সকলই তাঁহার চরণে সমর্পণ করেন। একবার ভক্ত-জনের ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিলে, ভক্তি-তরঙ্গিণী পরিপূর্ণা হইয়া যায়,—প্রবল তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া পড়ে। এ সময়ে কখন তিনি নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হয়েন,—কখন বা ভাসমান হইয়া উঠেন। ভক্তি-গঙ্গায় স্নাত ব্যক্তি কখন উচ্চ হাস্য করিতে থাকেন,—কখন ক্রন্দন করেন,—কখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন,—কখন বা জড়ের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করেন। একবার এ স্রোতঃস্বতীর স্রোতঃ বহিতে আরম্ভ করিলে, কখন ঊর্দ্ধ-দেশে উঠিতে হয়,—কখন অধোদেশে যাইতে হয়,—অধঃ ঊর্দ্ধ ও ঊর্দ্ধাধোভাবে বিচরণ করা, ইহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। এইরূপে জীব যখন ভক্তি-সাধনার চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার মোক্ষ লাভের উপায় হইয়া উঠে।

সাধন ভক্তির আকর, আর ভক্তি সুমধুর রসের প্রস্রবণ। সাধক সদ্‌গুরুর কৃপা-বলে যতই সাধনে অনুরক্ত হইয়া পড়ে

ততই তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন সে তাহার শরীররূপ গৃহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই অধিকারের বলে সে মণিপুর, সাধিষ্ঠান, মূলাধার, পাতাল, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, দ্বিদল, সহস্রার ইত্যাদি আধ্যাত্মিক স্থানে বিচরণ করিয়া, আপনার সাধন-কার্য্যে লিপ্ত থাকে। তখন ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুযুম্না নাড়ী তাহার কার্য্য-সাধক হইয়া উঠে। সাধনে যোগ ও সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন এ সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না। সুতরাং সবিশেষ বলার প্রয়োজন নাই। মনুষ্য সাধনে লিপ্ত থাকিয়া, নিজ-দেহ দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে, এই জন্য তাহার দেহকে দেহ-তরি বলা হয়। ইহা উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে, সংসার-সমুদ্র পার ও ভব-বন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হয়।

ভক্তি-যোগের একটি বিষয় গুরুভক্তি, অপরটি সাধনে দৃঢ় বিশ্বাস। আর সাধু-সেবা ইহার আনুসঙ্গিক বিষয়। যত প্রকার যোগ আছে এবং উহাদের প্রত্যেকের যত প্রকার সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, এ সকলই গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। যদি শিক্ষার্থীকে প্রথমে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস ও সাধন-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে না হইত, তাহা হইলে কেহই কোন বিষয়ের চরম সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিত না। গুরুর প্রতি অচলাভক্তি দেখিলে, সুর্ব্বলোক পিতামহের করুণা তাহার উপর বর্ষণ হইতে থাকে; সেই করুণা লাভ করিয়া সে নিজে সিদ্ধ হইয়া পড়ে। যাহারা অভিমানবশতঃ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত গুরুভক্তিতে অবহেলা করিয়া থাকেন, তাহাদের কোন সাধনায় ফল-প্রাপ্তির কিছুই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এই ভক্তি-যোগ জীবের বড়ই দুর্লভ ও আদরের ধন। এ যোগে গুরুই সর্ব্বময় কর্ত্তা,—তিনিই ইহ-জগতের পরিত্রাণ-বিধাতা। তাঁহার অনুকম্পা না হইলে, ভগবৎ-কৃপা-লাভের

বিস্তর অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। যে অন্যের নমস্য, তাহার নমস্য এ জগতে কেহই নাই, যে এই ক্ষুদ্রভাব অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মত হতভাগ্য আর দেখা যায় না। প্রত্যেক জীবে যখন শিবভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন যতক্ষণ না এই ভাব মনে উদিত হইবে, ততক্ষণ কাহারই অন্তরে উদারতাগুণের উদ্ভব হইবে না। এই মহৎ উদারতা গুণ না জন্মিলে, ভক্তির স্রোতঃ কখনই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। যেখানে এই গুণের আধিক্য দেখা যায়, সেখানে গুরুর প্রতি শিষ্যের যে অচলাভক্তি প্রকাশ পাইবে, তাহার ত কথাই নাই; অধিকন্তু গুরুও শিষ্যকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারেন না। মনের যথার্থ উদারতা ও ভক্তির এই অসাধারণ ভাব। সংক্ষিপ্ত কথায় যেমন মহৎ একটি ভাবের বিষয়, সবিশেষ প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ সংক্ষিপ্ত ভক্তিতে ভক্তবৎসলের সম্পূর্ণ স্নেহভাজন হওয়া যায় না। যে ভক্তির স্রোতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল প্লাবিত হইয়া যায়,—যেখানে তাদৃশ ভক্তির আবির্ভাব হইবে, সেই খানেই ভগবৎ-কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়। যে মানুষ সাধুকে চিনিতে না পারে, সে কিরূপে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে?

ভক্তিযুক্ত সাধকের ভাব অনির্ব্বচনীয়! সেই আনন্দময়ের কৃপা ভিন্ন কে ইহা লাভ করিতে পারে? বোবা ব্যক্তি যেমন কোন সুমিষ্ট রসাস্বাদন করিয়া, কেবল আনন্দে গদ্‌গদভাব প্রকাশ করে,—রসের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তদ্রূপ যখন মনুষ্যের মনে প্রেমের আধিক্য হইয়া পড়ে, তখন কেবল আনন্দের গদ্‌গদ ধ্বনি ভিন্ন, আর কিছুই প্রকাশ পায় না। প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ সে নিজে উপভোগ করিয়াও যখন তাহা বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারে না, তখন অন্যের নিকট ইহা প্রকাশ করা বড়ই দুষ্কর বিষয়। যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, মনুষ্য

এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হয়,—আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণানন্দের ফলভোগ করে, তাহার মূলে অনুসন্ধান লও, দেখিবে, অকৃত্রিম ভক্তি ভিন্ন আর ইহাতে কিছুই নাই ; অথচ ইহার স্বরূপ ভাব ব্যক্ত করা যায় না।

কত মুনি ঋষি ও যোগী কেবল জ্ঞানবলে, ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তপস্যাব্রতপালনের কতই কষ্ট ভোগ করিয়া আসিয়াছেন,—শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি পূর্ণানন্দের দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই ; কিন্তু যখনই তাঁহাদের অন্তরে অচলা ভক্তির স্রোতঃ আসিয়া দেখা দিয়াছে, তখন আর কাহাকেও নিরানন্দে কাল কাটাইতে হয় নাই। জ্ঞানে, জ্ঞানীর গর্ব্বের আভাস প্রকাশ পায়, কিন্তু ভক্তের ভক্তি, ইহার বিপরীত পথ ধরিয়া চলে। বাদ, প্রতিবাদ, দ্বেষ, হিংসা, এ পথে নাই,—সদ্ভাবে পূর্ণ থাকা, এ পথের প্রধান বিষয়। ভক্তিমানের ক্রিয়া-কলাপ যেমন সকলেরই হৃদয়গ্রাহী, দয়াময়ের প্রেম-সুধা লাভ করার পক্ষে, ইহা তেমনই সহজ উপায়। যিনি জ্ঞানদাতা,—সম্পূর্ণ জ্ঞানময়,—যাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তাঁহার নিকট মনুষ্যের এই সামান্য জ্ঞান কেমন করিয়া শোভা পাইতে পারে? এই জন্য তিনি জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্তিমানকে প্রেম-দানে কদাচ বঞ্চিত করেন না। যিনি জ্ঞান ও ভক্তির এই ইতর বিশেষ জানিয়া সাধনে যোগ দেন, তাঁহারই মনস্কামনা আশু শুভদায়ক হয়।

যে প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া, কার্য্যে রত থাকিলে, মনুষ্য যোগসাধনের ফললাভ করিতে সমর্থ হয় ; এক হরিনাম সাধনের গুণে, তাহাকে সেই প্রণালীর অনুমোদিত যোগফলের অধিকারী হইতে দেখা যায়। কলিতে জীবের পরমায়ুঃ নিতান্ত স্বল্প। জীব স্বল্পায়াসে,—অল্প সময়ের মধ্যে ঐ যোগ-পদ্ধতি লাভ করিতে পারিবে বলিয়া,দয়াল হরি, জগতে নিজ-নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন।

যুগে যুগে মনুষ্যের পরমায়ুর যেমন ন্যূনাধিক্য হইয়া আসিতেছে, ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে তেমনই ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাকেই যুগ-ধর্ম্ম বলে। এক পক্ষে সংসারের অশেষবিধ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বে পুষ্ট করা যেমন সহজ ব্যাপার নহে; তদ্রূপ প্রকৃত যোগাঙ্গ ধরিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করা সুসাধ্য নহে, কিন্তু তাঁহার নামের এমনই মাহাত্ম্য, যে সাধক গুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঐ নাম লইয়া সাধন-কার্য্যে রত থাকে, তাহার ক্রমেই অন্তরের বল বাড়িয়া যায়। যত অন্তরের বল বাড়িতে থাকে, ততই সংসারাসক্তির হ্রাস পায়; সুতরাং এখানকার নানাপ্রকার প্রলোভনে আর তাহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না,—তখন সে সংসারের উপযুক্ত পথ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা পায়। একবার মনে জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে, জীব সংসারের সকল প্রকার প্রলোভন,—সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে পারে; এই জন্যই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বল্পায়াসে মনুষ্যকে উদ্ধারের পথে লইয়া যায়। এই যে নাম-সাধন, ইহাতে যদিও মনুষ্যকে যোগাঙ্গ ধরিয়া চলিতে শিক্ষা দেয়; কিন্তু প্রকৃত যোগ-সাধন যত দূর কষ্টদায়ক, ইহা তাহা অপেক্ষা শত গুণে স্বল্পায়াসসাধ্য। গুরু-সহায় হইলে, এ সাধনে যত শীঘ্র মনুষ্যকে যোগ-পথে আনিয়া দিতে পারে, এমন সহজ আর অন্য কোন উপায়ে দেখা যায় না। এই যোগের মূলে ভক্তি-বৃত্তি উত্তেজিত হইলে, ক্রমে মহাপ্রেমভাবের আবির্ভাব হয় এবং উহাতেই জীবের মুক্তির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

হে সাধক! তুমি যদি এই নাম-মাহাত্ম্য দেখিতে চাও, তবে আপনাকে মৃতভাবে পরিণত করিয়া লও,—দুষ্প্রবৃত্তিকে একবারে পরিত্যাগ কর,—সৎপ্রবৃত্তির অনুমোদিত পথ ধরিয়া চলিতে যত্নবান্ হও,—নামের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং

আপনাকে এমনই অসহায় মনে করিবে, যেন নিতান্ত শিশু সন্তান অপেক্ষাও তোমার ক্ষমতার বল আরও সামান্য। তুমি সর্ব্বদাই কাতর অন্তরে,—অনন্যমনে কেবল গুরুকে প্রধান সহায় ধরিয়া নাম-সাধনে যত্নবান হও, তবেই তোমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দিবে।

"অপরাধ সহস্রসংকুলম্পতিতম্ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্‌ভবতু ভগবন্! পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপম্॥
এতৎ প্রার্থ্যন্মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

হে ভগবন্! আমি সহস্র সহস্র অপরাধ করিয়া এই ভয়ানক সংসার-সাগর-গর্ভে পতিত হইয়াছি। আমি নিতান্ত নিরাশ্রয়, তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ আশ্রিতগণ মধ্যে গ্রহণ কর। ধর্ম্ম বা ধন রাশিতে অথবা বিষয়-ভোগে আমার আস্থা নাই। এ সকল আমার পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফলের অনুরূপ যাহা হইতেছে, তাহাই হউক। হে দয়াময়! তোমার নিকট আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমার যেখানে যেরূপেই জন্ম হউক না কেন, তোমার চরণারবিন্দে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।

উপসংহার।

ধর্ম্ম শান্তি-স্থখের আকর। জগতে ধর্ম্ম আছে বলিয়া, পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ রহিয়াছে। ধর্ম্ম না থাকিলে, এ সংসার যে কিরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিত, যাহা ভাবিতে গেলে, জ্ঞান-বুদ্ধি একবারে লোপ পায়। ধর্ম্মের মধুরতা লাভ করিয়া, পাপী, পাপের বোঝা বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হয়,—পুণ্যাত্মা, অমৃত-সাগরে যাইয়া ঝাঁপ দেন।

অতি পূর্ব্বকালের সত্যধর্ম্মানুরক্ত, পবিত্রাত্মা. সংযত-চিত্ত মহর্ষিগণ,ভারতে যে আর্য্য-ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন,সে ধর্ম্ম অদ্যাপি ধর্ম্ম-জগতের শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছে, ভারত যদিও নিজের সকল প্রকার অধিকার হারাইয়া বসিয়াছে ; তথাপি তাহার এ অধিকার চিরকালই অক্ষুণ্ণ-ভাবে রহিয়া যাইবে। কাল সকলেরই পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু যে বিশুদ্ধ সত্য, অকৃত্রিম ভাব, আর্য্য-ধর্ম্মের মূলে দৃঢ় নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা কোন কালেই বিনষ্ট হইবার নহে। কাল অসত্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে, কিন্তু যথার্থ সত্যের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না।

ভারত, নিজের সম্পূর্ণ স্থখের দিন, সেই দিন হারাইয়াছেন, যে দিন হইতে ম্লেচ্ছ-জাতি আসিয়া ইহাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। এক স্বাধীনতা হারাইয়া, ভারতের দুঃখদুর্গতির আর অবধি নাই। মাতৃহীন শিশুর জীবন ধারণ করা, যত দূর কষ্ট-দায়ক, নিঃসহায়া মাতার পক্ষে সন্তানের শুভানুষ্ঠান করা, তেমনই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমরা যদিও সেই নিজ-মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া আছি সত্য, তথাপি আমাদের মাতা পরাধীনা

হইয়া, যেরূপ সহায়হীনা হইয়া পড়িয়াছেন, এ অবস্থায় তাঁহার সন্তানগণের প্রকৃত কল্যাণ আর কত দূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে সমস্ত মাতৃ-ভক্তিপরায়ণ, মাতার হিতসাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সত্য-নিষ্ঠ, কুলাচার ব্রতপালনে রত এবং ভ্রাতৃ-বৎসল, সন্তান ভারত-মাতার উদরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল তাঁহা-রাই এখন তাঁহার সকল দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দিতে পারেন।

সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে গেলে, মনুষ্যের যে যে সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া, যাঁহারা সমাজের নেতা হইতে পারেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের যত দূর কল্যাণ-সাধন হইতে পারে, অপর কোন বিষয়ে তদ্রূপ দেখা যায় না। যেখানে জাতীয় ভাবের অভাব, সেই খানেই বহুবিধ অমঙ্গল আসিয়া দেখা দেয়। জাতীয়ভাব যেমন স্বজাতির হৃদয়া-নন্দদায়ক,—বৈদেশিকভাব তেমনই ঘৃণিত ও অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠে। এখন যে প্রকার কাল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ঐ ভাবকে রক্ষা করিয়া চলা বড়ই সুকঠিন। যত দিন না ঐ জাতীয়-ভাবের একটা সামঞ্জস্য হইবে, তত দিন হিন্দু-সমাজের শুভ-কামনা করা যাইতে পারে না।

এই ভারত, এক সময়ে মুসলমানদের নিরতিশয় নির্যাতনে পড়িয়াও অশেষবিধ দুঃখ-যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এক্ষণে বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ইংরাজ জাতির শাসনাধীন থাকিয়া, আবার কেন ইহার অবস্থান্তর ঘটিল? এ বিষয়ের আলোচনায় রত হও, দেখিবে, ইহার মূলে আমাদের দোষ পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনই প্রভুভক্ত যে, আমাদের রাজগণ যে সকল জাতীয় অনুদার আচার-ব্যবহারকে পোষণ করিতে পারিতেছেন না, ইহাঁরা এখন উৎকৃষ্ট বোধে সেইগুলির অনুকরণ করিয়া, আপনাদের সমাজকে অলঙ্কৃত করিতে বসিয়াছেন!

কিন্তু তাঁহাদের যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহার ত্রিসীমায় যাইতে একবারে বঞ্চিত রহিলেন ? লাভের মধ্যে ধর্ম্মের বল হ্রাস পাইতেছে,—হিন্দুর কর্ম্ম-কাণ্ড সদোষভাবে দাঁড়াইতেছে,—যথেচ্ছাচার আসিয়া দেশকে মজাইতে বসিয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মের মূল যে দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এখন উহাতে বিজাতীয়ভাব আসিয়া মিশ্রিত হইতেছে,—উহার অন্তঃসার ঢাকা পড়িতেছে,—কোথাও উহা একবারে ম্লেচ্ছভাবে প্রকাশ করিতে বসিয়াছে এবং কোথাও বা একটি উপধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যথার্থ আর্য্য-ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুর অতি আদরের ধন,—যাহা হিন্দু-সমাজের মুখোজ্জ্বল করে,—যাহার ছায়া লাভ করিয়া অতুলানন্দ অনুভব করা যায় ; এখন সেই হিন্দু-ধর্ম্ম বাল্য-খেলায় পরিণত হইতেছে ! ইহার সাকার ও নিরাকার উপাসকদের মধ্যে এমনই ভিন্নভাব আসিয়া দাঁড়ায়াছে যে, কে, কিরূপ উপাসক, ইহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা ভার ! এখন ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের যে প্রকার সময় আসিয়া পড়িয়াছে,—হিন্দু-ধর্ম্মে বিসর্জ্জন না দিয়া, আর তাঁহার সন্তানগণ কিছুতেই নিশ্চিন্তমনে সুখী হইতে পারিতেছেন না ! অধর্ম্ম বলিয়া যে চাতুর্য্য এ জগতে আছে,—এখন উহা এই ভারতকে ছলনা করিতে নিশ্চয়ই বসিয়াছে। পবিত্র তীর্থ-স্থান ও ধর্ম্মালয় প্রভৃতি সাধু সজ্জনের বিভীষিকার স্থল হইয়া উঠিল,—আর দুষ্কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা অবারিত দ্বার হইয়া পড়িল,—ধর্ম্মে ক্রমেই চাতুর্য্যের ভাগ বাড়িতে চলিল,—প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব একবারে ঘোর অন্ধকারে চাপা পড়িতে লাগিল,—এখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, এই ভারতের কত স্থানে কত শত অকার্য্য সাধন হইতেছে যে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতে গেলে, হিন্দুর উজ্জ্বল মুখে অসংখ্য কালিমার চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

হিন্দুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ভাব, কখনই নীচভাবের পোষক নহে। যেখানে নীচাশয়তা দেখা দিয়াছে, সেখানে কখনই হিন্দুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ভাব অমৃতের আধার। যে ঐ রস পান করে, সে নিশ্চয়ই দেশের কল্যাণ-সাধন না করিয়া থাকিতে পারে না। কত যুগ যুগান্ত কাটিয়া গেল, হিন্দুর মূল-ধর্ম্মে, কে দোষারোপ করিতে পারে? জগতে এমন ধর্ম্ম নাই, যাহা হিন্দুর বিশুদ্ধ-ধর্ম্মের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে। আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের এমনই মতিভ্রংশ হইয়াছে যে, পৈতৃক ধর্ম্ম-চর্চ্চায় একবারে বিরত থাকেন, অথচ কতকগুলি উপধর্ম্মের সহিত যোগ দিয়া, পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মে কলঙ্কের বীজ বপন করিতেছেন,—আবার তাহা দেখিয়া শুনিয়া, অনেকে বৈদেশিক আচার-ব্যবহারে যাইয়া ক্রমেই অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছেন; এই জন্যই হিন্দু-ধর্ম্মে সাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন এত কমিয়া যাইতেছে। ভারতের হিন্দু-ধর্ম্মে, এমন একটি পীড়া আসিয়া দেখা দিয়াছে, যাহাতে এই ভারত-সন্তানগণই নিজে নিজে আপনাদের অমঙ্গল ডাকিয়া লইতেছেন, নতুবা এ দেশের কেন এত হীন-দশা আসিয়া উপস্থিত হইবে? ব্যবসায়-বাণিজ্য-সূত্রে, এই ভারতে এক্ষণে বহুতর বৈদেশিক লোকের সমাগম হইতেছে,—তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাব, কেমন সুস্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়! ভারত-সন্তানগণ ক্রমেই দিন দিন আপনাদের ধর্ম্ম-ভাব,—আপনাদের আচার-ব্যবহার ও জাতীয়ভাব হারাইয়া বসিতেছেন! যখন যে দেশের ধর্ম্ম-ভাব, এইরূপে ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন তথায় উপধর্ম্মের বৃদ্ধি ও আচার-ভ্রংশ ঘটে। ভারতে এখন ইহার স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

যে হিন্দু-জাতির আর্য্য-ধর্ম্ম লইয়া, তাহাদের বিশেষ গৌরব

সমস্ত জগৎ ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, আজ সেই ভারত পর-ধর্ম্মের ভাবগ্রহণ করিবে,—বিজাতীয় ভাবে পরিণত হইবে; ইহা দেখিলে কে না মর্ম্ম-বেদনায় ব্যথিত হয়েন? কল্য যে ধনে, তুমি ধনবান ছিলে, আজ তাহা কে অপহরণ করিল? একবার ভাবিয়া দেখ? তোমার ধন, তোমার দেশেই রহিয়াছে,—তোমার মনের ভাব বিকৃত হইয়াছে,—তোমার রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাই নিজ-ধনকে বাছিয়া লইতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছ এবং যারপরনাই কষ্টভোগ করিতে বসিয়াছ। তুমি যদি সুবোধ হও,—এখনও সাবধান হও,—আন্তরিক চেষ্টা পাও,—তোমার ধন তোমারই হস্তগত হইবে,—তোমার ধন বহু দূরে যায় নাই। তুমি যাহাদিগকে বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমুন্নত বোধ করিয়া, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম পর্য্যন্ত অনুকরণে চেষ্টা পাইতেছ, তোমার এমন কিছু অভাব উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মের নিকটে তোমাকে ঋণী হইতে হইবে,—যাহাতে তোমাকে আচার-ভ্রষ্ট হইয়া, স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে বঞ্চিত হইতে হইবে? তুমি যে হিন্দু-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ,—তোমার আচার-ব্যবহার, তোমাতে থাকিলে, উহারা যেমন শোভা ধারণ করিবে,—তুমি বৈদেশিক ভাবে যাইয়া মিশিলে, কখনই তেমন গৌরবান্বিত হইতে পারিবে না। তুমি বৈদেশিক ভাবে যতই আকৃষ্ট হইবে, ততই তুমি তাহাদের ও তোমার নিজ ভ্রাতৃগণের যথার্থ উপহাসের পাত্র হইয়া উঠিবে,—তোমার নিজের দোষে উভয় কুল হারাইতে বসিবে। তোমার যদি নিতান্তই মতিভ্রংশ হইয়া থাকে,—তোমার নিজ দোষে স্বজাতীয় সদ্ভাব হারাইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সকলেই তোমার মত জাতি-কুল হারাইতে পারে? তোমার চেষ্টা থাকিলে, দুই এক জনকে সহযাত্রী করিয়া লইতে পার,—তুমি এ রূপ

দুরাশা করিও না যে, হিন্দু-সমাজের সকলে তোমার বশতাপন্ন হইয়া, তোমার উপধর্ম্ম-ভাব গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইবে? হিন্দুর ধর্ম্মভাব যদি অনুন্নত হইত, তাহা হইলে, ইহার মূল এত দিন আর দেখিতে পাওয়া যাইত না। তুমি আধুনিক বিপ্লবকারী—তোমারও পূর্ব্বে কতশত প্রবল ঝটিয়া, ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—এখনও সেই হিন্দু-ধর্ম্মের মূল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তুমি যদি চপলতার প্রকোপে না পড়িয়া থাক, স্থির ভাবে বুঝিয়া কার্য্য কর,—তোমার ধর্ম্ম, তোমাকেই রক্ষা করিবে,—তোমার অন্য পথ ধরিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। তুমি নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গিয়া,ঘোর অন্ধকারে যাইয়া পড়,—তোমার এ জ্ঞান থাকা উচিত যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমার ধর্ম্ম,—তোমার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি আবশ্যক সকল বিষয়ের এমনই সুন্দর পরিষ্কার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যাহার জন্য তোমাকে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না। তুমি যদি একটু অনুসন্ধান লইতে, তবে কি তোমাকে এ রূপ মোহে আসিয়া পড়িতে হইত? তুমি নূতন তণ্ডুলের অন্ন খাইয়া কেন শরীর ও মনের অপকার ঘটাইতে যাও,—তোমার পুরাতন বিশুদ্ধ তণ্ডুল, অখণ্ডভাবে গোলাজাত রহিয়াছে,—তুমি উহা পাড়িয়া বাছিয়া লও,—তোমার মনরূপ অগ্নিতে পাক কর,—দেখিবে ভোজন কালে, উহার সঙ্গে, কত অত্যুপাদেয় ব্যঞ্জন আসিয়া দেখা দিবে। এ তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিলে,তোমার যেমন ক্ষুধা নিবারণ হইবে, এ জগতে এমন কোন অন্ন নাই,যাহা ইহার সমতুল্য হইতে পারে। তুমি এই সঙ্গে ভক্তি-বারি পান কর, যোগাঙ্গ ধরিয়া চল, দেখিবে তোমার মুক্তির দিন অনতিবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

সংসার-চক্র কাহাকেই নিত্য একভাবে থাকিতে দেয় না, তাই এই ভারতের এখন এত দুর্দ্দশা! যে ভারতের

ছোট বড় প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মের সঙ্গে, এত সুদৃঢ় আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই ভারতকেই এত হতশ্রী ধারণ করিতে হইল, ইহার অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ আছে। ইহা কি আরও দুঃখের বিষয় নহে, যে ভারতের এখন এই রূপ দুরবস্থা, কেহ কেহ তাহারই মহোন্নতির জয়-ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহেন! ন্যায় ও যুক্তির কার্য্য যদি দূষ্য হয়, সেখানে যথেচ্ছাচারের কার্য্য, কেন প্রতিষ্ঠা না পাইবে? যে ভারতের প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য-বিধিগুলি নৈসর্গিক ব্যাপারের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়া আসিতে ছিল,—যাহার প্রত্যক্ষ উপাদেয় ফল-লাভ করিয়া, ভারতের অধিবাসিগণ অশেষবিধ সুখ-সম্ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাঁহারা সে সকলের কণামাত্র সুখৈশ্বর্য্য দেখিতে না পাইয়াও যদি পরিতোষ লাভ করেন, তবে জগতে সুখ-দুঃখের মীমাংসা করা, বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে। যাঁহারা বৈদেশিক কতকগুলি কুপ্রথায় মুগ্ধ হইয়া, আপনাদের জীবনকে কলুষিত করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন কে ইহার পোষকতা করিতে পারেন?

ভারতের যে সকল মনীষীরা যোগ-মার্গে পদার্পণ করিয়া, অন্তরেন্দ্রিয়ের পরিচালন ও ধর্ম্ম-জ্ঞানের চরম সীমায় গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আদিষ্ট বিধিগুলি উল্লঙ্ঘন করিয়া, যে সকল মানব সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহাদের কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান কিছুই জন্মে না; সুতরাং তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম-কার্য্য, ধর্ম্ম-জ্ঞানের পোষক, আর ঐ জ্ঞান ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবকে জানাইয়া দেয়। যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া, এখানকার প্রকৃত কাজ বাছিয়া ধরিতে পারিলেন না, তাহাদের আত্ম-জ্ঞান কি প্রকারে জন্মিতে পারে? যাহারা ভোগ-সুখকে এ সংসারের সার কাজ বিবেচনা করিয়া রাখিয়াছে,

তাহাদের নিকট ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই লুক্কায়িত থাকে। যে, যে সুখের অধিকারী হইতে চেষ্টা পায়, অগ্রে তাহাকে দেখা আবশ্যক, কোন্ সুখের কি প্রকার সুখ-দুঃখদায়িকা শক্তি আছে, তৎপরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে, যদি তাহার ফলাফলের বিষয় চিন্তা করা হয়, তাহাতে ধর্ম্ম-জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তৎপরে তৃপ্তি-সুখের আকর যে ধর্ম্ম-বন্ধু, তিনি তাহার সহচর হইয়া উঠেন। এ অবস্থায় তুমি গৃহী হইয়া সংসারে থাক, বা উদাসীন হও, এটি তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে; কিন্তু এটি স্থির, ধর্ম্ম-সাধন বিনা, তুমি কোন আশ্রমেরই উপযুক্ত ফলভোগের অধিকারী হইতে পারিবে না। ধর্ম্মের সঙ্গে এ সংসারে তোমার যে যোগাযোগ রহিয়াছে, তুমি যদি তাহা পালন করিয়া চলিতে পার, তাহাতে তোমার যেমন গৌরব বাড়ে, কেবল উদাসীন হইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলে, তত ফল প্রত্যাশা করা যায় না। ধর্ম্ম, গৃহী, উদাসীন উভয়েরই আদরের ধন,—ধর্ম্ম, জীবন-সংসারের প্রধান উপায়। গৃহী হইয়া ধর্ম্ম-পালন করা যায় না, মনের এই ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা ঘোর বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া লয়েন। মনুষ্যের উৎপত্তি, গৃহীর গৃহে,—সেই গৃহকে আশ্রয় করিয়া, সে প্রতিপালিত হয় এবং তাহার জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ সকল বিষয়ের পরিচয় দিয়া, আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, এই গৃহই মনুষ্যের সকল মঙ্গলের আলয়। তোমাকে সংসারে থাকিবার কালে কোন না কোন রূপ গৃহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবেই হইবে,—সে গৃহ, যেরূপ কেন হউক না, এই জন্যই তোমাকে গৃহী বা আশ্রমী বলে। তোমার শরীর যদি নানাবিধ উৎকট রোগে জর্জ্জরিত হয়,

তাহা হইলে তুমি সেই শরীরের মধ্যে থাকিয়া, যেমন সুখী হইতে পার না ; তদ্রূপ তোমার আত্মীয়-স্বজন যদি বহুবিধ দোষে দূষিত হইয়া, বিধিমতে আশ্রম-পীড়া আনিয়া দেয়, এ রূপ আশ্রমও তোমার অপ্রিয় ও অসন্তোষের কারণ হইতে পারে ; কিন্তু যে আশ্রমে থাকিয়া,তোমার শরীর ও মনের বল দিন দিন উন্নত হইয়া, ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিবে,এ রূপ আশ্রম তোমার কেনই বা প্রিয় না হইবে ? তুমি যদি আপন ধর্ম্ম-বল বজায় রাখিয়া, ঈশ্বরের প্রেমে রত থাকিতে পার, তবে তুমি সংসারাশ্রমের সুফল কেন না উপভোগ করিতে পারিবে ? আর সংসারাশ্রমে থাকিয়া, যদি নিয়তই অধর্ম্মপথে বিচরণ কর,—তোমার স্বভাব এমনই কদর্য্য হইয়া উঠিবে যে, তোমাকে এ অবস্থায় বিজন গহন বনে রাখিয়া আসিলেও কোন না কোন পাপ-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইবে। তুমি অভ্যাসের দাস,—তুমি যেমন দেখিবে, যেমন শুনিবে এবং যেমন ভাবনা লইয়া ভাবিবে ; তোমার মন ক্রমে সেই ভাবে গঠিত হইবে। অতএব তুমি সৎশিক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্ম-ভূষণ পরিধান কর,—তুমি সংসারের যেখানে থাকিবে, তাহাই তোমার প্রকৃত আশ্রম হইবে। তুমি যত দিন না ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অন্তরে অনুধাবন করিতে পারিবে, তত দিন কেবল সংসারের অযথা কাজে ঘূরিয়া বেড়াইবে। তুমি তীর্থবাসী হও, আর লোকালয়ে অবস্থিতি কর,—যত দিন না তোমার হৃদয়, পুণ্য-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে,—যত দিন না তুমি উহাতে পরম পিতার আবির্ভাব বুঝিতে পারিবে, তত দিন শত শত তীর্থ-স্থান পরিভ্রমণ করিলেও কোন ফল-লাভ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের রাজ্যে যেখানে থাকিয়া, আত্ম-জ্ঞানে জ্ঞানবান হইবে, সেই স্থানকেই তুমি পরম তীর্থ-স্থান বলিয়া জানিবে।

মনুষ্য উচ্চ উদারতার বলে যে মহৎধর্ম্ম-ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তুমি সংসারের কীট হইয়া, যদি কেবল মৌখিক তর্ক-বলে,উহা লাভ করিতে চেষ্টা পাও,—তোমার কর্ত্তব্য-কার্য্যের দিকে দৃষ্টি না রাখ, নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া, বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিবে। তোমার উপদেশ,—তোমার তর্ক যত দিন না আর্য্য-ধর্ম্মের মূল-বিষয় লইয়া স্ফূর্ত্তি পাইবে, তত দিন তোমার নিজের ও যাহারা তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের আত্মাকে উন্নত করিতে পারিবে না। তুমি লৌকিকতার কার্য্যে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া যতই ঘূরিয়া বেড়াইবে, ততই তোমার আত্মাকে কলুষিত করিবে এবং এই সঙ্গে দেশে বহুবিধ অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে। তুমি যদি সৎপরামর্শ ধরিয়া চলিতে ইচ্ছা কর,—হয় লৌকিকতার অনুবর্ত্তী হইয়া, বাহ্য-কার্য্যে লিপ্ত থাক,—না হয়, উহা একবারে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগূঢ়-তত্ত্বে মনঃসংযোগ দাও। তুমি বিশুদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের সংস্রব রাখিলে, তোমার ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইবে কেন? তুমি যদি সাধারণ কার্য্যগুলি করিতে গিয়া, অসাধারণ বিষয়ে অগ্রসর হইতে না পার, তবে মনুষ্য-জন্ম-গ্রহণ করিয়া, এ জগতে কি ফল-লাভ করিবে বল? যাহারা কেবল তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদের তুমি কি উপকার করিলে? তুমি যদি বল, আমি যখন সমস্ত জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উপকার-সাধন-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, তখন যে ধর্ম্মে যে সার বস্তু পাইব, তাহা কেন না গ্রহণ করিব?—আর ইহাতে আর্য্য-ধর্ম্মের ভাব রক্ষা পায়, আর না পায়, তাহার দিকে কেনই দৃষ্টি রাখিব? ভাল, তুমি যদি এই মনে করিয়া, ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা দাও, তবে ইহা হিন্দু-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করে কি না? তুমি হিন্দু-জাতি হইয়া, হিন্দুর আর্য্য-ধর্ম্ম লইয়া যদি উপদেশ না দাও,

তাহা হইলে উহাকে আমরা কখনই হিন্দু-ধর্ম্ম বলিতে পারি না এবং উহাতে হিন্দু-সমাজের কোন উপকার দেখি না।

তুমি স্বদেশের অমঙ্গল দূর হইবে ভাবিয়া, যে বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের ছায়া গ্রহণ করিতে বসিয়াছ, একবার এ সকলের পরিণাম ফলের বিষয় ধরিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে না। বিষ-প্রয়োগে যদি কোন উৎকট ব্যাধির শান্তি হয়, তাহা দেখিয়া কি মনে করা উচিত যে, ঐ বিষই সকল পীড়ার মহৌষধ? যিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, তাঁহার রোগ-নিরূপণ বিষয়ে যেমন পারদর্শী হওয়া আবশ্যক, ঔষধাদির গুণাগুণ জ্ঞাত হওয়া তেমনই উচিত। ঔষধ প্রয়োগ করিবার অগ্রে, তাঁহাকে রোগীর রোগ-নিরূপণ, তাহার শারীরিক মানসিক ভাবগতি, দেশ-কাল-পাত্র, এ সকল বিষয় অবগত হইয়া, যে ঔষধ উপযুক্ত বোধ হইবে, তিনি তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চিকিৎসা-কার্য্যে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, তথাপি কি সকল চিকিৎসক, ইহাতে সমান যশোলাভ করিতে পারেন? এ বিষয় ধরিয়া চিন্তা করিয়া দেখ, সকল দেশের জল বায়ু এক রূপ নহে,—স্থান-বিশেষে লোকের শারীরিক ও মানসিক ভাব পৃথক্ পৃথক্; এজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশের যাহা উপযোগী, তথাকার বুদ্ধিমান লোকে তাহা আপনাদের দেশে প্রচলিত করিতে প্রয়াসী হয়েন। এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, ভারতের আর্য্যগণ এ দেশের যত দূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, এ রূপ আর অন্য কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভারত যত দিন ধরিয়া, তাঁহাদের আদিষ্ট আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম-সঙ্গত নিয়মাদির অনুমোদন করিয়া চলিতেছিলেন, তত দিন এ দেশের উন্নতি ভিন্ন অবনতি দেখা দেয় নাই। যখন হইতে দেশ স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিক্ষা করিয়াছে, তখন

হইতেই এ দেশের অবনতির সূত্রপাত দেখা দিয়াছে। এখন এই অবনতির স্রোতঃ, স্থান বিশেষে এমনই প্রবল যে, ইহার প্রতিকূলে গমন করিয়া, বিহিত-পথ ধরিয়া চলা নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই ভারতের যে এত দুর্দ্দশা, তথাপি যেখানে ইহার পূর্ব্ব নিয়ম-পদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাকার আচার-ব্যবহার দেখিলে, মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়! অতএব তুমি যদি ভারতের সূক্ষ্মদর্শী মনীষীদের প্রবর্ত্তিত আচার-ব্যবহারগুলির উপকারিতা দেখিতে চাও, তাহার প্রত্যেকগুলির অনুমোদিত সুপথ ধর, তবেই শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে সে সকলের সুমহৎ ভাব বুঝিতে পারিবে। তুমি বৈদেশিক জ্ঞানে আপনাকে উন্নত বিবেচনা করিয়া কেন পরদেশের বিপদ নিজ-দেশে আনিয়া উপস্থিত কর? তোমার তখনই জ্ঞান জন্মিবে, যখন দেখিবে যে, বৈদেশিকেরা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন,—তাঁহাদের ঘোর আন্দোলনের প্রবল বেগ আসিয়া কি তোমার গাত্রে আঘাত করিবে না? অতএব সময় থাকিতে, তুমি সাবধান হইয়া চলিতে শিক্ষা কর। কেবল অনুকরণ বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া পৈতৃক-ধনের উত্তরাধিকারী হইতে কেন বঞ্চিত হও? এই ভারত এখনও যে ধনে ধনবান্ বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছে, তাহা যদি হেলায় হারাইতে চেষ্টা পাও, তবে আর ইহার কিসের গৌরব থাকিবে বল?

যে দেশে যখন ধর্ম্ম-বিপ্লব আসিয়া দেখা দেয়, তখন সেখান-কার অবস্থা এই রূপই শোচনীয় হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বলিয়া, প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করিবার যদি কোন বিষয় এ জগতে থাকে, তাহা কি সেই আর্য্য-জাতির অমূল্য ভাণ্ডারের গুপ্ত-নিধি নহে? যাঁহারা হিন্দু হইয়া, আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সুযশঃ ঘোষণার পরিবর্ত্তে, তৎস্থানে কলঙ্কের ডালি মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহাদের

মনে কি লজ্জা ও ক্ষোভের উদয় হয় না? বুঝিলাম, জগতে কেহই আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসে না! এককে ভিন্নভাবে স্বীকার করা, জগতের একটি রোগ হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এই দোষটির আধিক্য বশতঃ মানী জনের মানের খর্ব্বতা হইতেছে এবং গুণিগণের, গুণের লাঘব হইতেছে; পক্ষান্তরে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় জনের, মানের আধিক্য এবং নির্গুণে গুণ-বিস্তারের নূতন-পথ আবিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। এই ঘোর বিপদে পড়িয়া, প্রকৃত হিন্দু-সমাজ কম্পিত হইতেছে। সাধারণ হিন্দুগণ, যত দিন না আপনাদের ধর্ম্ম-ভাব অন্তরে অনুধাবন করিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহারা আপনাদের সৌভাগ্য-লক্ষীলাভে নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই, হিন্দু-ধর্ম্মের সুনিয়ম-পালনের সঙ্গে, দেশের যত দূর মঙ্গল সাধন হয়; আর বাহ্য-বিষয়ের আড়ম্বর ও বাহ্য-জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে দেশের যত অমঙ্গল আসিয়া পড়ে, এ উভয়ের কার্য্য পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন। অন্তর্বিষয়ক দৃষ্টি, ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান উপায়, উহার পথ হারাইলেই বাহ্য-আড়ম্বর ও বাহ্য-জ্ঞানের উন্মেষ হয়। যেখানে এই বাহ্য-আড়ম্বর ও উহার উন্নতি আসিয়া দেখা দেয়, সেই খানেই ধর্ম্মের সুমহৎতত্ত্ব দূরে যাইয়া পড়ে। এই জন্যই বারবার বলা হইয়াছে যে,বর্ত্তমান ভারত উন্নতির দিকে না যাইয়া অবনতির দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের সুমহৎতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, বাহ্যাড়ম্বর ও বাহ্য-সুখে অনুরক্ত হয়েন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু যদি দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করা উচিত হয়,তবে বাহ্য-আড়ম্বর ও বাহ্য-সুখকে অনেক বিষয়ে পরি-ত্যাগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন ও ঐ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে না চলিলে কখনই মনুষ্য যথার্থ উন্নতির দশা লাভ করিতে পারে

না। হিন্দুর ধর্ম্ম-ভাব যখন ঐ বিশুদ্ধতা ও সদনুষ্ঠানের পরা-কাষ্ঠা দেখাইয়া দিতেছে, তখন উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অযথা পথে বিচরণ করা কোন হিন্দুরই উচিত হইতেছে না। সদ্ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা, যেমন হিন্দুর ধর্ম্মে শিক্ষা পাওয়া যায়, এমন অন্য কোন ধর্ম্মেই দেখা যায় না। এই জন্যই হিন্দু-ধর্ম্মের এত দূর মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে,—এই জন্যই স্বজাতীয় ধর্ম্ম-পাল-নের জন্য স্বজাতিগণকে আহ্বান করিতেছি,—এই জন্যই সমাজের দুর্নীতির সংশোধনের জন্য বিস্তর কথা বলিতে হইয়াছে,—এই জন্যই অগ্রে হিন্দু-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব-গুলি যথাসাধ্য ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে,—এই জন্যই জাতি-তত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে,—এই জন্যই পরলোক-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে,—এবং এই জন্যই ধর্ম্মের সকল তত্ত্বের সার যোগ-তত্ত্বের বিষয় যথাসম্ভব বলা হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্ব-মঙ্গলালয় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এতৎপাঠে পাঠকগণের হৃদয়ে হিন্দু-ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের মোহান্ধকার বিনষ্ট করুক,—হিন্দু-ধর্ম্মে হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হউক এবং ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাবে প্রত্যেকের অন্তর পূর্ণ হউক।

যোগ-পরিশিষ্ট।

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব।

প্রকৃত যোগ-সাধন স্বল্পায়াস সাধ্য নহে। ঐ যোগের এমন কতকগুলি শাখা প্রশাখা আছে, যদ্দ্বারা মনুষ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তন্মধ্যে যাহাকে প্রেত-তত্ত্ব বলে, উহার নিয়মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, আমরা অন্য মুক্তাত্মার বিবরণ অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারি। মনুষ্য মৃত্যুর পর কি প্রকার দশা লাভ করে,—কোন্ মুক্তাত্মা কি প্রকার সুখ-দুঃখভাগী হয়, এবং মনুষ্য-জন্মে তাহাদের এখানকার কার্য্য কি? ইত্যাদি অনেক বিষয় আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া জানাইয়া দেয়।

মনুষ্য যতই আত্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, ততই তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টি যেমন প্রত্যয়ের কারণ, প্রত্যয় তেমনই মনের দৃঢ়তা জন্মাইয়া দেয়। যে মন, ধর্ম্মের ত্রিসীমায় যাইতে চায় না,—কেবলই অধর্ম্ম-পথে ঘুরিয়া বেড়ায়,—অসৎ কাজ ও কুচিন্তা যাহার প্রধান অবলম্বন, সে ঈশ্বরকে লাভ করিবার উপায় কিরূপে ঠিক করিতে পারিবে? এ রূপ পাষণ্ড মনও যদি এই প্রেত-তত্ত্বের বিষয় জ্ঞাত হয়, তবে তাহার মনকে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তনের দিকে আনিয়া দেয়। ঈশ্বরকে না জানা ও অধর্ম্ম-পথে বিচরণ করা যে, মনুষ্যের ঘোর বিপদ, এটি তখন সে সহজেই বুঝিতে পারে। আমরা প্রেত-তত্ত্বের অধিবেশনে যোগ দিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, ইহাতে পরলোক সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিবার বিষয় আছে, কিন্তু তদ্বিষয় সবিস্তর প্রকাশ করিতে গেলে, একখানি নূতন পুস্তক হইয়া উঠে; এ কারণ উহার একটি মাত্র অধিবেশনের বিষয়, এ স্থলে প্রকাশ করা গেল।

মরা মানুষ কথা কয়, লিখে কভু দেখা দেয়,
প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও, সাধনেতে যোগ দাও।
জীবের গতি জানা যায়, পাপীতে যন্ত্রণা পায়,
পুণ্যের মহিমা কিবা, দেখে নয়ন জুড়ায়!
সংসার পরীক্ষা স্থান, বুঝে কর অবস্থান,
সুখ-দুঃখ যত কিছু, কার্য্যেতে করিছে দান।
সংসারের মিছা কাজে, রত হবে তাতে যত,
ঘুচিবে না মরণেতে, অশান্তি বিষম তত।
জগদীশ প্রতি মন, কর ভক্তি সমর্পণ,
মন খুলে প্রেম-ফুলে, ধর তাঁহারি চরণ।
নিজ-গুণ পুণ্য-বলে, এই দেহেরি কৌশলে,
পাবে দেখা, সেই সখা, হ'লে অন্তর নির্ম্মলে।
সাধিলে সাধন হয়, পাপের বিনাশ পায়,
অন্তর শীতল হয়, পরব্রহ্মে মন ধায়।
ভক্তিতে মুক্তির জ্ঞান, যে করিছে তাঁর ধ্যান,
বঞ্চিত না হবে কেহ, দেহে, থাকিতে এ প্রাণ।

বিবরণ।

বিগত ১২৯৪ সালের ৬ই চৈত্র রবিবার রাত্রি দশটার সময়ে, আমাদের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আমরা কেবল মাত্র পাঁচটি সভ্য উপস্থিত ছিলাম। চক্র করিয়া বসার অর্দ্ধ ঘণ্টার পরে, আমাদের মধ্যে এক জন মিডিয়ম* হইয়া পড়েন। প্রথমতঃ কয়েকটি পাশ † দিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। শোয়াইয়া দিবার পরেও কয়েকটি পাশ

---

* কোন মৃত ব্যক্তির মুক্তাত্মা চক্রস্থিত যে ব্যক্তির উপর আবির্ভূত হয়, তাহাকে মিডিয়ম বলে।

† এক প্রকার হস্ত চালনার কার্য্য।

দেওয়া হয়। তৎপরে দেখা গেল, মিডিয়মের দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে। মুখে কয়েকটা পাশ দিবার পর, মিডিয়ম কথা কহিতে সমর্থ হইল। তখন তাহার আত্ম-বিবরণের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়। নিম্নে সে সকল সবিস্তর লিখিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রশ্ন। আপনি কি আসিয়াছেন ?

উত্তর। হাঁ।

প্র। আপনি কি আমাদের কাহাকে চেনেন ?

উ। না।

প্র। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এখানে আগমন করিয়াছেন, তবে নিজ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বাধিত করুন ?

উ। আমি নিজে ঘোর পাপী। আমি পাপের জন্য, বিস্তর কষ্ট পাইতেছি। এখন আমার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমার জীবিতাবস্থার কথা সকল যত মনে পড়িতেছে, অসহ্য দুঃখ-শোক আসিয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিতেছে। আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না। আমি আমার পাপ জীবনের বিষয় বলিয়া কি করিব ? তাহা শুনিয়া ত আপনাদের কোন উপকার দেখি না। (সে বারম্বার এই রূপে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।)

প্র। আপনি এমন কি পাপ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য এত ক্লেশ অনুভব করিতেছেন ?

উ। আহা! আমার পাপের যে অন্ত নাই এবং কষ্টেরও শেষ নাই। আমি যে প্রকার কষ্ট পাইতেছি, উহা কেমন করিয়া মুখে বলিয়া পরিচয় দিব ? উহা যদি সামান্য হইত, তবে মুখে বলিলে আপনারাও বুঝিতে পারিতেন। খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এইটিই বুঝিয়া লউন যে, পাট আঁচড়ান লৌহের কাঁটা দিয়া, খুব সজোরে আঁচড়াইলে যেরূপ ক্রিয়া বুঝায়, আমার সর্ব্ব-শরীর ঐ ভাবে যেন দিবারাত আঁচড়ান হইতেছে। ছার

বিষয়-লালসা, আমার এই বিষম যন্ত্রণার একমাত্র কারণ! আমি এই পৃথিবীতে থাকিবার কালে কেবল বিষয় লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম। এখন ঐ বিষয় আমার সকল অনর্থের মূল দেখিতেছি। হায়! কি কষ্ট! আমি আমার প্রতিবেশীদিগের বাটী-বাগান জমি-জমা লইবার জন্য কি না করিয়াছি? তাহাদের প্রতি আমি বড়ই নিষ্ঠুর ছিলাম। বিষয়-বৃদ্ধির লালসায় রত থাকিয়া, বিস্তর অধর্ম্ম করিয়াছি। যত প্রকার পাপ আছে, আমি তাহার কোন্‌টি করিতে বাকি রাখিয়াছি? এখন সেই সকল পাপের নিদারুণ যন্ত্রণা আসিয়া, বিধিমতে আমাকে কষ্ট দিতেছে। হায়! আর যে সহ্য হয় না,—এ কষ্টের কি শেষ হইবে না? এ জীবন কত কাল এ রূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে? (মিডিয়ম কেবল এই রূপে অনুতাপ করিতে লাগিল।)

প্র। আপনার অবস্থা শুনিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আপনি এক জন ধনবান্ লোক ছিলেন; কিন্তু জীবিতাবস্থায় এমন কি কোন সৎকার্য্য করেন নাই, যাহাতে আপনার সদ্‌গতির উপায় হইতে পারে?

উ। আসল কাজের মূলে, ভুল না হইলে, আমার এ রূপ দশা কেন ঘটিবে? আমি ধনবান্ ছিলাম সত্য; কিন্তু ঐ ধন কখন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই,—যদি কখন হইয়া থাকে, সে তামসিক ভিন্ন অন্য রূপে যায় নাই। বিষয় করিব,—টাকা লইব, এই আমার জীবনের প্রধান কাজ ছিল। দান-ধ্যান যদি এ পোড়া অদৃষ্টে থাকিত, তবে এত কষ্টের ভার কেন বহন করিবে? পরকে কষ্ট দিলে, নিজে যে কষ্ট পাইতে হয়, এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমি যদি ধনবান্ না হইয়া সামান্য ভিক্ষুক হইতাম, সে যে আমার পক্ষে ভাল ছিল। অতিরিক্ত ধনলালসা আমার এই সমূহ বিপদের মূল!

প্র। আপনি কি এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন ?

উ। সুস্থ কাহাকে বলে ? শরীরে পীড়া না থাকিলেই তাহাকে সুস্থ বলে,—আমার যে পীড়া স-মূ-হ! এ পীড়া কি শীঘ্র আরোগ্য হইবে ? যত দিন না এই পীড়ার যন্ত্রণার ভোগ শেষ হইবে, তত দিন কিরূপে আপনাকে সুস্থ মনে করিতে পারি ?

প্র। আপনাকে আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ?

উ। বলুন।

প্র। অনুগ্রহ করিয়া আপনার নামটি বলুন ?

উ। (মিডিয়ম এ প্রশ্নে কোন কথা না বলিয়া, কেবল কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। বারম্বার জিজ্ঞাসার পর কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল) আমার নাম জানিয়া আপনাদের কি কাজ ? উহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না,—কেন উহা জানিতে চেষ্টা পাইতেছেন ?

প্র। নাম বলিতে আপনার প্রতিবন্ধক কি ?

উ। এ হতভাগ্যের নামে আপনাদের কি প্রয়োজন আসিবে ? আমি একে ঘোর পাপী, আমার নাম শুনা অপেক্ষা আমার যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে যদি আপনারা কিঞ্চিৎ দয়া করেন, তাহাতে আমার যেমন উপকার হইবে, আমার নাম বলায়, তত উপকার দেখি না। আমি এখন যেমন অনুতপ্ত আছি, আপনাদের নিকট দয়াময় পিতার সুমধুর নাম না শুনিলে, কোন মতে সুস্থির হইতে পারিতেছি না।

আমরা যতই ঈশ্বরের গুণগান করিতে থাকি, মিডিয়ম ততই বলে,—আরও বলুন,ঐ নাম বলিতে থাকুন ? আহা ! আমি আপনাদের এখানে আসিয়া বড়ই শান্তি-লাভ করিতেছি,—ও নাম বলিতে বন্ধ করিবেন না,—আবার বলুন,—বলিতে থাকুন ? হায় ! আমি জীবিতাবস্থায় ও নাম এক দিনের জন্যও মুখে আনি নাই ; এই

জন্যই আমার এত তুর্দ্দশা! আপনারা বড় মহাশয় লোক, আপনাদের এখানে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়।

প্র। আপনি নিজের নাম বলিতে এত কুণ্ঠিত হন কেন?

উ। আমার নামের কোন গৌরব নাই, এই জন্যই এই নরাধমের নাম বলিতে লজ্জা উপস্থিত হয়,—আমার পূর্ব্ব আচরণ সকল মনে পড়িয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হই। এখন কেমন মোহ রহিয়াছে যে, নাম বলিলে, আমাকে সকলে অধিক ঘৃণা করিবে। আর এমনও ভাবি, হয় ত আমার প্রতি আপনাদের দয়া আর না থাকিতে পারে। আমি কেবল এই তুইটি ভাবিয়া, আপন নাম বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। বিশেষতঃ এ পাপিষ্ঠ জনের এমন কোন সদ্‌গুণ ছিল না, যাহাতে ইহার নামের কিঞ্চিৎ গৌরব প্রকাশ পাইতে পারে। আমার নাম কেবলই অসার নীচ-গুণে পরিপূর্ণ। ঐ নামের কথা লইয়া যখন আপনারা অনেক ক্ষণ বৃথায় কাটাইয়া দিতেছেন, তখন বুঝিতে পারিতেছি, যে দয়াময় পিতার নাম শুনিলে, আমার উদ্ধার হইবে, তাহা শুনিতে পাওয়া আমার পক্ষে যেমন প্রার্থনীয় বিষয়, আমার ঘৃণিত জীবনের নামটি বলা, তত ক্লেশকর নহে,—আমার নাম "চন্দ্রশেখর" হায়! এখন আমি কি করিলাম,—কি হইল,—আমার যে আরও তুর্দ্দশা দেখিতেছি। আপনারা সকলে বড় মহাশয় লোক। আমার এই পাপিষ্ঠ নামটি উচ্চারণ করিয়া আপনাদের মুখকে কেন কলঙ্কিত করিলেন? আমি যে মুখে দয়াময় পিতার নাম শুনিতে আসিয়াছি, সে মুখে এ পোড়া নাম কেন গেল? আপনাদের বিশুদ্ধমুখে জগৎ পিতার সুবিশুদ্ধ নাম শুনিব, এই আশা আমার বড় ছিল; কিন্তু আমার ভাগ্য-দোষে বিষম বিড়ম্বনা দেখিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া, সেই দয়াময়ের সুমধুর নামের গুণগান করিতে থাকুন,—আর বিলম্ব করিবেন

না,—ঐ নাম না শুনিলে, আমার কোন মতে ভয় ভাঙ্গিতেছে না।

(পাপের কি দারুণ যন্ত্রণা! মিডিয়মের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—মুখ ম্লান হইয়া গেল,—চক্ষে জল দেখা দিল,—অন্তর্তাপে তাপিত-বাষ্প আসিয়া কণ্ঠরোধ করিল। কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, সে একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল) হায়! আর যে যাতনা সহ্য হয় না,—সময় বহিয়া গেল,—এখন আমার সদ্গতির উপায় কি? আমি নিজে মহাপাপী, যদি দয়া করিয়া আপনারা আমাকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া না দেন, তবে এ যন্ত্রণার ত কোন উপায় দেখি না। হে মহাশয়গণ! সে নাম না শুনিলে, আমার ত নিস্তার নাই,—আমার মন কিছুতেই শান্ত না পাইতেছে না।

(পরে কিয়ৎক্ষণ, তাহাকে ঈশ্বরের নাম শুনান গেল। তাহার তাপিত অন্তর শীতল হইল। তখন মিডিয়মকে দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন রহিয়াছে। তৎপরে তাহার মুখে পুনর্ব্বার হাস্যের ভাব দেখা দিল, এবং হৃষ্ট-মনে আমাদের সহিত কথা কহিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে তাহাকে যে যে বিষয়ের প্রশ্ন করা হয়, নিম্নে সে সকল লিখিত হইতেছে।)

প্র। আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিলেন যে, আপনার নাম "চন্দ্রশেখর," কিন্তু ঐ সঙ্গে আপনার নামের পদবীটি বলা হয় নাই। পদবীটি না বলিলে, আপনি যে কোন্ জাতি ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। অতএব যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে, নামের পদবীটি বলিয়া বাধিত করুন?

উ। আজ আমার নামের পদবীটি বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমি আপনাদের গুণে বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি আপনাদের এখানে থাকিতে বড় ভাল বাসি। আমার ইচ্ছা যে, আমি নিত্য আপনাদের নিকট আসি।

প্র। অদ্য আমরাও আপনার আগমনে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম, এবং আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমাদের নিকট আইসেন, তাহাতে আমাদের অমত নাই। তবে ইহার ভিতর এই একটি কথা হইতেছে যে, আপনি আপনার নামের পদবীটি বলেন নাই; আমরা যখন চক্র করিয়া বসিব, তখন অসম্পূর্ণ নামে আপনাকে কি প্রকারে ডাকিতে পারি? বিশেষতঃ আপনার যে নাম, ইহা অন্যেরও থাকিতে পারে; সুতরাং নামের পদবীটি প্রকাশ করিয়া বলাই উচিত হইতেছে?

উ। ঐ নাম ধরিয়া ডাকিলেই, আমি এখানে আসিতে পারিতাম, তথাপি আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্য, আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বলিতে বাধ্য হইতেছি,—আমার নামের পর "চৌধুরী" এই পদটি উল্লেখ করিবেন।

(নবাব প্রদত্ত "চৌধুরী" এই উপাধি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পাপে অনুতপ্ত তথাপি অন্তরের সকল কথা খোলসা রূপে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত। আমরা তাহার এই ভাব দেখিয়া, অদ্য তাহার পদবীটি বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বিরত হইলাম। এক্ষণে তাহার অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য চেষ্টা পাওয়া গেল।)

প্র। ইহলোকে থাকিবার কালে,আপনার নিবাস কোথায় ছিল?

উ। চানকের পূর্ব্ব গছবি নগর।

প্র। চানক হইতে ঐ গ্রাম কত দূর?

উ। প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্ব।

(চানক কলিকাতা হইতে বেশি দূরের পথ নহে, এজন্য তৎসন্নিকটস্থ জনপদ সকলের নাম আমরা সকলে অবগত আছি; কিন্তু এ স্থানটির নাম, আমরা ইতি পূর্ব্বে কেহই শ্রবণ করি নাই। বিশেষতঃ ঐ মুক্তাত্মা যে ভাবে আমাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে

ছিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইল যে, তিনি একজন ভদ্রলোক এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; সুতরাং কোন পরিচিত ভদ্র-স্থানে যে, তাঁহার বাসস্থান ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্রকৃত দেশের নাম বলিলে, যদি কেহ চিনিতে পারে, এই জন্যই একটা অপরিচিত স্থানের নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। মুক্তাত্মা হইলেই যে, সত্যবাদী হইবে, এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি যে কোন কোন মুক্তাত্মা সময় বিশেষে মিথ্যা কথাও কহিয়া থাকে। তাহাদের যে বিষয় বলিতে চাতুর্য্য প্রকাশ পায়, সেই খানেই প্রায় কথার অন্যথা দেখা যায়। কারণ কৃত্রিম বিষয়েই উহার প্রয়োজন হয়,—যথার্থ সত্য অমায়িক ভাব, তাহাতে কোন চাতুর্য্যের সম্মিলন থাকিতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ের সত্যাসত্যের বিষয়, আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি, ইহার শেষভাগে, তাহা প্রকাশ করিব। এক্ষণে ঐ দিন ঐ মুক্তাত্মার সহিত আমাদের আর যে যে বিষয়ের কথোপকথন হইয়াছিল, ক্রমে সে সকল বলিতেছি।)

প্র। বর্ত্তমান কালে আপনার সন্তান-সন্ততি কি কেহ জীবিত আছে?

উ। এ রূপ পাপিষ্ঠের কি পুত্র-কন্যা হইতে পারে? এটি কি আপনাদের বিশ্বাস হয়?

প্র। যদি পুত্র-কন্যা কেহ না থাকে, তবে নিজ আত্মীয়ের মধ্যে কি কেহ জীবিত আছেন?

উ। (ইহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া, বলিল) এ বিষয়ের সবিশেষ জানার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে আমি যে একজন সঙ্গতি-সম্পন্ন লোক ছিলাম, এক্ষণে আমার বাটী ও বাগানের যে ভগ্নাবশিষ্ট রহিয়াছে, সে সকলে ইহার পরিচয় দিয়া দিবে।

(আমরা দেখিলাম, সে জীবিতাবস্থার কোন বিষয়, খুলিয়া বলিতে, তাহার ইচ্ছা নাই ; একারণ তাহার বর্ত্তমান কালের প্রশ্ন করাই ভাল।)

প্র। আপনি এখন কোথায় থাকেন ?

উ। দমদমার পূর্ব্ব, একটি বাগানে। ঐ বাগানে রাস্তার ধারের দিকে, যে একটি কুঁচ গাছ আছে, আমি ঐ গাছটিতে থাকি। ঐ গাছটির উপর আমার বড় মমতা জন্মিয়াছে।

প্র। ঐ দমদমায় কত ভাল ভাল বাগান আছে, যে সকলে, বহুবিধ সুগন্ধ ও মনোহর পুষ্পাদির বৃক্ষ-লতা থাকিতে, একটি কুঁচ গাছের উপর আপনার মমতা কেন জন্মিল ?

উ। এখন আমার বৈষয়িক বিষয়ের ঘোরটা সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই, তাই আমি যেখানে থাকি, সেইটি আমার প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। ঐ কুঁচ গাছটির প্রতি আমার যে কি প্রকার ভাল বাসা, যাহার বিষয় বলিতে গেলে, আপনারাও হাসিবেন, এবং আমারও হাসি পায়। শুনুন বলি,—যে বাগানটিতে ঐ কুঁচ গাছটি আছে, ঐ বাগানের পূর্ব্বাধিকারী, এক্ষণে উহা আর এক জনকে বিক্রয় করিয়াছে। যিনি খরিদ করিয়াছেন, তিনি উহার বন জঙ্গল সব পরিস্কার করাইয়া, নূতন রকম করিতেছেন। তাঁহার আদেশ মতে বাগানের ভৃত্যগণ নিত্যই বনজঙ্গল সব কাটিয়া পরি-স্কার করিয়া ফেলিতেছে। আমি দেখিলাম, আমি একটি জঙ্গলা গাছ অবলম্বন করিয়া থাকি, ঐ গাছটিও কাটা পড়িতে পারে। আমি মনে এই ভাবিয়া, বাগানের অপর ধারের একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিলাম। যদি কুঁচ গাছটি নিতান্তই কাটা পড়ে, তবে তখন ঐ গাছটিতে যাইয়া আশ্রয় লইব। মনে এই স্থির করিলাম বটে, কিন্তু সাধ্যানুসারে দেখিতে হইবে, যাহাতে উহা কেহ কাটিতে না পারে। একে ঐ গাছটি রাস্তার

ধারের দিকে, ঐ খানে থাকিয়া অনেক লোকজনের গতিবিধি দেখিতে পাই ও কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাই ; বিশেষতঃ আমি অনেক দিন হইতে উহাকে আশ্রয় করিয়া আছি। এই জন্যই উহার প্রতি আমার এত মমতা জন্মিয়াছে,—এখন বড় মজার কথা, বলিতে হাসি পায়। ইতিমধ্যে যাহারা বাগান পরিস্কার করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এক জন তাহার সম্মুখের অন্যান্য জঙ্গল পরিস্কারের পর, আমি দেখিলাম যে, সে কুঠার তুলিয়া আমার কুঁচ গাছটি কাটিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি এমন সময়ে, তাহার পশ্চাৎ ভাগের বস্ত্র (কাছা) ধরিয়া, এমন সজোরে একটা টান দিলাম যে, সে, সেই টানে কুঠারি সমেত চারি পাঁচ হাত দূরে যাইয়া পড়িল। তখন তাহার কোন চৈতন্য ছিল না। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা হঠাৎ তাহার এ প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া, তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল,—কেহ জল আনিয়া, চখে মুখে ছিটা দিতে লাগিল, এবং তাহার হাত হইতে কুঠারি ছাড়াইয়া লইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, যখন সে সুস্থ হইয়া বসিল, তখন তাহার সঙ্গীরা তাহাকে, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমি আমার সম্মুখ দিকের জঙ্গল কাটিয়া পরিস্কার করিয়া আসিতেছিলাম, যেমনই কুঠারি খানি তুলিয়া, ঐ কুঁচ গাছটি কাটিতে উদ্‌যোগ করিয়াছি, এমন সময়ে কে যেন আমার পশ্চাৎ ভাগের বস্ত্র (কাছা) ধরিয়া এমনই সজোরে টান দিল যে,উহাতেই আমি মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। এই কথা শুনিয়া, তাহার সঙ্গীদের মনে ভয় জন্মিল এবং কেহই ঐ কুঁচ গাছটি কাটিতে সাহসী হইল না। অদ্যাপি ঐ গাছটি রহিয়াছে। আমি উহাতেই থাকি—আমাকে উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয় নাই।

(এই বিষয়টি বর্ণন কালে, মিডিয়মের মুখে হাসি ধরে নাই। আমরাও ঐ সুযোগে তাহার কিছু কিছু ভাগাভাগি করিয়া লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। তাহার এই আমোদের প্রসঙ্গ নিবৃত্তি পাইলে, তাহাকে অপর বিষয় জিজ্ঞাসা করা গেল।)

প্র। আপনি এখন কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতে আমাদের এখানে আসিলেন ?

উ। আমি অদ্যাপি জীবিতাবস্থার ক্রীড়া কৌতুকের বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। জীবিতাবস্থায় ঘোর বৈষয়িক ছিলাম। বৈষয়িক বলিয়া নিন্দা করিলে, অনেক সাধু মহাশয়েরও গাত্রে আঘাত করা হয়, কিন্তু আমি যে প্রকার বৈষয়িক ছিলাম, ধরাধামে এমন কোন বৈষয়িক লোক নাই, যাহার সঙ্গে আমার তুলনা হইতে পারে ? কত দিন হইতে চলিল, আমি মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া, এই নিদারুণ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি,—বলিতে কি, এখনও আমার ভোগেচ্ছা প্রবল রহিয়াছে। আমি যে কবে উদ্ধার পাইব, এই ভাবনা যখন ভাবিতে থাকি, তখন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই থাকে না ; তথাপি আর একটি কার্য্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে, জানিতে পারিবেন যে, আমার উদ্ধারের এখনও বিস্তর বিলম্ব রহিয়াছে। তাহা না হইলে, আমি এমন কাজ কেন করিতে যাই ?—

দেখুন, বেশি দিনের কথা নহে,—এই বিগত বারুণীর দিন প্রাতে একটি ভদ্রলোক, তাঁহার পুত্র-কন্যা লইয়া, একখানি গাড়ি করিয়া আমার নিকট দিয়া, এই কলিকাতায় স্নান করিবার জন্য আসিতেছিলেন। আমার মনে কেমন একটা খেয়াল আসিয়া উপস্থিত হইল যে, একবার ঐ গাড়িখানি চড়িয়া হাওয়া খাইয়া আসি। আমি গাড়ির নিকটে যাইয়া দেখিলাম যে, গাড়ির ভিতরে বাবু ও তাঁহার পরিবার, দুইটি কন্যা এবং একটি শিশু

সন্তান, তাহার মাতার ক্রোড়ে রহিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, গাড়ির ভিতরে বসিয়া যাইব, কিন্তু ঐ শিশুটির মুখখানি দেখিবামাত্র, আমার মনে কেমন দয়া উপস্থিত হইল। তখন মনে করিলাম, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল, গাড়ির ভিতরে পাঁচ জন, আর আমি যদি বসি, তাহাতে আরও গরম হইবে। এই ভাবিয়া, গাড়ির ভিতরে না যাইয়া, উহার ছাতে বসিয়া, চারি দিক দেখিতে দেখিতে আসিলাম। তাহারা বাগবাজারের ঘাটে স্নান করিতে গেল। আমি ঐ খান হইতে সহরের চারি দিক বেড়াইতে থাকিলাম। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত সহরের এখান সেখান করিয়া বেড়াইতেছি। অদ্য আপনাদের এখানে জগৎ পিতার সুমধুর নামের কথা শুনিতে পাইয়া, আমরা এখানে আসিলাম।

প্র। আপনার সঙ্গে আর কে আছেন?

উ। কেন, আপনারা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না?

প্র। আমরা এ ঘরে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। তবে বলিয়া দিউন, তিনি কোথায় আছেন এবং তিনি কে?

উ। ঐ যে সাম্‌নের জানালায় বসিয়া হাসিতেছেন। আপনারা যে কেন দেখিতে পাইতেছেন না, বলিতে পারি না। উনি বড় মহাশয় লোক। উনি আমার প্রতি বড়ই সদয়। উহাঁরি দয়া-গুণে আমি যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়া আসিতেছি। উহাঁর উপদেশ মতে আমি চলি। উনি আমাকে আশ্রয় না দিলে, আমার যে কি দশা ঘটিত, বলিতে পারি না। সারা দিন বনে বনে কাঁদিতাম,—ঘোর অন্ধকারে থাকিতাম,—একটি প্রাণীরও মুখ দেখিতে পাইতাম না। আহা! ঐ দুঃখের সময়ে যিনি আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে প্রাণপণে যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া কি থাকা যাইতে পারে? উনি আমার মাথার গুরু।

আপনারা আমাকে যাঁহার বিষয় জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উহাঁর গুণের কথা, এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এক্ষণে আমার যে দশা দাঁড়াইয়াছে, কেবল মাত্র, উনিই আমার প্রধান সহায়। অগ্রে কেবল ঘোর অন্ধকারে ছিলাম। এখন তাঁহার উপদেশ মতে চলিয়া, আমার চক্ষের অনেকটা ঝাপসা কাটিয়াছে,—আলোকের আমেজ দূরে দেখিতে পাই,—সম্পূর্ণ আলোক দেখা এ পাপ অদৃষ্টে এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। আহা! এখন বড়ই দুঃখের বিষয় মনে আসিয়া পড়িল—যাহা না বলিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না। এই পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে,—চারি দিকেই বায়ু-রাশিতে পরিপূর্ণ। সূর্য্য পৃথিবীর উপর দিকে আছে। পৃথিবীর যে ভাগ সূর্য্যের দিকে থাকে, তাহাতেই আলোক পড়ে। ভিতর দিক ঘোর অন্ধকার। আমি আমার চক্ষু থাকিতেও যে কত দিন ঐ ভয়ানক অন্ধকারে ছিলাম, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এখন যদিও অন্ধকারে আছি, তথাপি ঐ উপর দিকের আলোকে যে অদ্ভূত কাণ্ড দেখিতে পাই, এখন তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।—

আমি আমার পূর্ব্ব প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেককে সেখানে দেখিতে পাই। আহা! এখন তাহাদের কেমন সুখের অবস্থা—কি বা সুন্দর আকার,—কি মনোহর প্রকৃতি! তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন, সকলে আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে! আমি যে এত পাপ-তাপে পরিতপ্ত, তথাপি যখন তাহাদিগকে দেখিতে পাই, তখন আমারও মনে কোথা হইতে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা আমার এই দূরবস্থা দেখিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে,—যেন নিকটে পাইলে, ক্রোড়ে লইতে উদ্যত। আমি তাহাদের এই অসাধারণ করুণা দেখিয়া, বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়া পড়ি।

মনের ঐ ভাব, যখন কিঞ্চিৎ নরম পড়ে, তখন এই ইচ্ছা প্রবল হয়, কি রূপে আমি তাহাদের নিকট যাইতে পারি। একবার তাহাদের পায় ধরিয়া, ক্ষমা চাহিতে না পারিলে, আমার এ স-মৃ-হ যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হইতেছে না। তাহাদিগকে দেখিলেই আমার মনে এই প্রকার ভাব উপস্থিত হয়। আমি তাহাদের নিকট যাইবার জন্য প্রাণপণে দৌড়িতে থাকি,—দৌড়িয়া দৌড়িয়া যখন একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন আমার আর চৈতন্য থাকে না। পরে যখন কিঞ্চিৎ সুস্থির হই, আবার দৌড়িতে থাকি। মনে হয়, এই বারে তাহাদের নিকট নিশ্চয়ই যাইতে পারি, কিন্তু কি কষ্ট! যখন বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দৌড়িতে থাকি,—মনের আগ্রহ এত প্রবল হয় যে, এই বার নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট যাইয়া পড়িব। পরিশেষে এমনই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া আর আমার হুঁস থাকে না। যখন চৈতন্য হয়, তখন দেখি, আমি যে অন্ধকারে ছিলাম, এখনও সেই অন্ধকারে রহিয়াছি,—আমার অন্ধকারের পথ আর ফুরায় না!!! তখন কি নিদারুণ পরিতাপ আসিয়া পড়ে! জীবিতাবস্থায় আমি তাহাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলাম, সেই গুলি মনে আসিয়া, তখন যেন শেল বিদ্ধ করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি যাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলাম, এখন আমার প্রতি তাহাদের কোন প্রকার রাগ-দ্বেষের চিহ্নই দেখিতে পাই না! আহা! সেই নিরপরাধ পুণ্যাত্মাদের মনের কি সুন্দর অমায়িক উদার ভাব! আমি যাহাদের এখানকার দুরবস্থার একমাত্র কারণ, এই বিষয় চিন্তা করিয়া, দিবারাত অন্তর্তাপে বিদগ্ধ হইতেছি,—আর তাহারা এখন কেমন পরম সুখ উপভোগ করিতেছে! হায়! শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,—আমাকে দেখিলে, তাহাদের মন এত

করুণা-রসে কেন অভিষিক্ত হয়,—ইহার ত কোন কারণ বুঝিতে পারি না? ধন্য জগৎ পিতা! ধন্য! তোমার আশ্চর্য্য কৌশল!!!

(যখন মিডিয়ম এই বৃত্তান্তটি বর্ণন করিতেছিল, তখন আমরা একাগ্র মনে, তাহা শ্রবণ করিতেছিলাম। সেই সময়ে আমাদের বোধ হইতেছিল, যেন আমরা সকলে ঐ স্বর্গের মনোহর ভাবের ছায়া সম্মুখে দেখিতে ছিলাম। এখন তাহার কথারও সমাপ্ত হইল, পুনর্ব্বার আমাদের পূর্ব্ব-কথা আসিয়া মনে স্থান লইল।)

প্র। আমরা যে ঘরে রহিয়াছে, এ ঘরের দুই দিকে জানালা আছে, কিন্তু কোন্ দিকের জানালায় আপনার ঐ গুরু আসিয়া বসিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে প্রকাশ করিয়া বলুন?

উ। পূর্ব্বদিকে যে একটা জানালা আছে, ঐ জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন?

(আমাদের স্থূল-দৃষ্টি, সূক্ষ্ম দেহের প্রতি যায় না, সুতরাং দেখিয়াও কোন ফললাভ হইল না।)

প্র। আপনি অনেকক্ষণ, আমাদের নিকট আসিয়াছেন, অদ্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রস্থান করুন?

উ। এমন কি বেশি ক্ষণ আসিয়াছি?

প্র। মিডিয়মের কষ্ট না হইলে, আমরা আপনাকে আরও কিছুক্ষণ এখানে রাখিতে পারিতাম, কেবল ঐ কারণে যাইতে বলা হইতেছে?

উ। আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। এখানে আসিয়া যতক্ষণ দয়াময় পিতার নাম শুনিতে পাইয়াছি, তাহাতে বড়ই পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আপনারা এখন আমাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন না,—আমি

আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি,—আমাকে আর কিছুক্ষণ এখানে থাকিতে অনুমতি করুন।

প্র—উ। মিডিয়মের কষ্ট না হইলে, ইহাতে আমাদের অন্য-মত ছিল না?

উ। আমি ঘোর পাপী। আমি আসাতে যে, মিডিয়মের কষ্ট হইয়াছে, ইহা আমি বেশ জানিতে পারিতেছি। আহা! আমি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার প্রাণটা ভয়ে প্রথমে বামদিকের কোঁকের মধ্যে যাইয়া জড়সড় হইয়াছিল,—এখন তাহা ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে শূন্যে রহিয়াছে। পাপাত্মার আবির্ভাবে, তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইল।

প্র। মিডিয়ম যে দারুণ কষ্ট পাইতেছেন, তাহা আপনি জানিতে পারিয়াও কেন যাইতে সম্মত হইতেছেন না?

উ। হাঁ আমি যাইব, কিন্তু আপনারা আমাকে কয়েকটা ভজন শুনান, পরে যাইব।

প্র। আমাদের মধ্যে মিডিয়ম ভিন্ন আর কেহই ভজন গাইতে জানে না। অতএব আপনার যদি ভজন শুনিতে ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র মিডিয়মকে ছাড়ুন?

উ। এ বেশ কথা! আপনারা এখন দয়াময় পিতার নামের গুণ-গান করিতে থাকুন,—আমি যাইতেছি, কিন্তু মিডিয়মকে ভজন গাইতে বলা যেন ভুল না হয়; আমরা জানালায় বসিয়া থাকিয়া শুনিব। আর এই মিডিয়মকে আমি বড় চিনিয়া লইয়াছি,—আমি ইহাঁর নিকট যখন তখন আসিব।

প্র। আপনি অঙ্গীকার করিয়া বলুন যে, আপন ইচ্ছায় এ মিডিয়মের নিকট আসিবেন না?—আমরা এই মিডিয়মকে লইয়া যখন চক্র করিয়া বসিব, সে সময় ভিন্ন, অন্য কোন সময়ে, ইহাঁর গাত্র-স্পর্শ না করেন?

উ। ভাল, আমি ঐরূপ অঙ্গীকার করিলাম। এখন আবার মনে করিয়া দিতেছি, আমি মিডিয়মকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি যেন আমাদিগকে ভজন শুনান; অনুগ্রহ করিয়া আপনারা এ বিষয় তাঁহাকে বলিতে যেন বিস্মৃত না হন? আর আমাকে আপনারা আগামী কল্য ডাকিবেন কি না বলুন?

আমরা যে কয়েক জনে মিলিত হইয়া, এই সারকেলটি করিয়াছিলাম, সকলকেই বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়; সুতরাং রবিবার ভিন্ন আমাদের অবসর ঘটিয়া উঠে না। এ কারণ বলা হইল,—আমরা আগামী কল্য আপনাকে ডাকিতে পারিতেছি না। তাহা শুনিয়া সে বলিল, তবে পরশ্বঃ মঙ্গলবার আমাকে নিশ্চয় ডাকিবেন বলুন? তাহার এই রূপ আগ্রহ দেখিয়া, আমাদের মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, অনুতপ্ত হৃদয়ে মুক্তি পাইবার জন্য যে স্বাভাবিক আগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হয়, এখন এই মুক্তাত্মার সেই প্রকার দশা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু কি করা যায়, অগত্যা তাহাকে বলা হইল যে, রবিবার ভিন্ন আমরা আপনাকে ডাকিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিয়া, সে বড়ই দুঃখিত হইয়া বলিল, রবিবার আসিতে এখন বিস্তর বিলম্ব আছে,—আমি এত দিন, জগৎ-পিতার নাম শুনিতে না পাইলে, কেমন করিয়া থাকিব?

প্র। আমরা জগৎ-পিতার যে নাম করিলাম, আপনি ঐ নাম করিলে ত হইতে পারে?

উ। আমার কি সে ক্ষমতা আছে? আমার পোড়ার মুখে ও নাম, অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে আইসে না। ও নাম আপন মুখে আসিলে কি আমার কোন ভয়ের ভাবনা থাকে? বিস্তর পাপ করিয়াছিলাম, তাই আমার এত দূর কষ্ট। এখন আমার এ রূপ দশা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঐ নাম শুনিলে, মন প্রফুল্ল হয়,—

নীরস জীহ্বায় রস আইসে এবং যতক্ষণ ঐ নাম শুনিতে পাই, ততক্ষণ আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করি ; কিন্তু নাম লইয়া উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা আমার এখনও জন্মে নাই। আজ আপনাদের এখানে আসিয়া, আমার মন যেমন আনন্দিত হইয়াছে, এমন সুখ আমি জীবনের এক দিনেও পাই নাই। আপনারা আমার প্রতি দয়া রাখিবেন, তবেই আমি উদ্ধার পাইব। আমি অন্তর্তাপে যেরূপ বিদগ্ধ হইতেছি, পুণ্য-কার্য্যে যাঁহাদের মতিগতি নাই, তাঁহারা যেন ইহা দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন,—পাপের দুর্গতি সকলকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে।

প্র। আমরা যে সারকেলটি করিয়াছি, ইহাতে কোন দুষ্ট মুক্তাত্মা আসিয়া, আমাদের কোন অপকার করিবে না ত ?

উ। আমি থাকিতে, আপনাদের কোন ভয় নাই !

(পরে ঈশ্বরের গুণ-গান করা হইল, মুক্তাত্মা মিডিয়মকে ছাড়িয়া দিল। তৎপরে মিডিয়মকে কয়েটা বিপরীত পাশ দেওয়া হইল। দেখা গেল, মিডিয়ম যেন ঘোর নিদ্রাভঙ্গের পর, চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থতার পরে, তাঁহাকে ভজন গাইতে বলা হইল। মিডিয়ম দুইটি ভজন শুনাইলেন। পরিশেষে সে দিনকার বৈঠক ভঙ্গ হইল।)

অনুসন্ধান দ্বারা চন্দ্রশেখরের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত যত দূর জানা গিয়াছে, এক্ষণে তাহার সংক্ষিপ্ত বিষয় নিম্নে প্রকাশ করা গেল।—

চন্দ্রশেখর সাবর্ণচৌধুরী বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নিবাস কলিকাতার উত্তর দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ছিল। প্রায় ৪৫। ৪৬ বৎসর কাল গত হইল, ইনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর বংশে এক্ষণে কেবল তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যা বর্ত্তমান আছেন, অপর কোন সন্তান সন্ততি নাই। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাসত

সবডিবিজনের অন্তর্গত জামালপুর গ্রামের মৃত প্রসন্নচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। কৌলীন্য-প্রথা অনুসারে বিবাহ হয় এই মাত্র, কিন্তু প্রসন্ন তাঁহার অপর স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া, নিজ বাটীতে কখনই তাঁহাকে আনিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার জীবিতাবস্থায় কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে গতিবিধি ছিল।

আরও জানা গেল, চানকের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে রঙ্গপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বসতি আছে, কিন্তু ওখানে ঐ নামে কোন ভদ্র লোক ছিল না। তবে এইমাত্র প্রকাশ পাইল যে, ঐ গ্রামের একটি ডিহির নাম গছবি নগর। উহা সাধারণ লোকে জানে না, যাঁহারা জমিদারের জমিজমা রাখেন, কেবল তাঁহারাই এ বিষয় জ্ঞাত আছেন। ঐ ডিহির মধ্যে আদৌ কোন ভদ্র লোকের নিবাস নাই। কয়েক ঘর সামান্য শ্রমোপজীবী লোক মাত্র বাস করে। প্রকৃত বাস স্থানের বিষয় বলিলে, যদি কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে, এই জন্যই তিনি সাধারণের অপরিচিত এই স্থানের নামটির উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে প্রকাশ করি য়াছি, বোধ করি উহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পরে। আর তিনি জীবিতাবস্থায় যে বিষয় বিভব লাভ করিয়া ছিলেন, তাহার মূলে যে বিস্তর অধর্ম্ম ছিল, তিনি যখন নিজ মুখে ইহার একরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তখন তাহাও প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই,—ধনমদমত্ত অধার্ম্মিক জনগণের পরিণাম যে কি প্রকার অশুভদায়ক, যিনি একবার এই চন্দ্রশেখর চৌধুরীর নিজ বৃত্তান্তটি পাঠ করিবেন, তিনিই ইহার সবিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হইয়া, সাবধান হইতে পারিবেন। বিষয়ে ও অধর্ম্মে যদি প্রকৃত সুখ থাকিত, তবে ধর্ম্মের মধুরতা কে

উপভোগ করিবে? বিষয় থাকে থাক, বিষয়ের মত কার্য্য কর, তবেই ধর্ম্মের গৌরব বাড়িবে; নচেৎ কেবল বিষয়ের উপভোগে অন্ধ হইতে হইবে এবং পরিশেষে এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় যাইয়া মিশিবে। "ধর্ম্মাৎ পরতরোনহি" ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। ধর্ম্ম গৃহী উদাসীন সকলেরই আদরের ধন। যত কিছু সৎকার্য্য আছে, ধর্ম্ম তাহারই মূল। ধর্ম্ম বিনা জীবের সদ্গতি নাই এবং কৃত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধি-শোধন ।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৩	১০	গুলিলে	গুলিয়া শুষ্ক করিলে
২৬	১৪	প্রায়শ্চিত্ত	কার্য্য
৩৩	৫	পুরষ্কার	পুরস্কার
"	"	তিরষ্কার	তিরস্কার
৪৪	৪	উহারা	উহা
৪৮	১৫	অপনাকে	আপনাকে
৬৩	১৪	হওয়	হওয়া
৬৪	১৬	ধন্য-ধান্যে	ধন-ধান্যে
১১২	১৬	চাঞ্চল	চঞ্চল